মাসুদ রানা
অকস্মাৎ সীমান্ত
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
SUVOM
দুই খণ্ড
একত্রে
মাসুদ
শুভম

মাসুদ রানা

অকস্মাৎ সীমান্ত

[দুইখন্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল রানা গোলাপের দেশ তেহরানে। ভাবতেও পারেনি জটিল রায়ের কুটিল এক ফাঁদে পা দিচ্ছে সে সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায়। ছোট্ট সিমিকে উদ্ধার করে আনতে গেল সে লাহোরে। সেখানে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্যে অপেক্ষা করছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। পরিচয় হলো বিখ্যাত পপ্ গায়িকা স্পাই দিলারা দুররানীর সাথে। সে-ও আকণ্ঠ ডুবে আছে বিপদে। শুরু হয়ে গেছে ঘটনা-সংঘাত। পালাচ্ছে ওরা। কুশলগড়ের পাহাড়ে ঘিরে ফেলল ওদের কয়েক হাজার পাক আর্মি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

অকস্মাৎ সীমান্ত

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন
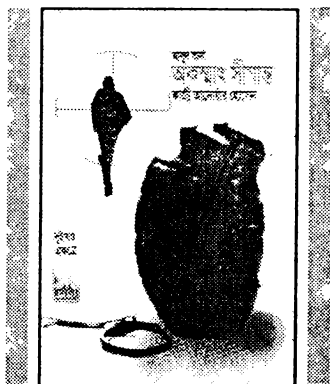
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7039-9
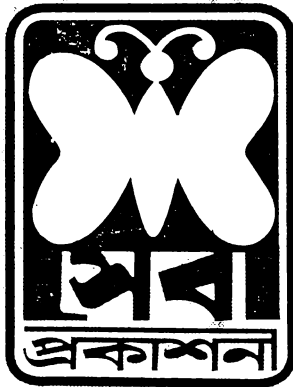
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
AKOSHMAT SHIMANTA
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা
প্রকাশনী

একান্ন টাকা

Rana- 39,40

অকস্মাৎ সীমান্ত – ১,২

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস ৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা ৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার ৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা ৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন ৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর ৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ ৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) ৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর ৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-

অকস্মাৎ সীমান্ত-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫

এক

বাহারেস্তান স্কয়ার। তেহরান।

স্কয়ারের সবচেয়ে সুন্দর আর্কিটেক্টের নিদর্শন বিশাল দশতলা খৈয়াম ভবনের পুরো তেতলা জুড়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী জটিলেশ্বর রায়ের অফিস। ব্যবসাটা কাভার। যাদের জানবার তারা ঠিকই জানে জটিলেশ্বর রায় ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের পাকিস্তান, মিডল ঈস্ট এবং সাউদার্ন ইউরোপের শাখা প্রশাখার চীফ। এবং এ-ও জানে যে সামান্য কয়েকটা ভুল না করলে এই তীক্ষ্ণধী, প্রতিভাবান ব্যক্তিটি আজ দ্বিতীয় সারির দশজনের মধ্যে একজন থাকত না, দোর্দণ্ড প্রতাপে সমাসীন থাকত গোটা সিক্রেট সার্ভিসের সর্বোচ্চ আসনে। সে যোগ্যতা আছে এর।

ছোটখাট মানুষ, বয়স আটচল্লিশ। অবিবাহিত। জুলফির গোটাকয়েক চুলে পাক ধরায় আভিজাত্যের ছাপ এসেছে চেহারায়। সর্বক্ষণ দাঁতে চেপে ধরা আছে একটা নিভু নিভু চুরুট। এই চুরুটের আকৃতি কম-বেশি হওয়া ছাড়া ভাবলেশহীন চেহারায় তেমন কোন পরিবর্তন নেই। মানুষটা জটিল। নির্বিকার গোবেচারা মুখ দেখে বুঝবার কোন উপায় নেই কী আশ্চর্য দ্রুতবেগে চিন্তা চলে এ লোকের মাথায়, কতখানি নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এ লোক চোখের পলকে। এক কথায় দুর্ধর্ষ। সাদামাঠা চেহারা, কিন্তু পুরু লেন্সের চশমায় প্রতিভা এবং প্রচুর পড়াশুনার আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া জামা-কাপড়ে, চালচলনে কোথাও বিশেষত্ব নেই এতটুকু।

নিজ অফিস কামরার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত জটিলেশ্বর রায়। একা।

লাল ফিতে খুলে একটা ইনভেলাপ থেকে দু'শীট কাগজ বের করল সে। লেখাটা পড়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। গোপন মেসেজের শেষে রাষ্ট্রপতির সীলমোহর ও সই। আবার একবার আগাগোড়া পড়ে উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে। শুরু হলো পায়চারি। ঘরজোড়া পার্শিয়ান কার্পেটের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বার ত্রিশেক পায়চারির পর বেজে উঠল টেলিফোন।

ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল জটিলেশ্বর রায়। এক সেকেন্ড। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে রিসিভার কানে তুলল।

'রায় স্পিকিং।'

'মেট্রোপলিস রেস্তোরাঁয় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন জনাব শেরমান শরাফী, সেক্রেটারির সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল। 'কেবিন নাম্বার টোয়েন্টি এইট।'

'ওকে। যাচ্ছি আমি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল জটিলেশ্বর তার অফিস কামরা ছেড়ে।

*

শেরমান শরাফী। ইরানী। একচল্লিশ বছর বয়স। অবিবাহিত। মা জীবিত, বাপ মৃত। তেহরান ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। গত সাত বছর ধরে তেহরান টেক্সটাইল, ফারসীতে যাকে বলে 'চিটসাযী,' তার জন্যে কটন ইমপোর্ট করছে সে পাকিস্তান থেকে। ঝানু ব্যবসায়ী। প্রচুর ফরেন কারেন্সি দিচ্ছে সে পাকিস্তানকে। নিজেও রোজগার করছে প্রচুর। কিন্তু এই রোজগারে সন্তুষ্ট নয় সে। তাই প্রচুর ফরেন-ইনফরমেশনও দিচ্ছে সে ভারতকে। এটা ওর সাইড-বিজনেস। এখানেও রোজগার হচ্ছে প্রচুর। ছোটখাট একটা এসপিওনাজ নেট-ওয়ার্ক তৈরি করে নিয়েছে সে পাকিস্তানে। গত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করছে জটিলেশ্বরকে। মাসে দু'বার করে পাকিস্তানে যায় সে ব্যবসা উপলক্ষে। কাজেই কোন অসুবিধে নেই।

ভ্রূ কুঁচকে বসে আছে শেরমান শরাফী। জটিলেশ্বরের সাথে দেখা করতে চাওয়াটা ওর জন্যে খুব ভাল কথা নয়। বিপদের আশঙ্কায় দেখাসাক্ষাৎ করাটা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে সে। এই সাবধানতা জটিলেশ্বরও পছন্দ করে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একটু আলাদা। বিশেষ জরুরী একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেখা না করে উপায় নেই।

'হাই!' পর্দা তুলে আটাশ নম্বর কেবিনে ঢুকল জটিলেশ্বর রায়। 'হ্যালো শেরমান! ইউ লুক প্রিটি ইয়াং!'

'থিঙ্ক সো?' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল শেরমান। 'আই উইশ আই ফেল্ট ইট।'

বসল দু'জন। দরজায় মৃদু নক করে কেবিনে ঢুকল বেয়ারা। লাঞ্চের অর্ডার লিখে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল শ্যাম্পেন নিয়ে। ঢেলে দিল দুটো গ্লাসে। বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই ভুরু নাচাল জটিলেশ্বর।

'কি ঘটেছে?'

'এখনও ঘটেনি, ঘটতে চলেছে।' শ্যাম্পেনে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে শেরমান বলল, 'ভেঙে পড়েছে বরকতউল্লাহ।'

চশমাটা নাকের উপর ঠিকমত বসিয়ে নিয়ে শেরমানের চোখে চোখ রাখল জটিলেশ্বর।

'কি রকম?'

'আপনাকে আগেই বলেছিলাম লোকটা ভীতুর ডিম, প্রফেসার মানুষ, ওকে এই কাজে নেয়া ঠিক হচ্ছে না। শুনলেন না। এইবার সামলান।'

'কি হয়েছে?'

'গত কয়েক দিন ধরে স্পেশাল পুলিস নজর রাখতে শুরু করেছে ওর ওপর।'

'কেন?'

'তা জানি না। বরকতউল্লাহ নিজেও জানে না কোথায় ভুল করেছে। এজন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে বেশি। সর্বক্ষণ আতঙ্কিত। কেঁদে ফেলেছিল সেদিন কথা বলতে বলতে। আমার বিশ্বাস পালাবার কথা ভাবছে লোকটা।'

পাঞ্জাবী এক মেয়েকে বিয়ে করে পাকিস্তানেই রয়ে গিয়েছে বরকতউল্লাহ, রিপ্যাট্রিয়েশনের সুযোগ নেয়নি। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে ধ্বনিতত্ত্ব পড়ায়। বাড়িতেও একটা স্কুল মত খুলেছে। ছয়মাসে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, বাংলা, হিন্দী, গুজরাটি, তামিল ও

তেলেগু ভাষা শিক্ষার কোর্স। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জমে গেছে স্কুলটা—অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ফরেন সার্ভিসের লোক, আর্মি ও এয়ারফোর্সের লোকজন, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও গুপ্তচর বিভাগের লোকজন আসছে নিয়মিত এইসব ভাষা শিখতে।

এসব লোকের কাছ থেকে কৌশলে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব মনে করে বরকতউল্লার কাছে লোক পাঠিয়েছিল জটিলেশ্বর তিন বছর আগে। এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল বরকতউল্লাহ। তথ্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ টাকা তেহরানের এক ব্যাঙ্কে জমা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল জটিলেশ্বর, সেটাই আসলে আকর্ষণ করেছিল ওকে এই কাজে আসবার জন্যে, দেশপ্রেম বা পাকিস্তান বিরাগ নয়। তিন বছরে প্রচুর তথ্য দিয়েছে সে, তেহরান ব্যাঙ্কে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার জমেছে বরকতউল্লার। খুশি মনে কাজ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই বিপদ।

'তাহলে তো ওর বদলে অন্য লোকের ব্যবস্থা করতে হয়,' খানিক চুপ করে থেকে বলল জটিলেশ্বর।

'অন্য লোক চাইতে আসিনি আমি, মিস্টার রায়,' বলল শেরমান। 'দুর্যোগ দেখা দিয়েছে ওখানে। ইসলামাবাদ থেকে একজন ব্রিগেডিয়ার এসেছে লাহোরে। শোনা যাচ্ছে, স্পাই ধরবার জন্যে জাল পেতেছে সে। ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার।'

'তারিক আখতার!' ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল জটিলেশ্বরের। 'মাই গড! পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে ডেঞ্জারাস লোক! মিড্‌ল্ ঈস্ট জোনের চীফ। কাজের চাপে হেডকোয়ার্টার ছেড়ে যে লোক এক চুল নড়বার সময় পায় না—সে কেন লাহোরে?'

'কিছু একটা সন্দেহ করে সে এসেছে। ওর আসার খবর শুনেই হৃৎকম্প শুরু হয়েছে বরকতউল্লার।'

বেয়ারা খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। দু'মিনিট চুপচাপ খেয়ে মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল জটিলেশ্বর, 'আপনার কি মনে হয় পালাতে পারবে বরকত?'

'ওর সুযোগ-সুবিধে বা প্রস্তুতির কথা আমি কিছু জানি না। আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে আলাদা কথা, কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় হঠাৎ পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা আমি দেখি না। ধরা পড়ে যাবে ঠিক।'

'কবে নাগাদ পালাবার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়?'

'জানি না। যদিও অপেক্ষা করতে বলেছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে কোন মুহূর্তে উড়াল দিতে পারে সে এবং উড়াল দেয়ার সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা ওর ওপর।'

'চাপে পড়লে বরকতউল্লাহ মুখ খুলবে।'

'সন্দেহ নেই।'

মাথা ঝাঁকাল জটিলেশ্বর।

'সেটা আপনার এবং রানীর জন্যে বিপদের কথা। আপনাদেরও হারাব তাহলে।'

'সন্দেহ নেই।'

আর একটাও কথা না বলে খাওয়া শেষ করল জটিলেশ্বর। শ্যাম্পেন দিয়ে গলা

ভিজিয়ে নিয়ে নতুন একটা চুরুট ধরাল। তারপর নিষ্প্রাণ হাসি হাসল শেরমানের দিকে চেয়ে।

'আপনাদের দু'জনকে হারাতে চাই না আমি। ব্রিগেডিয়ার তারিকের হাতে ও ধরা পড়লে আমাদের কাজকর্ম গুটিয়ে নিতে হবে লাহোর থেকে। ভেস্তে যাবে এতদিন ধরে গড়ে তোলা নেটওয়ার্ক। কাজেই বরকতউল্লাকেই হারাতে হবে।'

'মেরে ফেলবেন?' বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরল শেরমান জটিলেশ্বরের মুখে।

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ওর কাছে কোনভাবেই ঋণী নেই আমরা। এতদিন ও আমাদের উপকার করেছে ঠিক, কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা ভাল পয়সাও দিয়েছি। নিজের দোষে ও যদি সব ভণ্ডুল করে দেয়, তাহলে টাকাগুলো বেচারা ভোগ করতে পারল না, এই ভেবে বার কয়েক চুক-চুক করা ছাড়া আমাদের আর করবার কিছুই নেই। আজ রাতেই চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে বরকতউল্লার মুখ। নিভু নিভু চুরুটে গোটা কয়েক ছোট ছোট টান দিয়ে আবার মুখ খুলল জটিলেশ্বর। 'দিন পনেরো লাহোর থেকে দূরে থাকুন। ভাল কথা, তারিক আপনাদের সন্দেহ করতে পারে, এমন কোন কারণ ঘটেনি তো?'

'না।'

'খুব জোর দিয়ে বলতে পারেন? তারিক ভয়ঙ্কর।'

'বরকতউল্লার মুখ বন্ধ হলেই আমি নিরাপদে থাকব।'

জটিলেশ্বর মাথা ঝাঁকাল। 'বরকতউল্লার মুখ বন্ধ হবে। এবার রিপ্লেসমেন্ট সম্পর্কে...' চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত। 'সুনীল নাগের কথা মনে আছে? ভাল উর্দু জানে, পাঞ্জাবী জানে। ইন্টারন্যাশনাল ক্যালকুলেটারের পক্ষে কাজ করছে এখন। ওকে আমি অনায়াসে লাহোরে বদলি করতে পারি। আপনি কি মনে করেন?'

'তারিক আখতার লাহোর না এলে আমি হ্যাঁ বলতাম।' সিগারেট ধরাল শেরমান। 'নাগ কাজের লোক। কিন্তু তারিক গন্ধ শুঁকেই নাগকে ধরে ফেলবে। ওরা এখন অতি সতর্ক। আপনি বরকতউল্লার বদলে একজনকে পাঠাবেন তা ওরা ধরেই নেবে। নতুন কোন লোক গেলে তাকে ভালমত আগা-পাছ-তলা পরীক্ষা করে তারপর ছাড়বে।'

'ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না। নাগকে পছন্দ কিনা বলুন।'

'চলবে।'

'তাহলেই হলো। উঠি আমি। এক হপ্তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আগামী ট্রিপে লাহোরে গিয়ে নাগের সাথে কথা বলতে পারবেন।' উঠে দাঁড়াল জটিলেশ্বর।

লোকটাকে চেনে শেরমান। প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করল না সে। করব বললে করবেই জটিলেশ্বর রায়।

ডালা নামিয়ে সুটকেসে তালা দিল বরকতউল্লাহ। রিস্টওয়াচে সময় দেখে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নেটের পর্দা ভেদ করে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সরু গলিটায়। তাগড়া জোয়ান লোকটা এখনও দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গত চার ঘণ্টা ধরে পাহারা দিচ্ছে চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির প্রবেশ পথ।

পিছিয়ে এসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল বরকতউল্লাহ। ঘড়িতে বাজে একটা পঁচিশ। স্পেশাল পুলিস সুপার দিল মোহাম্মদ ঠিক দেড়টায় আসবে বাংলা শিখতে। সে এলেই বিদায় নেবে গার্ড। পুলিস সুপার হাজির থাকার সময় বরকতউল্লাহ পালাবার চেষ্টা করবে না, ধরেই নিয়েছে ওরা। দিল মোহাম্মদের পড়া শেষ হলে আবার ফিরে আসবে গার্ড। বাইরে কোথাও গেলে নীরবে পিছু নেবে লোকটা, বাধা দেবে না সন্দেহজনক কিছু না দেখলে। এসব জানা হয়ে গেছে বরকতউল্লার। গত পাঁচ দিন ধরে চলছে এই বিভীষিকাময় পাহারা। আর সহ্য করতে না পেরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বরকতউল্লাহ। পালাতে হবে। আজই। আরও আগেই পালানো উচিত ছিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অনেক দেরি করে ফেলেছে সে। আর নয়। শেরমান শরাফী যাই বলুক, আর অপেক্ষা করবে না সে কিছুতেই। যে কোন মুহূর্তে ওরা এখন গ্রেফতার করতে পারে ওকে। শেরমান আশ্বাস দিয়েছে জটিলেশ্বরের সাথে যোগাযোগ করবে সে এবার তেহরান গিয়ে, ওকে এখান থেকে পালাবার ব্যাপারে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে জটিলেশ্বর। কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করতে পেরেছে বরকতউল্লাহ—ওকে এখান থেকে উদ্ধার করার চেয়ে ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়াই সহজ মনে করবে জটিলেশ্বর রায়। এখানে অপেক্ষা করলে স্পেশাল পুলিসের হাতে ধরা যদি নাও পড়ে, মরতে হবে রায়ের পাঠানো মৃত্যুদূতের হাতে। কোন সন্দেহ নেই। কেন যে মরতে এদের সাথে নিজেকে জড়িয়েছিল ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে কান্না আসতে চেয়েছে ওর প্রথম তিন দিন, এখন আর সেটা হয় না। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে কোন লাভ নেই, যা করবার করতে হবে এখন ওর নিজেকেই। দ্রুত।

বিছানার নিচে সুটকেসটা লুকিয়ে রাখল সে। দ্রুতপায়ে চলে এল সে স্টাডি ডেস্কের পাশে। নিচের ড্রয়ার টানল।

গাজালা মার্কেটিং-এ গেছে। এটা ওর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফিরে এসে দেখবে উড়ে গেছে চিড়িয়া। স্ত্রীকে ফেলে পালাতে এতটুকু মমতা জাগছে না ওর বুকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে সে আসলে। বারো বছরের নিঃসন্তান বিবাহিত জীবনে দুঃখ পাওয়ার মত স্মৃতি সঞ্চয় হয়নি ওর। গা জ্বালা করে ওর গাজালার কথা ভাবলে। প্রথম দর্শনে যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী, মিষ্টভাষিণী, অপরূপ রমণী মনে হয়েছিল, সেই গাজালাকে চিনবার উপায় নেই আজ আর। কুমড়োর মত মুটিয়েছে, ক্ষুরধার জিভের সামনে তিষ্ঠানো যায় না একদণ্ড। বিরক্তিটা ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ওর দুই ভাই মারা পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধার হাতে, তৃতীয়জন আত্মসমর্পণ করেছিল ষোলোই ডিসেম্বর। মনের সমস্ত বিষ ঝেড়েছে গাজালা ওর ওপর, আপত্তি বা তর্ক করলে ভয় দেখিয়েছে, ধরিয়ে দেবে দেশদ্রোহী বলে। তিক্ততা চরমে পৌঁছল যখন অপশন চাওয়া হলো বরকতউল্লার কাছে। বাংলাদেশে ফিরতে চায় শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল গাজালা, জানিয়ে দিল, মলমূত্র ত্যাগের জন্যে হলেও সে ওই অভিশপ্ত দেশে যাবে না। যে দেশে রক্ত দিয়েছে ওর মায়ের পেটের ভাই, সে দেশ ওর জন্যে হারাম। কেবল জানিয়ে দেয়াই নয়, সেই সাথে হুমকি দিল, ওর কাছে প্রমাণ আছে, যদি বরকতউল্লাহ বাংলাদেশে একা ফিরতে চায় তাহলে সব জানিয়ে দেবে পুলিসকে—নির্মম মৃত্যু ঘটবে ওর

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

পরে অবশ্য জানতে পেরেছিল বরকতউল্লাহ, কোন প্রমাণই ছিল না গাজালার হাতে, ওটা ছিল স্রেফ ভয় দেখানো হুমকি। কোন রকম দুর্বলতা বা প্রেম নয়, ধোপার যেমন গাধা, গারোয়ানের যেমন ঘোড়া বা খচ্চর, উপার্জনের সহায়ক, ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে গাজালা ওকে, কাছে রাখতে চেয়েছে। গত চার বছরে ঘুমানো তো দূরের কথা, এক বিছানায় বসেনি পর্যন্ত ওরা। বছরের পর বছর মুখ বুজে রোজগার করে গেছে বরকতউল্লাহ, যেমন খুশি দু'হাতে টাকা উড়িয়েছে গাজালা।

আজও গেছে উড়াতে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরবে না। এই ফাঁকে পালাবে সে। যাবার সময় দেখা না হওয়াই ভাল। যদিও ইদানীং আর্মির এক সুবাদার-মেজরের সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত এবং তৃপ্ত রয়েছে গাজালা, তবু মুখোমুখি হয়ে গেলে প্রচণ্ড একটা ঝগড়া না বাধিয়ে ছাড়বে না মেয়েলোকটা। লোকজন ডেকে যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

ড্রয়ার থেকে বালি আর সীসার টুকরো ভর্তি একটা মোজা বের করল বরকতউল্লাহ। কোটের পকেটে পুরল সেটা। গত কয়েকদিনে গাজালার চোখ বাঁচিয়ে এই অস্ত্রটা তৈরি করেছে সে যত্নের সাথে। ধড়ফড় করছে বুকটা। ঝামেলা বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ অপছন্দ করে সে। কাউকে আঘাত করার কথা ভাবতে গেলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কিন্তু উপায় নেই। জরুরী অবস্থার মোকাবিলা ওকে করতেই হবে। যেমন করে হোক জয় করতে হবে ভয়কে।

ড্রয়িংরুমে চলে এল বরকতউল্লাহ। শেলফ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বের করে টেবিলে রাখল সে। চৌত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করবে আজ দিল মোহাম্মদ। মনে মনে স্বীকার না করে পারে না বরকতউল্লাহ, লোকটা বেশ দ্রুত শিখে ফেলছে বাংলা। উচ্চারণে কিছু কিছু ত্রুটি অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু সেটুকুও থাকবে না আর দু'মাস পর।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে দ্রুত পাশের কামরায় চলে এল বরকতউল্লাহ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। গার্ড নেই। তার মানে, আসছে দিল মোহাম্মদ।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিল সে। সালামের জবাবে স্রেফ মৃদু মাথা নেড়ে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল দিল মোহাম্মদ। হাতীর মত বিশাল লোকটা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চোখে।

'কেমন আছেন, ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল বরকতউল্লাহ।

'এই যেমন দোয়া করছেন,' উচ্চারণ ঠিক রাখার জন্যে থেমে থেমে বলল দিল মোহাম্মদ। 'গরীবের আবার থাকা। চলে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভাল তো?'

'জ্বী, ভাল। ধন্যবাদ।' এইসব কথাবার্তা বাংলা শেখাবার কোর্সের মধ্যেই পড়ে। বরকতউল্লাহ জানতে চাইল, 'আপনার স্ত্রীর অসুখ সেরেছে?'

'সেরেছে। এখন অনেকটা ভাল।' অভ্যাসমত রিভলভারটা বের করে টেবিলের উপর রাখল দিল মোহাম্মদ, তারপর আস্তে করে শরীরের ভারটা চেয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে বসল।

বইটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, 'আপনার স্ত্রীও আশাকরি ভাল আছেন?'

'ভালই আছেন,' পায়চারি শুরু করল বরকতউল্লাহ। 'নিন, এবার শুরু করা যাক।'

পড়তে শুরু করল দিল মোহাম্মদ। আড়চোখে দিল মোহাম্মদের রিভলভারটা বার কয়েক দেখল বরকতউল্লাহ। রোজই ওটা ওখানে রেখে পড়তে বসে কুকুরটা। জানা কথা এটা ফাঁদ। দিল মোহাম্মদ আশা করছে রিভলভারটা ছোঁ মেরে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সে আক্রমণ করবে তাকে। কিন্তু বরকতউল্লাহ অত বোকা নয়। ও জানে, রিভলভারে বুলেট নেই একটাও। থাকতেই পারে না।

'অন্নপূর্ণা কহিলেন,' পড়ছে দিল মোহাম্মদ, 'দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও'সে।' থামল। 'লও'সে মানে?'

'লও এসে শব্দ দুটো একসাথে করে বলা হচ্ছে লও'সে। কাশী চলে যাচ্ছে অন্নপূর্ণা। পড়ে যান...'

আবার পড়ায় মন দিল দিল মোহাম্মদ।

পিছনে চলে এল বরকতউল্লাহ। হাতের আঙুলগুলো ভিজে গেছে তার। জুলফি বেয়ে টপ টপ নামছে ঘাম। পকেট থেকে রুমাল বের করল সে। চট্ করে একবার বই থেকে চোখ সরিয়ে দেখে নিল ওকে দিল মোহাম্মদ। রুমাল বের করে ঘাম মুছতে দেখে আবার মনোনিবেশ করল পড়ায়।

আঙুলগুলো ভাল করে মুছে কোটের ডান পকেটে রুমালটা ঢুকাল বরকতউল্লাহ। হাতটা যখন বের করল তখন বালি আর সীসা ভরা শক্ত-বুনোট উলের মোজাটা চলে এসেছে ওর হাতে। ধীর পায়ে এগোল সে। কি ভাবছে এখন দিল মোহাম্মদ? সে কি সত্যিই তাকে গ্রেফতার করে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের হাতে তুলে দেবে, নাকি...কোন রকম ভুল হচ্ছে না তো! কিন্তু অতশত ভাববার সময় নেই এখন...

বেশ পড়ছিল দিল মোহাম্মদ। হঠাৎ টের পেয়ে গেল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বই থেকে চোখ তুলেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাবে এখুনি। ফুঁপিয়ে উঠল বরকতউল্লাহ, ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। পর মুহূর্তে সাঁই করে চালাল ভারী মোজাটা দিল মোহাম্মদের চাঁদি বরাবর।

শক্ত মাথায় বাড়ি খেয়ে ছিঁড়ে গেল মোজা। সীসার টুকরো আর বালি ছড়িয়ে পড়েছে কার্পেটে। তিন সেকেন্ড ঠায় বসে রইল দিল মোহাম্মদ। অনড়। তারপর প্রকাণ্ড মাথাটা নুয়ে পড়ল বুকের উপর। দুই কানে, শার্টের কলারে, ঘাড়ে বালি জমে গেছে। শূন্য মোজাটা ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বরকতউল্লাহ। দু'চোখে আতঙ্ক।

সাড়ে তিনমনী বস্তার মত ধপ করে কার্পেটের উপর পড়ল ভারী দেহটা চেয়ার থেকে ঢলে। মনে হলো কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।

মোজাটা ফেলে দিয়ে ছুটে বেডরুমে ঢুকল বরকতউল্লাহ। বিছানার নিচ থেকে সুটকেসটা নিয়ে ফিরে এল আবার। দেখল তেমনি পড়ে আছে কার্পেটের উপর বিশাল বপু দিল মোহাম্মদ। ঢোক গিলল সে। মেরে ফেলেনি তো লোকটাকে?

দ্রুত দরজা খুলে সিঁড়ি ঘরে বেরিয়ে এল বরকতউল্লাহ। চারতলা থেকে একতলায় নামতে হবে। নামতে নামতে বার বার তাকাচ্ছে সে পিছন ফিরে। লোকটার জ্ঞান ফিরে এল না তো?

দাঁড়িয়ে পড়ল বরকতউল্লাহ। কে যেন উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কি করবে ভেবে পেল না সে। কে উঠে আসছে? দেখা যাচ্ছে না এখনও।

সামনেই একটা বাঁক। লুকোবার জায়গা নেই। নিষ্প্রাণ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সে সুটকেস হাতে।

গাজালা! একবিন্দু নড়ল না বরকতউল্লাহ। প্রকাণ্ড চর্বিসর্বস্ব দেহটা অতিকষ্টে টেনে একটা একটা করে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে আসছিল, চোখাচোখি হতেই দাঁড়িয়ে পড়ল গাজালা। একহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অপর হাতে প্লাস্টিকের ঝুড়ি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন।

'সত্যি যাচ্ছ তাহলে?' বরকতউল্লার হাতের সুটকেসের দিকে তাকাল গাজালা। 'ভয়ে অমন কেঁচোর মত হয়ে গেছ কেন? বাধা দেব ভাবছ নাকি?'

জোরে শ্বাস নিয়ে জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল বরকতউল্লাহ। সব পারে সে এখন। এই সোনার সুযোগ হারানো মানে মৃত্যু। দরকার পড়লে হত্যা করবে সে গাজালাকে।

'হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।' গলাটা কাঁপা কাঁপা। নামতে শুরু করল সে। 'গুডবাই, গাজালা। আর শোনো, ওপরে এখুনি যেয়ো না···আরও কিছু কেনাকাটা করে, খানিক পর···'

'বেশ বেশ।' বিকৃত হয়ে উঠল গাজালার চোখ মুখ। 'তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

'দুঃখিত। তোমার কোন অসুবিধে হবে না···আমি জানি··· তোমার বাবা···'

প্রলাপের মত বকছিল বরকতউল্লাহ, থেমে গেল ধমক খেয়ে।

'থামো!' হন হন করে উপরে উঠতে শুরু করল গাজালা। 'থোড়াই পরোয়া করি আমি কারও। যাচ্ছ, যাও। কতদূর যাবে দেখে নেব আমি। এদেশ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে না—সে ব্যবস্থা আমি করছি। বাপের নাম যদি ভুলিয়ে না ছাড়ি···'

সময় নেই। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই দ্বিরুক্তি না করে দ্রুত পায়ে নামতে শুরু করল বরকতউল্লাহ। এত অল্পেই গাজালার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাওয়ায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে। এখন কোনমতে বড় রাস্তা পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারলে হয়।

কয়েক পা এগিয়ে চারতলার জানালার দিকে চাইল বরকতউল্লাহ। কেউ নেই জানালায়। বড় রাস্তার দিকে মোড় নিতে গিয়ে আবার চাইল সে পিছন ফিরে।

জানালা ভর্তি গাজালা। প্রাণপণে চিৎকার করছে, আর শাসানির ভঙ্গিতে তর্জনী নাচাচ্ছে। কি বলছে শোনা যাচ্ছে না এতদূর থেকে।

দ্রুত পা চালাল সে বড় রাস্তার দিকে।

হাতের সুটকেসটা ছোট হলেও বেশ ভারী। শুধু মস্তিষ্ক চর্চা করেছে সে এতদিন দেহের প্রতি অবহেলা করে, সেজন্য দুঃখ হলো ওর এখন। হাঁপাচ্ছে। পৃথিবীতে যুদ্ধ

করে বেঁচে থাকার অযোগ্য আন্‌-ফিট ইন্টেলেকচুয়াল সে। সামান্য ভার বইতেই হাঁসফাঁস শুরু করেছে ওর অপুষ্ট শরীর। বড় রাস্তায় উঠেই ট্যাক্সি পেয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ইয়ার খাঁ রোডে একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল বরকতউল্লাহ। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগোল হোটেলের খোলা দরজার দিকে। কিন্তু ট্যাক্সিটা অদৃশ্য হতেই ভীড় ঠেলে বাঁক নিয়ে দ্রুতপায়ে এগোল ফুটপাথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার সময় দেখল রিস্টওয়াচে। এতক্ষণে দিল মোহাম্মদের জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ওর চেহারার বর্ণনা দিয়ে চারদিকে খবর পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। আর কতক্ষণ নিরাপদে হাঁটতে পারবে সে রাস্তায়?

সিকি মাইল এগিয়ে বাম দিকের একটা আঁকাবাঁকা গলিতে ঢুকে হন হন করে আড়াইশো গজ হেঁটে পড়ল গিয়ে জাহাঙ্গীর রোডে। একটা টাঙায় উঠে মাইল দেড়েক এগিয়ে ছেড়ে দিল সেটাকেও। তারপর আধ মাইল হেঁটে ঘর্মাক্ত কলেবরে গিয়ে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া রোডের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেটের সামনে।

চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। দ্রুতপায়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। মাঝপথে দেখা হলো এক বুড়ির সাথে। কয়েক মাসের এক বাচ্চা কোলে নিয়ে সাবধানে নামছে, ফোকলা মুখে হাসছে, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসাবার চেষ্টা করছে বাচ্চাটাকে। লক্ষই করল না বরকতউল্লাকে।

ফোর্থফ্লোরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে প্যাসেজ ধরে খানিকদূর এগিয়ে 'দিলারা দুররানী' লেখা একটা দরজার সামনে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল বুকের ভিতর। রানীকে দেখতে পাবে ভাবলেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার শরীর। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছে সে রানীর। দুটো বছর বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে সে কথাটা, আজ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়নি রানীকে। প্রধান কারণ, রানীর চাঁছাছোলা ব্যবহার দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পারে মেয়েটা তাকে সাধারণ একজন মেসেঞ্জার বা পোস্টম্যানের অতিরিক্ত কিছু ভাবে না। ভাববার কারণও নেই। তথ্য সরবরাহ ছাড়া এ মেয়ের সাথে আর কোন সম্পর্ক স্থাপন ছিল ওর জন্যে নিষিদ্ধ। খুব সম্ভব ওর শিক্ষা-দীক্ষা বা পেশা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই রানীর। থাকলেই বা কি, বয়সের যে বিরাট পার্থক্য···

দরজা হঠাৎ খুলে গেল।

'একি! কী আশ্চর্য, আপনি! আপনি এখানে কি করছেন?'

ভিতরে ঢুকে পড়ল বরকতউল্লাহ। সুটকেসটা রাখল একটা চেয়ারের উপর, ধপাস করে বসে পড়ল পাশের চেয়ারটায়। কাঁপা হাতে কোটের একটা বোতাম খুলল এবং লাগাল।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানী। দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অবাক হয়ে দেখছে বরকতউল্লাকে। চোখে ফুটে রয়েছে নির্জলা বিস্ময়।

গত অক্টোবরে বাইশে পা দিয়েছে বিখ্যাত পপ্ গায়িকা দিলারা দুররানী—ওরফে রানী। লাহোরেই জন্ম ওর। বাবা বাঙালী, মা পাঞ্জাবী। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের কয়েক দিন পরই ওর বাবাকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। তিন দিন পর বাড়ি পৌঁছে দেয়া

হয় লাশটা। সারা শরীরে অসংখ্য নির্যাতনের চিহ্ন। লাশ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল ওর মা। এখন বদ্ধ উন্মাদ। আটকা আছে পাগলা গারদে। ফলে পৃথিবীতে রানী একা। নিজেকে উপার্জনক্ষম করে গড়ে নিতে হয়েছে ওকে এক বছরের মধ্যে—জমানো টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই। লাহোরের সেরা নাইট ক্লাবের পপ্ গায়িকা ও এখন। চমৎকার গলা। শুধু উর্দু নয়, নিত্য নতুন পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু ও ইংরেজী গান গেয়ে এবং সেই সাথে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে শ্রোতা ও দর্শকদের গত দুটো বছর।

একেবারে বাঙালী চেহারা পেয়েছে দিলারা দুররানী।

সুন্দরী নয়। অপ্সরা বলা যায় না ওকে। কিন্তু শরীর দেখলে চাকু বসে যায় বুকে—এমনি জাদু। পরিপূর্ণ উন্নত বুক। ক্ষীণ কটি। সুগঠিত নিতম্ব। লম্বা পা ফেলে গান গাওয়ার সময় পরিচ্ছদের স্বল্পতা রুচিবান দর্শকেরও বিরক্তি উৎপাদন করে না কখনও, বরং মনোরঞ্জন করে। হাজার দুয়েক বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে ওর গত দুই বছরে।

রানীর পিতৃ পরিচয় ও পরিণতির কথা জানতে পেরে দু'বছর আগে জটিলেশ্বর রায়ের এজেন্ট যোগাযোগ করে ওর সাথে। কাজের গুরুত্ব এবং বিপদের কথা না ভেবেই এক কথায় রাজি হয়ে যায় রানী। বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে সে প্রস্তাবটাকে। টাকা নিতে রাজি হয়নি। ফলে সংবাদ সরবরাহ ছাড়া আর কোন কাজ একে দিতে সাহস পায়নি জটিলেশ্বর—কারণ, সে জানে, টাকা না খাওয়াতে পারলে পুরোপুরি টোপ গেলে না কোন এজেন্ট, যে কোন মুহূর্তে ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে হাত থেকে। তবে অবজার্ভেশনে রেখেছে সে রানীকে—ওর ঘৃণাটা ঠিক মত কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে বড় সড় কাজ করিয়ে নেয়া যেতে পারে ওকে দিয়ে।

ছোটখাট প্রচুর কাজ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে করতে দেখে দিন দিন ওর উপর জটিলেশ্বরের আস্থা ঘন হয়ে আসছে। সেটা টের পায় রানী তার প্রতি অন্যান্য এজেন্টের সম্ভ্রমের ভাব দেখে।

কিন্তু বরকতউল্লার চোখে শ্রদ্ধা বা সমীহ ভাব দেখতে পেল না রানী—দেখল স্পষ্ট আতঙ্ক। মুহূর্তে সংক্রামিত হলো আতঙ্কটা ওর নিজের মধ্যেও। সুটকেসের দিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল মনটা।

'কি ব্যাপার! আপনি পালাচ্ছেন নাকি?'

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল বরকতউল্লাহ।

'হ্যাঁ। বসো, রানী, তোমার সাথে কথা আছে।'

'খারাপ কিছু ঘটেছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানী।

দিল মোহাম্মদের চেহারাটা ভেসে উঠল বরকতউল্লার মনের পর্দায়। ড্রইংরুমের কার্পেটে পড়ে আছে বিশাল দেহটা। রানীর দিকে তাকাল সে। এই বয়সেও রানীর মত মেয়েকে পেলে নতুন করে জীবনের স্বাদ গ্রহণে মেতে উঠতে পারত সে। কিন্তু পরিষ্কার টের পাচ্ছে সে মেয়েটার নির্বিকার অনাগ্রহ।

'কয়েক দিনের জন্যে তোমার এখানে থাকতে হবে আমাকে,' বলল বরকতউল্লাহ। 'আমি দুঃখিত··· কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।' সামনে ঝুঁকে পড়ল সে।

মুখটা ঘর্মাক্ত। 'মাত্র ক'টা দিন এখানে থাকব আমি।'

'এখানে থাকবেন?' রানী হতভম্ব। 'কিন্তু ঘর কোথায়? অসম্ভব··· এখানে কি করে থাকবেন আপনি?'

'এছাড়া বাঁচার উপায় নেই আমার।' সত্যি কথাটা অসহায় ভাবে বলল বরকতউল্লাহ। 'কথা দিচ্ছি, কোনরকম অসুবিধের কারণ হব না আমি তোমার। মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার। পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। তোমার সাহায্য ছাড়া এদেশ থেকে পালাতে পারব না, রানী।'

'কিন্তু একটা মাত্র বিছানা···' ডিভানের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সাথে বলল রানী। 'না, এখানে আপনার থাকা চলবে না।'

'বিছানা কে চায়? আমি মেঝেতে রাত কাটাব,' মিনতি ফুটে উঠল বরকতউল্লার কণ্ঠে। 'আমি তোমার ভয়ের কারণ হব না। বিশ্বাস করো, উপায় নেই বলেই তোমার কাছে আশ্রয় নিতে হচ্ছে আমাকে।'

বরকতউল্লার পাংশু মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল রানী। ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে খুঁজছে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল বরকতউল্লাহ। 'হ্যাঁ।'

দুই

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে চেয়ারে বসে আছে নীতিশ গুহ। লম্বা, ঋজু চেহারা। চওড়া কাঁধ। পেশীবহুল পেটা শরীর লক্ষ করার মত। নীতিশ গুহ জটিলেশ্বর রায়ের ডান হাত। জটিল রায় শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক, কিন্তু সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম কাজে পরিণত করবার দায়িত্ব ওর। ভাবনা চিন্তার ধার বিশেষ ধারতে হয় না ওকে—এক কথায় কাজের লোক। নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে সে জটিলেশ্বরের সহকারী হিসেবে গত সাত বছর ধরে।

শেরমান শরাফীর সাথে জটিলেশ্বরের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার শুনেই বুঝে নিয়েছে সে ব্যাপারটা। বলল, 'তার মানে বরকতউল্লাহ ধরা পড়লেই ধরা পড়ে যাচ্ছে দিলারা দুররানী, এবং সেই সাথে বাকি সবাই। কাজেই যা করার করতে হবে আমাদের ও ধরা পড়ার আগেই।'

মাথা ঝাঁকাল জটিলেশ্বর। গোটা দুয়েক টান দিয়ে হাতে নিল নিভু নিভু চুরুটটা। বাম হাতে চশমা ঠিক করল। তারপর হাসল।

'কি করতে হবে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। প্রশ্ন হচ্ছে কাকে দিয়ে করাচ্ছি?'

'সমরজিৎ।' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে জবাব দিল নীতিশ। 'আজই বিকেলের ফ্লাইটে রওনা হতে পারে ও। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে, অসুবিধে নেই। আজই রাতে কাজ সেরে ফিরে আসতে পারবে কাল সকালে।'

জটিলেশ্বর রায় কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল। 'তাই-ই। ঠিক আছে··· সে ব্যবস্থাই করো।' ফোনের দিকে আঙুল তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিল সে।

একটা ফাইলে মনোনিবেশ করল জটিলেশ্বর রায়। রিসিভার কানে তুলে নিয়ে অল্প দু'চার কথায় কাকে যেন বুঝিয়ে দিল নীতিশ সবটা ব্যাপার। তারপর

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিয়ে ফিরল বসের দিকে, 'ধরে নিন, কাজটা হয়ে গেছে, স্যার।'

ফাইল থেকে চোখ না তুলে মাথা ঝাঁকাল জটিলেশ্বর রায়। শেষ পাতাটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে সই করল নিচে, তারপর ফাইল বন্ধ করে OUT ট্রেতে ফেলে হাসল নীতিশের চোখের দিকে চেয়ে।

'অর্থাৎ, ইন্না লিল্লাহ না কি একটা যে পড়ে মোসলমানেরা, সেটা পড়ে দেয়া যায় এখন বরকতউল্লার নামে—কি বলো?'

'নিশ্চিন্তে।'

'তাহলে ওর বদলে আর একজনকে পাঠাতে হয় ওখানে। সুনীল কেমন হবে?'

'সুনীল নাগ? সে তো এ-ক্লাস অপারেটার, স্যার। খুব ভাল হবে।'

'কিন্তু শেরমান খুব একটা আশাবাদী নয়। ওর ধারণা সুনীল কাজ শুরু করবার আগেই ধরা পড়ে যাবে। তারিক এখন লাহোরে।'

'ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার?' আরও একটু সোজা হয়ে গেল খাড়া হয়ে বসা নীতিশের শরীরটা। 'তাহলে তো সত্যিই চিন্তার কথা।'

'খুব একটা চিন্তার কি আছে? একটা স্মোক স্ক্রিন তৈরি করে নিলেই হবে। এমন একজনকে সামনে ধরতে হবে যার পেছনে শিকারী হাউন্ডের মত লেগে যাবে তারিক আখতার। সেই ফাঁকে নিরাপদে ঢুকে পড়বে সুনীল ওদের আঙুল গলে।'

'এ রকম একজন লোক হাতের কাছে পাচ্ছেন কোথায়, স্যার?'

'পেয়ে গেছি,' কাগজ কাটা ছুরিটা নাড়াচাড়া শুরু করল জটিলেশ্বর। 'তারিকের এক নম্বরের শত্রুকে পাঠাব আমি লাহোরে। বেনামী টেলিফোনে জানিয়ে দেব ওকে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে খ্যাপা কুকুরের মত লেগে যাবে তারিক লোকটার পেছনে।'

'ফলে কি অবস্থা হবে লোকটার?'

বাঁকা হাসি ফুটল জটিলেশ্বরের মুখে। 'মারা পড়বে নির্ঘাত। সেটা কেবল তারিক নয়, আমার জন্যেও অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হবে।' চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'প্রশ্ন করতে পারো, সে লোক আমাকে বা তারিককে সুখী করার তেমন আগ্রহ বোধ করবে কিনা। আসল ব্যাপার জানলে নিশ্চয়ই সে মরতে রাজি হবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার জানবে না সে।' থামল জটিলেশ্বর। কি যেন পরীক্ষা করল নীতিশ গুহের মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল, 'তুমি জানো, রানা এখন এখানে?'

'মাসুদ রানা! তেহরানে?'

'হ্যাঁ। ওকেই পাঠাব ঠিক করেছি।' ছুরিটা রেখে দিয়ে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো খুঁটে তুলল গ্লাস-টপ টেবিলের উপর থেকে। সেটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'ব্রিগেডিয়ার তারিক হচ্ছে জেনারেল এহতেশামের ছোট ভাই। বাহাত্তর সালে মারা পড়েছিল জেনারেল বার্মায়—রানার হাতে। ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দেব আমরা তারিককে।'

মনে মনে শিউরে উঠল নীতিশ। রানার এই পরিণতির কথা ভাবতে পারে না সে। বসের মনোভাব যাই হোক, যত চরম পরাজয়ই ঘটে থাকুক না কেন—সেসব

অতীতের ব্যাপার। বুদ্ধির খেলায় হেরে গিয়ে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে মনে মনে। জটিলেশ্বরের প্রতি তার অগাধ ভক্তি, তার উজ্জ্বল, শাণিত বুদ্ধিতে সে মুগ্ধ, বিস্মিত। কিন্তু রানার প্রতিও রয়েছে তার এই বিস্ময়। রীতিমত শ্রদ্ধা করে সে রানাকে। শুধু বুদ্ধিমান নয়—লোকটা দুঃসাহসী এবং উদার। বার তিনেক জোর ধাক্কা-খেয়েছে ওরা এই লোকটার সাথে, হেরে গিয়ে দুঃখ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিহিংসা-ভাব জন্মেনি ওর মনে। এই আশ্চর্য প্রতিভাবান লোকটার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না নীতিশ।

'রানা যাবে পাকিস্তানে?'

'যাবে। ওর দুর্বলতম জায়গায় টোকা দেব আমরা। কিছু কিছু জোলো ভাবাবেগ রয়ে গেছে এখনও লোকটার মধ্যে—তারই সুযোগ নেব আমি। ও যাবে। এক ঢিলে কয়েকটা পাখি মারব আমি এবার।'

'বেঘোরে মারা পড়বে রানা, স্যার।'

'ও মারা পড়লে আমাদের লোকসান কি? তাছাড়া সর্বক্ষণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে যে লোক, তাকে মরতে হবে এমনিতেই— আজ হোক, কাল হোক। মরতেই হবে। মরার আগে আমাদের কিছু সার্ভিস দিয়ে যাক না। তুমি কি বলো?'

'আমি আর কি বলব, স্যার,' দুই হাতের তালু পরীক্ষা করছে নীতিশ। 'আপনি ওকে পাঠাতে চাইলে আমার বলবার কিছুই নেই। তবে মাসুদ রানা সত্যিই এসপিওনাজ জগতের বিস্ময়। বুঝতে পারছি না, ও যাবে কেন।'

'উপযুক্ত টোপ ফেললেই মাছে ঠোকর দেয়।' জটিলেশ্বর হাসল। 'আমি রানার জন্যে দারুণ মজার একটা টোপ ফেলছি। ওকে যেতেই হবে লাহোরে। বুঝলে?'

'কিন্তু··· স্যার··· রানা বি. সি. আই. এজেন্ট। বন্ধুরাষ্ট্রের···'

'ওকে বের করে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে। একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা-অফিস খুলেছে ও ঢাকায়।'

'সে ক্ষেত্রে···'

'চিনতে পারছি না নিজেকে।' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল বরকতউল্লাহ। 'গত পঁচিশটা বছর ছিল, ভালবেসে ফেলেছিলাম গোঁফটাকে।' বুক পকেট থেকে একজোড়া হর্ন-রিম্‌ড্ চশমা বের করে পরল। 'ওরা আমাকে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না, কি বলো তুমি?'

হাল ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে রানী। লোকটার অকস্মাৎ আগমন, প্রায় জোর করে আশ্রয় গ্রহণ, সাহায্য প্রার্থনা, বিচলিত করে তুলেছে ওকে।

'মাথার চুলগুলো এবার সাদা করতে হয়,' বরকতউল্লাহ বলে চলেছে দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে। 'ব্যাগে করে পেরোক্সাইড এনেছি। কিন্তু কিভাবে ব্যবহার করতে হয় ঠিক জানি না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রানীর দিকে চাইল। 'সাহায্য করতে পারো আমাকে?'

'না···পারব না আমি!' আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করে চাপা গলায় বলে উঠল রানী। লোকটার পাংশু, ডিম্বাকৃতি, লম্বাটে মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভীরু,

কাপুরুষ। কোন রকম ঝুঁকি বা বিরোধ এড়িয়ে নিজের অমূল্য প্রাণটা রক্ষা করেছে গত পঞ্চাশটা বছর। এরা ভয়ানক স্বার্থপর হয়। নিজের গায়ের চামড়া বাঁচাতে বিনা দ্বিধায় সর্বনাশ করতে পারে এরা অপরের।

'না পারলে তো মহা অসুবিধায় পড়ে যাব, রানী। পারতেই হবে যে!'

ভয়ে কেঁপে উঠল রানীর বুক। 'চলে যান! প্লীজ, আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান!'

বিরক্তির সাথে তাকাল বরকতউল্লাহ। 'বাজে বোকো না। শোনো, চা খাবে?' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'চায়ের সাজ-সরঞ্জাম কোথায় তোমার?'

অসুস্থ বোধ করছে রানী। মাথাটা ঘুরছে। হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতল মুঠো করে ধরে ফেলল ও। 'কেন আপনি যাচ্ছেন না? কেন! কতবার বলব এখানে আপনার থাকা সম্ভব নয়। আপনাকে আমি কোন রকম সাহায্য করতে পারব না।'

'পাগলামি কোরো না, রানী।' বরকতউল্লাহ চোখের চশমা খুলে অতি সাবধানে পকেটে ভরল। 'শোনো। তোমার জেনে রাখা দরকার আমি ধরা পড়লে তুমিও ধরা পড়বে। আমাকে ধরে পেটালেই গড় গড় করে বলে দেব সবার নাম। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, আর যাই হোক, এখানে আমি ধরা পড়ব না। বুঝতে পারছ না কেন, এখানে আমাকে থাকতে দিলে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। তুমিও ধরা পড়বে না তাহলে। দাঁড়াও, চায়ের ব্যবস্থা করি।'

বরকতউল্লাহ কিচেনে গিয়ে ঢুকতে রানী চঞ্চল দৃষ্টিতে চাইল ঘরের চারপাশে। পালাবার রাস্তা খুঁজছে যেন ও। পালানো উচিত, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু কোথায় পালাবে, কার কাছে? জটিলেশ্বর রায়ের এজেন্টের মিষ্টি কথায় এ কাজ নিয়ে কি পাপ করেছিল মর্মে মর্মে টের পাচ্ছে ও। কি কুক্ষণেই না রাজি হয়েছিল সে! স্পাই ধরা পড়লে তাদের দশা কি হয় সে গল্প একটা একটা করে মনে পড়তে লাগল। আচ্ছা, পুলিস ডাকলে কেমন হয়? বরকতউল্লাকে ধরিয়ে দিলে পাকিস্তান পুলিস কি তাকে ক্ষমা করবে না? না, তা করবে না। তাকেও ওরা ধরবে। নিজের শরীরে পুলিসের কর্কশ হাত—কল্পনা করতেই আবার ঘুরে উঠল মাথাটা। সে যা জানে সব বললেও ওরা বিশ্বাস করবে না, মনে করবে আরও বলার আছে। সেটুকু তার মুখ থেকে বের করার জন্যে তার শরীরের উপর···

চায়ের পট্ নিয়ে কিচেন থেকে ফিরে এল বরকতউল্লাহ।

'চুলগুলো সাদা করা হয়ে গেলে তুমি আমার কয়েকটা ছবি তুলবে।' পটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। 'সাথে ক্যামেরা আছে। আমার পাসপোর্টের জন্য ফটো দরকার।'

কিচেনে ফিরে গিয়ে কাপ আর পিরিচ নিয়ে এল সে।

'ফটো তোলার পর তোমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে একজন লোকের কাছে পাঠাব। লোকটা পাসপোর্টের এক্সপার্ট।' এক মুহূর্ত ভেবে আবার বলতে শুরু করল সে। 'পাসপোর্টটা হয়ে গেলেই আমি চলে যেতে পারি। ওরা জানে না আমার কাছে একটা ইরানী পাসপোর্ট আছে। চেহারা দেখে ওরা আমাকে চিনতে পারবে না। ট্যুরিস্ট হিসেবে বেরিয়ে যেতে পারব এদেশ থেকে।' চায়ের পটের মুখ সরিয়ে তাকাল রানীর দিকে। 'ক' চামচ চিনি দেব তোমার কাপে?'

চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানী। কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে।

ড্রাইভারহীন একটা মরিস মাইনর লাহোর এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে অপেক্ষা করছিল। সমরজিৎ নির্বিঘ্নে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে চড়ে বসল গাড়িতে। চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

অল্প বয়স সমরজিতের। দোহারা চেহারা! কিন্তু শক্ত সমর্থ। নীতিশ গুহের হুকুমের চাকর, নিযুক্ত খুনী। গত চার বছর ধরে নীতিশ গুহের অধীনে খুন করার চাকুরি করছে সে। দুই কুড়ি পুরো হবে আজ সে যদি বরকতউল্লাকে পায়। মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে এতটুকু বাধে না তার। জীবনের প্রথম খুন করার সময়ও কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি তার মধ্যে। খুন করা একটা সাদামাঠা কাজ ছাড়া আর কিছু নয় তার কাছে। ঠিকানা পেলেই সেই বরাবর হাজির হয়ে যাবে সে যমদূতের মত। কোন বিকার নেই। কলিং বেল টেপা, সিগারেট ধরানো, টাইয়ের নট ঠিক করা— এগুলোর মতই একটা সাধারণ কাজ এটা তার কাছে। গুলি করতে হলে মানুষের মাথাতেই গুলি করা পছন্দ করে সে। এবং তেমন অসুবিধে না থাকলে তাই করে।

সিটি ম্যাপ দেখে বরকতউল্লার ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না সমরজিতের। গলি-মুখের কাছেই মেইন রোডের উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল সে। দরজা বন্ধ করে পা বাড়াল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ওয়েস্ট ব্যান্ডের নিচে লুকানো পিস্তলটা স্পর্শ করে নিল। ভাগ্য বিরূপ না হলে কাল সকালেই তেহরানে ফিরে যেতে পারবে, আশা করছে সে।

টপ ফ্লোরে উঠে বরকতউল্লার দরজার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়াল। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ সরিয়ে আলতোভাবে কোটের পকেটে ভরে রাখল সেটা।

কলিং বেলে আঙুলের চাপ পড়ার পর এক মুহূর্তের নীরবতা। খুলে গেল দরজা এক ঝটকায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড একজন মানুষ। ছোট করে ছাঁটা চুল। চারকোনা বিরাট মুখ। উঁচু হাড় চোয়ালের। অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি।

সমরজিতের শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল তারিক আখতারকে দেখে। আগে কখনও সামনে থেকে না দেখলেও এর ফটো বহুবার দেখেছে সে তেহরান হেডকোয়ার্টারে।

তারিক আখতারকে ছাড়িয়ে সমরজিতের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সামনে। আরও তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে। দু'জনের হাতে স্টেনগান। তার দিকেই চেয়ে আছে নলের মুখ। সবাই চুপচাপ, অনড়। ঢোক গিলল সমরজিৎ।

'ইয়েস?' তারিক আখতারের গলা শান্ত। চেহারা দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই।

দ্রুত ভাবছে সমরজিৎ। বরকতউল্লাহ কি ধরা পড়েছে? সম্ভবত তাই। কেন ধরা পড়ল?

'মি. বরকতউল্লাহ এখানে থাকেন না?' সমরজিৎ জিজ্ঞেস করল। 'নানান ভাষা শেখান ভদ্রলোক, যতটুকু জানি।'

'ভিতরে এসো।' একপাশে সরে দাঁড়াল তারিক আখতার।

স্টেনগানের নলগুলোর দিকে তাকিয়ে ইচ্ছা না থাকলেও কামরার ভিতরে ঢুকল সে। অপর তিনজন লোক তাকিয়েই আছে চুপচাপ।

'মি. বরকতউল্লাহ এখানে নেই,' দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল তারিক আখতার। 'তোমার পাসপোর্ট দেখি?'

পকেট থেকে ইরানী পাসপোর্টটা বের করে বাড়িয়ে ধরল সমরজিৎ।

'মি. জটিলেশ্বর রায় কেমন আছেন, সমরজিৎ?' পাসপোর্টটা না দেখেই ছুঁড়ে দিল তারিক আখতার, দু'হাতে লুফে নিল একজন।

সমরজিৎ মৃদু হাসল নিঃশব্দে। 'বেঁচে আছেন। মেজর জেনারেল আকরাম হেলাল খান কেমন আছেন, মি. তারিক আখতার?' হেলাল খান তারিক আখতারের বস্।

'তিনিও বেঁচে আছেন,' বিরতি নিয়ে বলল তারিক আখতার। 'তুমি একটু দেরি করে ফেলেছ। আজ দুপুর দেড়টার দিকে বরকতউল্লাহ ভেগেছে। জটিলেশ্বরকে বলো, বরকতউল্লার ব্যবস্থা আমি করব। সে যেন ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে।' একটু হাসল ব্রিগেডিয়ার। 'তোমার অভিযান ব্যর্থ হলো বলে দুঃখিত। এই লোকের সাথে যাও, এয়ারপোর্টে পাসপোর্ট ফেরত পাবে।'

বেঁটে, মোটাসোটা লোকটা সমরজিতের পাসপোর্ট পকেটে ভরে দরজার দিকে এগোল। সমরজিৎ তাকে অনুসরণ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, সমরজিৎ,' তারিক আখতার বলল। 'এখানে ফেরত আসতে চেয়ো না। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি রয়েছে বলে এবার কিছুই বললাম না। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্মাদর পাবে না। বুঝতে পারছ?'

'শিওর,' সমরজিৎ বলল। 'সো লং।' মোটা বেঁটে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে। ফ্ল্যাট বাড়ির কোথাও একটা বাচ্চা কাঁদছে। থেমে দাঁড়িয়ে শুনল কান্নাটা। তারপর নামতে শুরু করল।

তিন

'দেখো সুন্দরী,' রানা বলল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাব আমি। দয়া করে গ্লাসটা শেষ করে কেটে পড়ো এবার।'

মেয়েটা সবে আঠারো কি উনিশ। দেখতে ভাল। ফিগারটাও চমৎকার। কিন্তু বড় বেশি কথা বলে। এই হোটেলে রানার ফ্লোরেই উঠেছে একটা স্যুইটে বাবার সাথে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে জ্বালাচ্ছে রানাকে।

অল্প বয়সে বখে যাওয়া অতি স্মার্ট মেয়েগুলোকে কেন যেন সহ্য করতে পারছে না রানা আজকাল। নিজেকেই প্রশ্ন করে সে মাঝে মাঝে—পুরানো, রক্ষণশীল হয়ে পড়ছে সে? যে যেমন, তাকে সেই ভাবে না নিয়ে তার কাছ থেকে নির্ধারিত কোন ব্যবহার আশা করছে? চাইছে তার নিজের রুচি অনুযায়ী চলুক আর সবাই?

ভেবে দেখেছে রানা, আসলে তা নয়। মনটা খোলাই আছে তার। কিন্তু খাঁটি বাঙালী ছাড়া কোন মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবে না সে মনপ্রাণ দিয়ে। বাঙালী

মেয়ের মায়াই আলাদা। অন্য জাদু!

এই অতি প্রগতিশীলা বিদেশিনী অনধিকার প্রবেশ করতে চাইছে, কচি দেহের গরিমায় জোর খাটাতে চাইছে ওর মনের উপর—তাই বিরক্তি ধরে গেছে।

'তাড়িয়ে দিচ্ছ আমাকে? আমি বুঝি দেখতে ভাল নই?' দুই কোমরে হাত দিয়ে উঁচু বুক আরও উঁচু করে তির্যক দৃষ্টি হানল অষ্টাদশী।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমাকে বাইরে যেতে হবে।'

কোটিপতি আফজাল হাতামীর একমাত্র সন্তান আফরোজা হাতামী। খুজিস্তানে বসত, বাপের সাথে তেহরানে এসেছে ভার্সিটিতে ভর্তি হতে। লেখাপড়া কতটুকু হবে বুঝতে অসুবিধে হয় না। এক ঢোকে শ্যাম্পেন শেষ করে গ্লাসটা সাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে রুখে দাঁড়াল।

'এই রকম দুর্ব্যবহারের কারণ? কি করেছি আমি? জানো, পুরুষরা আমাকে যৌবনের রানী বলে? যার দিকে চেয়েছি তাকেই জয় করে নিয়েছি আমি—তুমি কে আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার? ভেবেছ তোমার চেয়ে সুঠাম পুরুষ আর নেই পৃথিবীতে অত গর্ব কিসের? স্বীকার করছি, তোমার প্রতি দুর্বলতা এসে গেছে আমার। কিন্তু তাই বলে...'

এসব কথায় কান না দিয়ে জমা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল রানা, এমনি সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে বাম হাতে ইঙ্গিত করল রানা মেয়েটাকে বক বক বন্ধ করে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে।

'মাসুদ রানা বলছেন?' অপরিচিত কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা।

'বলছি,' কাবার্ডের গায়ে হেলান দিল রানা।

'আমি প্রসূন চ্যাটার্জী কথা বলছি। আপনি আমাকে চিনবেন না। শুজাউদ্দিন আপনার নাম্বার দিয়েছে আমাকে।'

টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল আফরোজা। রানার মাথার উপর উপুড় করল গ্লাসটা। শ্যাম্পেন শেষ, বরফের টুকরো দুটো মাথা থেকে পিছলে কাঁধে পড়ল। কাঁধ থেকে একটা টুকরো তখুনি পড়ল কার্পেটের উপর, দ্বিতীয় টুকরোটা পড়ছে না দেখে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে সেটাকেও ফেলে দিল রানা। দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। হাসছে।

'শুজাউদ্দিন...ঠিক...কে?' চিনতে পারছে না রানা।

'আপনাকে আমার দরকার, মিস্টার মাসুদ রানা। বিশেষ দরকার। কথা বলতে চাই আপনার সাথে। আর কোন উপায় না দেখেই আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'কি ব্যাপারে?'

'ব্যাপারটা একটু জটিল এবং গোপনীয়। ফোনে বলা যাবে না। বাচ্চা একটা মেয়ের জীবন নির্ভর করছে এর ওপর। বেশ কিছু ডলারও জড়িত।'

'কত?'

'খুব কম নয়,' প্রসূন চ্যাটার্জী বলল। 'আলাপ করবেন আমার সাথে?'

'করব, হয়তো,' বলল রানা।

'শাবিস্তাঁ বারে দশটা পর্যন্ত আমি থাকব। চেনেন?'
'শাবিস্তাঁ না চেনে কে?' রানা বলল। 'আমি যাব, হয়তো।'
রিসিভার নামিয়ে রেখে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। দরজার বাইরে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছিট আছে নাকি মাথায়?
'কি? পছন্দ হয়?' ভুরু নাচাল আফরোজা।
'বাথরুমে যাও এখুনি,' রানা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'মনটাকে ভাল করে ধুয়ে ফেলো সাবান দিয়ে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে কী হোলে চাবি ঘোরাল ও।
ঝাড়া পাঁচ মিনিট চেঁচামেচি গালাগালি করে দরজার কাছ থেকে বিদায় নিল মেয়েটা। রানা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল একটা।
প্রসূন চ্যাটার্জী কে? শুজাউদ্দিনই বা কে হতে পারে? খানিক মাথা ঘামাতেই মনে পড়ল, এই নামের একজন লোককে চেনে ও। লোকটা তেহরানেরই একটা বারের ম্যানেজার। শুজাউদ্দিন শাফা। ওখানে প্রায়ই যেত ও। একটা ছোট্ট ব্যাপারে সাহায্য করেছিল রানা লোকটাকে কয়েক বছর আগে। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতেই প্রশ্ন ভেসে এল। শুজাউদ্দিনকে চাইল রানা। নিজের পরিচয় দিল। খানিক পরেই দরাজ কণ্ঠ ভেসে এল শুজার। 'মাসুদ রানা সাহেব?'
'বলছি! প্রসূন চ্যাটার্জী কে?'
'সেই ছোকরা!' বিরক্তি ফুটে উঠল শুজার কণ্ঠে। 'কয়েকঘণ্টা আগে আমার কাছ থেকে বিদায় হলো। যুবক, বয়স বাইশ-তেইশ—হোমো, কিন্তু বিদ্যা ছুঁয়ে বলতে পারব না। ছোকরা একটা কাজ করাতে চায়। কি কাজ? আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। জানি না কি কাজ। ছোট একটা মেয়ের ব্যাপারও নাকি জড়িত। আপনার নামটা হঠাৎ কেন যেন মাথায় চলে এল, বললাম ওকে। ভুল করেছি?'
'না,' রানা বলল। 'ধন্যবাদ।' রিসিভার ক্রেডলে রাখল ও। কয়েক মিনিট চিন্তা করল। বেড়াতে এসেছে ও ইরানে। ছুটি শেষ হতে এখনও দুই হপ্তা আছে। কিন্তু দেশে ফিরতে হবে তার আগেই। টাকা নেই, সব শেষ হয়ে এসেছে দু'হাতে বেপরোয়া ভাবে খরচ করায়। জুয়ো খেলে টাকা তোলার ইচ্ছে নেই ওর। দেখাই যাক না কি বলে প্রসূন চ্যাটার্জী। টাকার নাম যখন নিয়েছে তখন কাজের ধরনটা জানতে আপত্তি কি? ছুঁটি কাটাতে এসে যদি ফালতু কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না।
শাবিস্তাঁ বার তেহরানের কমার্শিয়াল এলাকায়। দু'একবার আগেও গেছে ওখানে রানা। সমকামীদের আড্ডা এই বার। সুদর্শন ছেলেরা খদ্দেরের আশায় ভিড় জমায়। মেয়ে খুব কম। ছেলেদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তেমন সুবিধে করতে পারে না ওরা এখানে।
সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নামার সময় তুমুল বাজনার আওয়াজ শুনল রানা। দরজা পেরিয়ে বারে ঢুকে পড়ল ও। ঘামের গন্ধ, ট্রাম্পেট ও ড্রামের আওয়াজ, আর তারস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি—এক সাথে এতগুলো জিনিস আক্রমণ করল ওকে। কামরার চারদিকে তাকিয়ে পা বাড়াল ও বারম্যানের দিকে।
'হ্যালো, ইমাম,' রানা বলল। 'প্রসূন কোথায়?'
'দারুণ রুচি আপনার, মি. মাসুদ,' দাঁত বের করে হাসল ইমাম। 'বড় সুন্দর

ছেলে! ভাল পছন্দ করেছেন। ওই ওপাশে যান—চার নম্বর রুমে।'

'একা?'

'নিশ্চয়ই!' চোখ টিপল ইমাম। 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে।'

একটা সরু প্যাসেজ ধরে এগোল রানা। দু'পাশে বন্ধ দরজা। চার নম্বর কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নক করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ছোট্ট একটা কামরা। ওয়াল ক্যাবিনেটের সামনে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। মদ ঢালছে গ্লাসে। ঘরে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল। টেবিলে একটা গ্লাস—অপরটা যুবকের হাতে। এক পাশে সিঙ্গেল খাট একখানা।

'প্রসূন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যুবক। লম্বা চুল, লাল প্লেবয় শার্টের কলার ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেছে। খয়েরী চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, রোগা-পাতলা চেহারা, কিন্তু ভরাট গাল। মেয়েলী।

'হ্যাঁ। আসুন,' প্রসূন বলল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বসুন।'

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টোবাকো ফ্যাক্টরি তেহরানের দোখানিয়াৎ-এর তৈরি স্পেশাল পলমল সিগারেট বের করে ধরাল রানা। বসল।

'কিছু মনে করবেন না, মি. রানা, এক্ষুণি আলাপের সূত্রপাত করছি আমি।' দুটো গ্লাসেই হুইস্কি ঢালল প্রসূন। 'আপনাকে একটা কাজ করে দেবার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি। কাজটা যদিও সম্পূর্ণ বেআইনী, কিন্তু পেছন থেকে ছোবল খাওয়ার কোন ভয় নেই। পুরস্কার: পঁচাত্তর হাজার ডলার। অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমার। প্রাঞ্জল?'

'সবটুকু শুনতে চাই আমি।'

'আপনার সম্পর্কে শুজাউদ্দিন শাফার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি আমি,' প্রসূন নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বলল। 'যতটুকু জেনেছি, আমি সন্তুষ্ট। আপনার মতই একজন দুঃসাহসী এবং সহানুভূতিশীল মানুষ আমার দরকার। সব কথা বলতে হবে আপনাকে, তাছাড়া উপায় নেই কোন। ঘটনাটা শুনুন। আফগানিস্তানে চাকরি করছিলাম আমি। আমেরিকান এমব্যাসীতে। অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক। ওখানে সি.আই.এ.-র তৎপরতার কথা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার? বিরাট টীম। এলাহি কারবার। ওদের বেতন দেয়া হয় ডলারে। এক তারিখে এমব্যাসীর গাড়িতে পাঠানো হলো আমাকে ব্যাঙ্ক থেকে বেতন তুলে আনতে। সাথে একজন আর্মড গার্ড। ঠিক করলাম ডলারগুলো মেরে দিতে হবে।'

'কিভাবে?'

'সহজ ব্যাপার। চেক জমা দিয়ে টোকেন নিলাম, তারপর ভেতরে ঢুকে পরিচিত ক্লার্কের সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। ঠিক যখন আমার টোকেনের নম্বর ডাকবার সময় হয়ে এল তখন বেরিয়ে এসে গার্ডকে পাঠালাম পোস্ট অফিস থেকে রেভিনিউ স্ট্যাম্প কিনে আনতে। বললাম, নইলে ডলার তোলা যাবে না। সে ব্যাটা ছুটল স্ট্যাম্প কিনতে। আমি সমস্ত ডলার ব্যাগে পুরে ড্রাইভারকে গিয়ে বললাম—গাড়ি ছাড়ো। সে ব্যাটা নড়ে না, গার্ডের আশায় চায় এদিক-ওদিক। বললাম, গার্ডের আশায় বসে থাকলে সব টাকা হাইজ্যাক হয়ে যাবে, বাজে লোক লেগেছে পেছনে। ব্যস, আর কিছু বলতে হলো না, ছেড়ে দিল গাড়ি। এর পরের

ব্যাপারগুলো খুব সংক্ষেপে বলি, নির্জন রাস্তায় এসে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ঠেলে নামিয়ে দিলাম ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে। ছুটলাম। কিন্তু পুলিসও ছুটল। গাড়ি ছেড়ে দিয়েও নিস্তার পেলাম না, আশি হাজার ডলার নিয়ে পাগলের মত পালিয়ে বেড়ালাম কয়েকদিন তাড়া খেয়ে খেয়ে।' গ্লাসে চুমুক দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল প্রসূন। 'বর্ডার টপকে পালিয়ে গেলাম—গেলাম কোথায়? বাঘের ভয়ে পালালাম, পালালাম বাঘেরই ঘরে। পাকিস্তানে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তখন।' আবার থামল প্রসূন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। 'আগ্রহ বোধ করছেন, নাকি অনর্থক বিরক্ত করছি আপনাকে?'

'বলে যাও,' সিগারেটে টান দিল রানা। 'অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে খারাপ লাগে না আমার।'

ঠোঁট লম্বা করে হাসল প্রসূন।

'যাক, পাকিস্তানে পৌঁছলাম। ওখানেও পিছু নিল পুলিস। আফগানিস্তানে থাকতে ভেবেছিলাম ওখানকার পুলিস আমাকে পেলে মেরেই ফেলবে। কিন্তু পাকিস্তানী পুলিস এমনভাবে পিছু লাগল যে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আত্মহত্যা করলেও ওরা আমাকে রেহাই দেবে না, লাশ নিয়েও যাচ্ছে তাই করবে। সব ক'টা হোমোসেকসুয়াল। যাক, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন মতে পৌঁছলাম লাহোরে। আমার এক বন্ধু, আরিফ খাস্তগীর, ওখানে ছিল। সব বললাম ওকে, ওর ওখানে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু গন্ধ শুঁকে শুঁকে পুলিসও এসে হাজির। কোনরকমে জান বাঁচিয়ে দুই বন্ধু এবং ওর পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে সিমিকে নিয়ে পালালাম। আরিফের এক পাঠান বন্ধু ফারুক, সেখানে আশ্রয় পেলাম। তার সাথে কথা হলো, পাঁচ হাজার ডলার দিলে সে আমাদেরকে লুকিয়ে রাখবে, খাবার সরবরাহ করবে এবং অবস্থা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে বর্ডার পার করে ইরানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে সেই যে গেল আর ফিরল না লোকটা। ঘরে সামান্য কিছু খাবার ছিল, ফুরিয়ে এল। আমরা ঠিক করলাম খাবার যেটুকু আছে সিমি খাবে, আমরা পানি খেয়ে থাকব। আরও তিনদিন কেটে গেল। খাইনি কিছু।' রানার দিকে তাকাল প্রসূন। 'একনাগাড়ে তিনদিন না খেয়ে ছিলেন কখনও আপনি?'

'জেনে কি হবে তোমার?' রানা বলল। 'বলে যাও।'

'হ্যাঁ...তারপর, চারদিনের দিন সকালে আমরা মুখোমুখি হলাম চরম সত্যের। খিদেতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন করে হোক খাবার সংগ্রহ করতে হবে। দু'মিনিট অন্তর অন্তর সিমির জন্যে বাঁচিয়ে রাখা সামান্য খাবারের দিকে চাইছি। অথচ বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আমরা কোন্ এলাকায় আছি, জানা ছিল পুলিসের, কিন্তু হাউজ টু হাউজ সার্চ না করে অপেক্ষা করাই স্থির করেছিল ওরা। নিচে, রাস্তায় ওদের আনাগোনা দেখেছি আমরা—জানি বাইরে বেরোলেই কারও চোখে পড়ে যেতে পারি। কিন্তু উপায়ও নেই। ঠিক হলো, একজন যাব। কে যাবে? টসে যে হারবে, সে। টস হলো। আমি হারলাম। কিন্তু কিছুতেই বেরোতে পারলাম না। সাহসই সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম না। বার কয়েক চেষ্টা করে জানিয়ে দিলাম পারব না। অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত দুপুরের দিকে আরিফ নিজেই যাবে স্থির করল। মেয়েটাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।'

কথা বলতে বলতে মাথাটা ঝুঁকে পড়ল প্রসূনের।

'সিমির জন্যে রাখা বিস্কুটের প্যাকেট খুলে খেতে শুরু করলাম আমি। ওকে বোঝালাম, অনেক খাবার নিয়ে আসছে এখুনি ওর আব্বা, কোন চিন্তা নেই। শুকনো বিস্কুট গলায় আটকে যাওয়ায় জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েছি, এমনি সময় নিচে গুলির আওয়াজ শুনলাম। এক লাফে জানালার পাশে গিয়ে পর্দা ফাঁক করলাম। দেখলাম প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে আরিফ রাস্তার মাঝখান দিয়ে—পিছনে ছুটছে দু'জন খাকি পোশাক পরা লোক। আবার গুলি হলো। দুই হাত শূন্যে তুলে দড়াম করে রাস্তার উপর আছড়ে পড়ল আরিফ।' কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল প্রসূন। মাথাটা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'পালালাম। বুঝলেন? এমন প্রচণ্ড আতঙ্ক হলো যে সিমিকে ফেলে পালিয়ে গেলাম আমি ছাত টপকে। শুধু সিমি নয়, টাকাগুলোও। শুধু প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি ইরানে। একটা সিগারেট দেবেন?'

প্যাকেটটা এগিয়ে দিল রানা। গম্ভীর চোখমুখ। কাঁপা হাতে সিগারেটে আগুন ধরাল প্রসূন।

'খুঁটিনাটি সব বলে বিরক্ত করতে চাই না আপনাকে। এখানে পৌছেছি গত পরশু। এখন আমি নিরাপদ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, গত পাঁচ দিন ঘুমাতে পারছি না এক দণ্ডও। চোখের পাতা বুজলেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সিমির মুখ। এই পাঁচ দিন ও কোথায় আছে, কেমন ভাবে আছে, কি খেয়ে আছে, ওখানেই আছে না-ধরা পড়েছে—কিচ্ছু জানি না। ওখানেই যদি থাকে, মা-হারা যে মেয়ের ঘুম আসত না বাপের কোলে না শুলে, ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠত যে মেয়ে, সে একা লাহোরের সেই ঘরটিতে কি করে আছে, রাতটা ওর কাছে কেমন লাগছে ভাবতেই মাথাটা গুলিয়ে আসতে চায় আমার। জানি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। বিবেক বলে কোন জিনিস আমার মধ্যে নেই। থাকলে ওকে ওভাবে ফেলে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারতাম না। তবু বিবেকের যেটুকু ছিটেফোঁটা এখনও রয়েছে তার দংশনে মরে যাচ্ছি আমি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'তোমার কি মনে হয় ও এখনও ওই ঘরেই আছে?'

'জানি না। মরে না গিয়ে থাকলে হয় আছে, নয় ধরা পড়েছে, নয় তো খিদের জ্বালায় বেরিয়ে পড়েছে—ভিক্ষা করছে পথে পথে। ধরা পড়ে থাকলে আমার বলার কিছুই নেই, আপনারও করার কিছুই নেই। কিন্তু তা যদি না হয়, দয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আপনি মেয়েটাকে। বিনিময়ে সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার ডলার দেব আমি আপনাকে।'

'ডলারগুলো কোথায়?'

'ওই ঘরেই। এমন এক জায়গায় আছে যেখানে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। রওনা হওয়ার আগে আমি বলব আপনাকে জায়গাটার কথা। অর্ধেক আমার, অর্ধেক আপনার।'

'বাচ্চাটা কয় বছরের বললে?'

'পাঁচ, কি ছয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তুমি যে কাজ পারবে না সে কাজ আমি পারব, তোমার এরকম ধারণার কারণ

কি?'
'পুলিস ওখানে খুঁজছে আমাকে এখনও। আপনাকে খুঁজছে না। আমার চেহারার বর্ণনা রয়েছে ওদের কাছে, আপনারটা নেই। আপনি ট্যুরিস্ট হিসেবে যাবেন, থাকবেন দু'দিন একদিন তারপর কাজ উদ্ধার করে সোজা ফিরে আসবেন এখানে। সহজ কাজ। আজকাল পাকিস্তানী কাস্টমস্ ট্যুরি'দের ব্যাগও চেক করে না।'

'ধরো টাকাগুলো পেলাম আমি,' রানা বলল। 'আমি তোমাকে অর্ধেক দেব তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

দেঁতো হাসি দেখা দিল প্রসূনের মুখে। 'জুয়ো খেলে না মানুষ? ওই ডলার নিজে কোনদিনই উদ্ধার করতে পারব না। কারও না কারও সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। কাউকে না কাউকে বিশ্বাস আমার করতেই হবে। তবে পালিয়ে আপনি যেতে পারবেন না। আজ হোক, কাল হোক দেখা আমাদের হবেই। তখন আপনার বিপদ হবে।' হাসছে না প্রসূন।

'দেখা ঠিকই হবে, কিন্তু বিপদটা কার হবে বলা মুশকিল,' হাসল রানা চেয়ারে হেলান দিয়ে। 'আমার ওপর অতিমাত্রায় আস্থা স্থাপন হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে, তা আমি জানি।' প্রসূন গম্ভীর। 'আপনি সৎলোক, শুনেছি। কিন্তু এটা শোনা কথা। আপনার ওপর ঠিক কতখানি ভরসা করা যায় জানা নেই আমার। আমি ধরে নিয়েছি এটা একটা জুয়োই। হ্যাঁ-না বলুন এবার।'

'আরও ভাবব আমি,' রানা বলল। 'টাকাগুলো কোথায় লুকোনো আছে?'

'সেকথা বলব এয়ারপোর্টে। আপনি যখন আমাকে আপনার এয়ার টিকেট দেখাবেন।'

'ভাড়া দিচ্ছে কে? রিটার্ন টিকেট এবং ওখানকার খরচের জন্যে বেশ কিছু টাকার দরকার পড়বে।'

'তাও ভেবেছি আমি। পারব দিতে।'

'বেশ। করতেও পারি কাজটা,' রানা জানাল। 'আগামীকাল সকাল দশটায় ফোন কোরো।' উঠে দাঁড়াল ও। জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শাবিস্তাঁ বারের কাছাকাছি কাফে গুলবাগ। দশ মিনিট হেঁটে পৌঁছে গেল রানা সেখানে। ইতিমধ্যেই কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে সে। ডেইলি আফগানিস্তানের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট নাসির বখ্ত্ আফগান রয়েছে তেহরানে। পুরানো বন্ধুত্ব একটু ঝালিয়ে নিলেই প্রসূন চ্যাটার্জীর কাহিনীর সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে। গাইড-বুক থেকে নম্বরটা খুঁজে বের করে ডায়াল করল রানা।

'মাসুদ রানা!' পরিচয় পেয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে রানার কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল আফগান। 'সোবহানআল্লাহ। কী সৌভাগ্য আমার...'

'চেঁচাচ্ছ কেন?' ধমক দিল রানা। 'সাধে আর তোমাকে কমবখ্ত্ আফগান বলে না মানুষ। আস্তে করে বলো দেখি চাঁদ কেমন আছ?'

'আল্লার রহমত।' দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল নাসির বখ্ত্। 'ভাল আছি। তোমার খবর কি? কোত্থেকে বলছ, দোস্ত্?'

'তেহরান থেকে।'

'তা তো বুঝলাম,' আফগান অসহিষ্ণু। 'তেহরানের কোথা থেকে? ফোন কেন? গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, সোজা চলে এসো।'

'উঁহুঁ। তোমার মত বিনা কাজে মোটা বেতন মারার উপায় আমার নেই, দোস্ত। কাজ আছে। একটা খবর চাই, আফগান।'

'খবর?'

'দিন কয়েক আগে কাবুলের আমেরিকান এমব্যাসীতে কোন রকম চুরি-ডাকাতি হয়েছিল নাকি?'

'হয়েছিল। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? আশি হাজার ডলার হাইজ্যাক করেছিল ওদেরই এক হিন্দু অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। মেরে দিয়েছিল পে-রোল। কিন্তু সে খবর জেনে তোমার...'

'কৌতূহল,' মুচকি হাসল রানা। 'ব্যাপারটা একটু ভেঙে বলো দেখি? কি নাম ক্লার্কের, তারপর কি হলো?'

'লোকটার নাম প্রসূন, খুব সম্ভব চ্যাটার্জী। ছোকরা বয়সী। কাবুল পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানে। কিন্তু হজম করতে পারেনি টাকাগুলো। আশি হাজার ডলারের খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল ওপারে। ফলে পাকিস্তানী পুলিস লেগে গিয়েছিল পেছনে। লেটেস্ট গুজব হচ্ছে লাহোরে ধরা পড়েছে ব্যাটা, ওর এক বন্ধু কি এক খাস্তগীর মারা পড়েছে পুলিসের গুলিতে। কি ব্যাপার, তোমার কাছে কোন স্পেশাল নিউজ আছে বলে মনে হচ্ছে?'

'দেখো, কমবখ্‌ত্‌, সব কিছুতেই নিউজ খোঁজা তোমার বদভ্যাস হয়ে গেছে। এনিওয়ে, পরে দেখা করব, এখন ছাড়ি।'

আস্তে করে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রানা। মনে হচ্ছে, মিথ্যে বলেনি প্রসূন ছোকরা। তাছাড়া মিথ্যে কাহিনী শুনিয়ে কি লাভ ওর? তার উপর যাতায়াত খরচের ব্যাপারেও যখন ইনভেস্ট করতে রাজি হয়ে গেছে ছোকরা, ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর তাই যদি হয়...বাচ্চা সিমির কথা মনে আসতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। যেমন করে হোক মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেই হবে। টাকার কথা পরে—আগে মানুষ। ইশারায় ট্যাক্সি ডাকল রানা কাফে গুলবাগ থেকে বেরিয়ে।

রানা যখন কথা বলছে নাসির বখ্‌ত্‌ আফগানের সাথে, ঠিক তখন, রানার চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিল প্রসূন চ্যাটার্জী, ওরফে প্রাণেশ মজুমদার। বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

'ইয়েস! রায় স্পীকিং।' জটিলেশ্বর রায়ের গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'প্রাণেশ বলছি, স্যার।'

'বলো।'

'আপনার পার্টি আগামীকাল সকাল দশটায় সিদ্ধান্ত নেবে। বাজী রেখে বলতে পারি—যাবে।'

'আমি জানি, যাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল জটিলেশ্বর।

হোটেলের সাততলায় এলিভেটর থেকে নেমে করিডর ধরে এগোল রানা। বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়াল। সেই মেয়েটা!

লাল টকটকে টাইট একটা প্যান্ট পরে পদ্মাসনে বসে আছে করিডরের কার্পেটের উপর, ওর রুমের দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। ভাঁজ করা ডান পা-টা দ্রুত দুলছে, হাসছে রানার দিকে চেয়ে।

'হ্যালো, বয়ফ্রেন্ড...মেজাজ কেমন? চোর এসেছিল তোমার ঘরে...'

সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'সরো।'

'কানে কালা নাকি তুমি?' মেয়েটা হাসছে আগের মতই। 'চোর ঢুকেছিল তোমার রুমে।'

'ঠিক আছে। চোর ঢুকেছিল আমার ঘরে। ধন্যবাদ। এবার তুমি সরো। যাও।'

'ইয়া তাগড়া এক লোক। তোমার চেয়েও দেখতে অনেক ভাল।' মেয়েটা কথা ছাড়া থাকতে পারে না। 'বামদিকের কানের লতি নেই, এইটুকুই যা খুঁত, কিন্তু থুতনির বাম পাশে কি সুন্দর লাল জড়ুল। চাবি নিয়েই এসেছিল, বুঝলে? আমি চুপচাপ বসে ছিলাম ওই সিঁড়ির ধাপের উপর।' আঙুল বাড়িয়ে সিঁড়িটা দেখাল সে। 'দেখেনি আমাকে। বসে বসে সুন্দর সিনেমা দেখলাম।'

সচেতন হলো রানা। বাঁ কানের লতি নেই, তাগড়া চেহারার লোক মানেই চন্দ্রগুপ্ত। নীতিশ গুহের লোক। আর নীতিশ গুহ হচ্ছে জটিলেশ্বর রায়ের লোক। ব্যাপার কি!

'কি, কৌতূহল বোধ করছ?' উঠে দাঁড়াল আফরোজা হাতামী। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। 'কিছু চুরি করেনি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। চুরি করেনি দেখেই মিছে গোলমাল পাকালাম না, নইলে ফিরে এসে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পেতে ওকে। কিন্তু কি রকম লোক তুমি! আমি তো আমি, চোর পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে যায় তোমার ঘর থেকে! তুমি একটা মানুষ, না কি!'

মেয়েটাকে অগ্রাহ্য করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রানা। পিছন পিছন ঢুকল আফরোজা। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে আফরোজার দিকে ফিরল রানা।

'কতক্ষণ ছিল লোকটা?'

'বিশ মিনিট।' হাসল। 'ছি, ছি! লজ্জা! একটা পাকা চোর বিশ মিনিটের মধ্যেও চুরি করার মত কিছু খুঁজে পেল না। চেহারাটা ছাড়া আর আছেটা কি তোমার শুনি? এই গর্বেই মাটিতে পা পড়ে না—আর কিছু থাকলে কি অবস্থা হত?' খাটের উপর উঠে বসল মেয়েটা। 'যাই হোক, শ্যাম্পেন খাওয়াও, তারপর আমার দারোয়ানগিরির পাওনা চুকিয়ে দাও, বিদায় হই।'

পায়ে পায়ে ঘরের চারদিক হাঁটাহাঁটি করে রানা বুঝল কিছুই চুরি যায়নি। চন্দ্রগুপ্তের অনুপ্রবেশ বিচলিত করে তুলেছে ওকে। জটিলেশ্বরের নির্দেশে এসেছিল লোকটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? আবার কি জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইছে জটিল রায়? অনেক ভেবেও এই ঘরে চন্দ্রগুপ্তের উপস্থিতির কোন যুক্তিযুক্ত

কারণ খুঁজে বের করতে পারল না রানা। লোকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ—সুযোগ পেলেই দ্বিধা করবে না ওকে বিপদে ফেলতে। খুঁতখুঁত করছে মনটা। শ্রাগ করল আপন মনে। হয়তো সত্যিই কোন চোর এসেছিল, লোকটা হয়তো আদতেই চন্দ্রগুপ্ত নয় ভেবে দুশ্চিন্তা দূর করে দিল সে গায়ের জোরে। পিছন ফিরতেই মেয়েটির উপস্থিতি টের পেল নতুন করে। শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলেছে সে। পরনে শুধু টপলেস সাঁতারের পোশাক। চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা একমিনিট। তারপর হাসল রানা। বের করল শ্যাম্পেনের বোতল।

রানার হাসি দেখে ফিক করে হেসে উঠল আফরোজা।

'আমি নারী। বারবার অস্বীকার করতে পারো না তুমি আমাকে।'

চার

পিছনে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রগুপ্ত জটিলেশ্বর রায়ের ডেস্কের সামনে। নীতিশ গুহ, চন্দ্রগুপ্তের ইমিডিয়েট বস্, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে রাজপথের দিকে। ডেস্কের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে নিভে যাওয়া চুরুট চিবুচ্ছে, আর পেপার নাইফটা নাড়াচাড়া করছে জটিলেশ্বর রায়।

অফিস রুমের ভিতর অস্বস্তিকর উত্তেজনা।

'কেন জানি না, প্রত্যেকটা পরিকল্পনা নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কাজে হাত দিলেই কোথাও না কোথাও একটা গোলমাল বেধে যাবেই!' জটিলেশ্বর রায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট উষ্মা প্রকাশ পেল। 'সমরজিৎ রিপোর্ট পাঠিয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে সে। বরকতউল্লাহ পালিয়েছে, এবং বেঁচে আছে।'

জানালার কাছ থেকে নীতিশ গুহ ঘুরে দাঁড়াল। 'সমরজিৎ দায়ী নয়, স্যার। শেরমানের ইনফরমেশন পেয়েছি আমরা অনেক দেরিতে।'

'ওটা খোঁড়া যুক্তি। সমরজিৎকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে তারিক আখতার। সে আর যেতে পারছে না। তারিকের হাতে বরকতউল্লাহ পড়লে আরও দু'জন এজেন্টকে হারাচ্ছি আমি।'

নীতিশ গুহ কথা বলল না। সে এবং চন্দ্রগুপ্ত দৃষ্টি বিনিময় করল। এসব অযৌক্তিক দোষারোপের কোন উত্তর নেই। অপেক্ষা করছে ওরা। একটা কিছু সমাধান আসবে এক্ষুণি।

'যাক, রানা অন্তত লাহোরে যাবে,' খানিক চুপ করে থেকে বলল জটিলেশ্বর রায়। 'এই ব্যাপারটা স্বয়ং আমি তদারক করব।' অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চন্দ্রগুপ্তের উপর গিয়ে পড়ল। 'তোমার রিপোর্ট কি?'

'মাসুদ রানার হোটেল রুমে গিয়েছিলাম আমি,' চন্দ্রগুপ্ত বলল। 'ওর সুটকেসে আপনার দেয়া এনভেলাপটা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি। সুটকেস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত কেউ সেটা খুঁজে পাবে না।'

'ওরা যখন ধরবে তখন সুটকেসটা টুকরো টুকরো করে অবশ্যই দেখবে,' বলল নীতিশ।

'তোমাকে কেউ দেখেনি ওর রুমে ঢুকতে?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জটিলেশ্বর রায়ের।

চন্দ্রগুপ্তের উপর থেকে চোখ সরায়নি সে।

হাসি চেপে রাখল চন্দ্রগুপ্ত। জটিলেশ্বর রায়ের সামনে হাসতে সাহস হয় না। 'না স্যার। কেউ দেখেনি।'

জটিলেশ্বর খানিকটা নরম হয়ে বলল, 'নীতিশকে কিছুটা বলেছি, কিন্তু অপারেশন সম্বন্ধে সব জানা দরকার তোমারও।' হেলান দিল সে চেয়ারের পিঠে। ধরিয়ে নিল নিভে যাওয়া চুরুটটা। 'আমরা চাই সুনীল নাগ নির্বিঘ্নে লাহোরে গিয়ে পৌছোক। এজন্যে মাসুদ রানাকে ব্যবহার করছি আমরা স্মোক স্ক্রীন হিসেবে। তারিক আখতার যেইমাত্র জানতে পারবে লাহোরে এসেছে মাসুদ রানা, অমনি ধরে নেবে বরকতউল্লার জায়গায় ওকেই পাঠিয়েছি আমরা। রানা আমাদের বন্ধু দেশের এজেন্ট ছিল। সুতরাং তারিক ভাববে কোন বিশেষ কারণে ও সাহায্য করছে আমাদের। যাই হোক, রানা ও তারিকের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা রয়েছে আগে থেকেই, কাজেই এতকিছু ভাবার প্রয়োজন বোধ নাও করতে পারে। সব কাজ ফেলে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে ও রানার উপর। সেই সুযোগে অনায়াসে ঢুকে পড়বে সুনীল। আমাদের মূল সমস্যাটা ছিল: কিভাবে রানাকে রাজি করানো যায় লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে। সেটা প্রায় সমাধান করে এনেছি। আমাদের আসল উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেলে কিছুতেই যাবে না ও লাহোরে—কাজেই খানিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।' পেপার নাইফটা হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল জটিলেশ্বর রায়। 'কয়েকদিন আগে কাবুলে আমেরিকান এমব্যাসীর আশি হাজার ডলার মেরে দিয়ে লাহোরে পালিয়ে যায় প্রসূন চ্যাটার্জী বলে এক দুষ্কৃতকারী। সেখানে এক বন্ধুর কাছে আশ্রয় নেয় সে। ওখানেই খুন হয় ওরা পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে। ডলারগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় পুলিস এবং আই. বি-র কয়েকজন কর্মকর্তা। গোলমাল এড়াবার জন্য প্রসূনের মৃত্যু সংবাদ চেপে যায় ওরা বেমালুম—ডলারগুলোর ব্যাপারেও কোন উচ্চবাচ্য নেই।' হাসল জটিলেশ্বর। 'এই সুযোগটাই নিয়েছি আমি। আমাদের প্রাণেশ মজুমদারকে প্রসূন সাজিয়ে একটা দারুণ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে মাসুদ রানার সামনে। টপ্ করে গিলে ফেলেছে সে টোপটা। আরিফ খাস্তগীরের বাচ্চা মেয়ে সিমিকে এবং সেই সাথে লুকিয়ে রাখা পঁচাত্তর হাজার ডলার উদ্ধার করে আনতে যাবে ও লাহোরে। রানা যেন নির্দিষ্ট জায়গায় টাকাগুলো পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। অপারেশনের এটা একটা অংশ।' ড্রয়ার খুলে পুরু খয়েরী কাগজে মোড়া, সেলোটেপ দিয়ে সীল করা একটা মোড়ক বের করল সে। 'পঁচাত্তর হাজার ডলার।' চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকাল। 'আজই রওনা হচ্ছ তুমি। লাহোরে পৌছেই তুমি রানীর অ্যাপার্টমেন্টে যাবে। এটা তার কামরার এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যেন রানীর বা আর কারোর চোখে না পড়ে। রেখেই জায়গাটার কথা জানাবে আমাকে। রানাকে জানানো হবে কোথায় আছে ডলারগুলো। ও গিয়ে উদ্ধার করুক এগুলো। ঠিক সময়মত তুমি স্পেশাল পুলিসকে ফোন করে ওর আসল পরিচয় জানাবে, বলবে যে ওর কাছে তথ্য কেনার জন্যে প্রচুর ডলার আছে। বরকতউল্লার জায়গায় কাজ করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছে। পুলিস তখুনি ছুটবে ওকে গ্রেপ্তার করতে। এই পর্যায়ে ব্যাপারটা আর একটু নিখুঁত করার জন্যে ধরা পড়ার ঠিক এক মিনিট আগে ওর হোটেল রুমে

ফোন করে সাবধান করবে তুমি রানাকে। আমি চাই, পালাবার চেষ্টারত অবস্থায় ধরা পড়ুক ও। কিংবা গুলি খাক। টাকা এবং তোমার লুকানো এনভেলাপ পেতে এতটুকু অসুবিধে হবে না পুলিসের। এনভেলাপের ভিতরের কাগজপত্র দেখে এক মুহূর্ত দেরি না করে পুলিস ওকে তুলে দেবে তারিক আখতারের হাতে। ব্যস, আমাদের অপারেশন কম্প্লিট। প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্ধারণ করেছি আমি সতর্কভাবে হিসেব কষে। কখন কি করতে হবে সব লেখা আছে এই কাগজে।' পেপার ওয়েট চাপা দেয়া একটা ভাঁজ করা কাগজের দিকে ইঙ্গিত করল জটিল রায়। 'এটা নিয়ে তুমি চলে যাও লাহোরে। রানা লাহোরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে জানামাত্র আমি তোমাকে সঙ্কেত দেব। বুঝতে পেরেছ পুরো ব্যাপারটা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কোন প্রশ্ন আছে?'

'নো, স্যার।'

'বেশ। এবার তুমি যেতে পারো।'

ডলারের মোড়ক এবং কাজের লিস্টটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল চন্দ্রগুপ্ত। গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে দু'দিকের দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে ওর হাসি। এর আগে এতখানি গুরুত্ব দেয়নি ওকে কেউ।

জানালার পাশ থেকে সরে এল নীতিশ গুহ। একটা চেয়ার টেনে বসল বসের মুখোমুখি। ওর সেই অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

পেপার নাইফটা ডেস্কে নামিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকাল জটিলেশ্বর রায়। 'বরকতউল্লাহ মরলে নিশ্চিন্ত হতাম, নীতিশ। লোকটা আমাদের সব প্ল্যানপ্রোগ্রাম পণ্ড করে দিতে পারে।'

'জিজ্ঞেস না করলেও আমি বলব, স্যার, গোটা অপারেশনটাই নির্ভর করছে নিছক ভাগ্যের ওপর।' পরিষ্কার উচ্চারণে বলল নীতিশ গুহ। 'আমার মনে হয় মাসুদ রানাকে আমরা একটু বেশি রকমের আন্ডার-এস্টিমেট করছি। আরও একটু ভেবে নেয়া বোধহয় উচিত ছিল, স্যার। ওকে নিয়ে খেলা মানে আগুন নিয়ে খেলা। বিপদে পড়লে ও যে কি ভয়ানক দুর্ধর্ষ...' থেমে গেল নীতিশ জটিল রায়ের বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে। চট করে ঘুরিয়ে নিল কথাটা। 'আমরা এখনও জানি না সত্যি ও লাহোরে যাবে কিনা।'

'অন্তত এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল জটিলেশ্বর রায়। 'কোন সন্দেহ নেই, ও যাবে।'

শ্রাগ করল নীতিশ গুহ। বোঝা গেল সে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। 'ঠিক আছে। ধরা যাক, ও যাবে। ও তো আপনার এই ডলারের বান্ডিল নিয়ে পাকিস্তান থেকে বহাল তবিয়তে ফিরেও আসতে পারে। হি ইজ এ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট ইয়াং ম্যান। অলমোস্ট এ জিনিয়াস।'

'হোয়াট মেকস ইউ থিঙ্ক হি ইজ সো ব্রাইট?' ধৈর্য হারাল জটিলেশ্বর রায়। 'সাধারণ একজন এজেন্ট সে। প্রতিভাবানও নয়, অসাধারণও নয়। টাকাগুলো পানিতে ফেলছি বলতে পারো তুমি বড় জোর। কিন্তু কন্টিঞ্জেন্সি ফান্ড থেকে ইচ্ছেমত খরচ করবার অধিকার আমার আছে। প্রয়োজন হলে এর কৈফিয়ত দিতে

পারব আমি হেড অফিসকে। কাজেই অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। তোমার দোষ হচ্ছে, রানার ব্যাপারে বরাবর তুমি একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগো। আমি বলছি তোমাকে, হি ইজ নট অল দ্যাট ব্রাইট।'

রানার পিছনে লাগতে গিয়ে কি নিদারুণ পরাজয় হয়েছিল জটিলেশ্বর রায়ের, কেমন পর্যুদস্ত হয়েছিল তিন তিনবার, বিপর্যস্ত বোধ করেছিল হেড অফিস, সে কথা মনে পড়ল নীতিশ গুহের। কিন্তু সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এটা নয় বুঝতে পারল সে। বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কি হয়।'

নিজের পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট জটিলেশ্বর রায় একটা ফাইল সামনে টেনে নিল। এটা তার বিদায় জানাবার সুপরিচিত ইঙ্গিত।

ক্যামেরার পিছনটা খুলে ফিল্ম কার্ট্রিজ বের করল বরকতউল্লাহ।

'ভয়ে জড়সড় হয়ে আছ কেন? ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনের মধ্যেই আমি চলে যাব। এই দুটো দিন একটু সহ্য করতে পারবে না?'

ইতিমধ্যে সহ্য করে নিয়েছে রানী বরকতউল্লাকে। ও এখন লোকটাকে সাহায্য করতেও রাজি, যদি লোকটা ওকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি বিদায় হয়। বারোটা ছবি তুলেছে ও। ক্যামেরার রিফ্লেক্স লেনসের মধ্যে দিয়ে পাংশু, ভীত মুখটা দেখতে দেখতে লোকটার জন্যে দুঃখই বোধ করেছে ও। বলল, 'কি জানি কিভাবে কি সম্ভব হবে!'

রানীর দিকে চেয়ে হাসল বরকতউল্লাহ। 'আমি জানি কি ভাবে কি ব্যবস্থা হবে। আর মাত্র দুটো দিন—প্রতিজ্ঞা করছি—বিশ্বাস করো আমাকে।' ইরানী পাসপোর্ট এবং ফিল্ম কার্ট্রিজটা দিল সে ওকে। 'এগুলো তুমি নিয়ে যাবে আলী সাহেবের কাছে। তেত্রিশ নম্বর খাস্তা খাঁ রোডে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির পাঁচতলায় থাকে মোহাম্মদ আলী সাহেব। কথাবার্তা আগেই হয়েছে। জানে, কাজটা জরুরী।' ঠোঁট ভিজিয়ে নিল বরকতউল্লাহ জিভ বের করে। 'জায়গাটা চেনো? বাসে যেতে হবে।'

'চিনি।' ইতস্তত করে বলল রানী, 'বাথরূমে যাবেন দয়া করে? কাপড় বদলাতে হবে আমাকে।'

বাথরূমে ঢুকে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল বরকতউল্লাহ। কমোডের ঢাকনি নামিয়ে তার উপর বসল। ঘরের ভিতর থেকে রানীর নড়াচড়ার ভেসে আসা শব্দ শুনতে শুনতে কল্পনায় উলঙ্গ দেখতে পেল সে রানীকে। মনে পড়ল তার প্রথম দিনের কথাটা। শেরমান তাকে জানিয়েছিল দিলারা দুররানীর কাজে যোগ দেয়ার কথা। নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটির কাছেই এখন থেকে তার সব মেসেজ এবং ইনফরমেশন পৌঁছে দিতে হবে। শেরমান প্রায়ই সেই নাইট ক্লাবে যাওয়া আসা করে। সুতরাং তার পক্ষে রানীর কাছ থেকে মেসেজ ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ। এতে করে শেরমানের সাথে তার দেখা না হলেও চলে। দেখা না হওয়াটাই নিরাপদ।

মনে পড়ে রানীর অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম যেদিন ঢুকেছিল সেদিন তার সাথে ছিল একটা সাধারণ শপিং লিস্ট। কিন্তু আসলে ছিল ইনভিজিবল কালিতে লেখা গোপন ইনফরমেশন। রানীকে দেখামাত্র কী যেন ঘটে গেল ওর বুকের ভিতর। সুন্দরী, শান্ত,

মিষ্টি এবং যুবতী। কিন্তু রানীকে সে তার মনের কথা জানায়নি। নিজেকে সে সব সময় সামলে রেখেছে। রানী তার চেয়ে বয়সে অনেক, অনেক ছোট। নিজে সে শুধু প্রৌঢ়ই নয়, বিবাহিত।

কিন্তু গত দু'বছরে এক সাথে কাজ করতে করতে প্রতি মুহূর্তে রানীর দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়েছে বরকতউল্লাহ। রানীর ব্যবহার তাকে জখম করে। রানী তার সাথে দেখা করে, কথা বলে শুধু কাজের জন্যে। তার প্রতি অন্যরকম কোন অনুভূতি নেই, বোধ নেই, সহানুভূতি নেই।

রানীর অ্যাপার্টমেন্টে আশ্রয় নেবার পর থেকে, দু'জনের একত্রে বসবাসের ব্যাপারটা ওর মনের উপর বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। রানীকে কামনা করে সে। আকুলিবিকুলি করে বুকের ভিতরটা। কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারে রানীকে এতটুকু আভাস দিলেও মারাত্মক একটা কেলেঙ্কারি ঘটবে জানে সে। রানী তাকে এখনও মেনে নিতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন। ঘাড় ধরে বের করে দেবে এখান থেকে।

অতিকষ্টে রানীর প্রসঙ্গ থেকে মনকে সরিয়ে আলী সাহেবের কথা ভাবতে শুরু করল বরকতউল্লাহ। লাহোরের নির্যাতিত বাঙালীদের গোপন এক মীটিং-এ আলী সাহেবের সাথে তার হৃদ্যতা হয়েছিল। আলী সাহেবের ভাল লেগেছিল তাকে। যেচে পড়ে ঠিকানা দিয়েছিল নিজের। দেখা করতে গিয়েছে সে আলী সাহেবের সাথে বেশ কয়েকবার। কানাঘুষায় শুনেছিল, লোকটা পাসপোর্ট জাল করে, বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতার পর সরাসরি জিজ্ঞেসই করেছিল ও। মৃদু হেসে মাথা নেড়ে নিষেধ করেছিল বুড়ো, কিন্তু সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছিল, সে যদি কোনদিন জাল পাসপোর্টের দরকার বোধ করে তাহলে যেন অবশ্যই তার কাছে আসে।

দু'হপ্তা আগেও বরকতউল্লার জন্যে পরিস্থিতি বেশ ভাল ছিল। ভাষা শেখাবার স্কুলটা ছিল তার কাভার। নিরীহ গোবেচারা চেহারা, শান্ত শিষ্ট ব্যবহার তার। শ্রোতা হিসেবেও ধৈর্যশীল। তার ছাত্ররা—কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সিভিল সার্ভেন্ট, কেউ আর্মি অফিসার, কেউ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের হোমরাচোমরা—কেউ কেউ সরাসরি টাকার বিনিময়ে তথ্য দিয়েছে, অন্যান্যদের কাছ থেকে কথায় বার্তায় কৌশলে বের করে নিয়েছে সে প্রয়োজনীয় তথ্য। সেই তথ্য রানীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে সে শেরমানের কাছে। আর লক্ষ করেছে তেহরানের ব্যাঙ্কে তার টাকার পরিমাণ কেমন বাড়ছে দিন দিন। তিন বছরে জমে গেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার। এরপর, হঠাৎ তারিক আখতার এসে হাজির হলো লাহোরে। বরকতউল্লার জানা ছিল তারিক আখতার পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক। আরও জানা গেল, ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার সংকল্প নিয়ে এসেছে সে। বীরের গুণাবলী নিজের মধ্যে নেই, একথা বরাবর জেনে এবং মেনে এসেছে বরকতউল্লাহ। তারিক আখতার লাহোরে এসেছে শোনামাত্র লাহোর ত্যাগ করার জন্যে মনটা আনচান করে ওঠে ওর। আলী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে সে। বুড়ো রাজি হয় একটা জাল পাসপোর্ট তৈরি করে দিতে। কিন্তু বদলে কিছু চায়। অনিশ্চিত কয়েকটা দিন কাটে তার টাকা জোগাড় করতে। এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই সে আবিষ্কার করে: নজরবন্দী রাখা হয়েছে তাকে। বঝতে কষ্ট হয়

না, ওর উপর সন্দেহ পড়েছে তারিক আখতারের। আরও একটা ভীতিকর বাস্তবতা উপলব্ধি করে সে। তাকে যদি ওরা একবার ধরে তাহলে সে রানী এবং শেরমানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য হবে। কথা বের করার জন্যে তারিক আখতারের অনুগত ব্লাডহাউন্ড সিকান্দার বিল্লাহ তার শরীরের উপর কি কি নির্যাতন করবে ভাবতে গিয়ে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে। ধরা পড়ামাত্র গড়গড় করে সব কথা বলে ফেলবে সে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর একথা জটিলেশ্বর রায়ও জানে। এক কানাকড়িও বিশ্বাস করে না সে জটিলেশ্বরকে। লোকটাকে ঘৃণা হয় তার। একবার মাত্র দেখা হয়েছিল ওর লোকটার সাথে। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ হয়েছিল ওর। বুঝতে পেরেছিল, একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যুদূত পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না লোকটা। শয়তানের চেয়েও নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর জটিলেশ্বর রায়। কিন্তু তখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এদিক ওদিক তো হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগেই। কী করতে যাচ্ছে জটিলেশ্বর?

কমোডের ঢাকনির উপর বসে বরকতউল্লাহ তাকিয়ে আছে আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্রভাগের দিকে। মনে মনে শিউরে উঠল সে। জটিলেশ্বর তাকে খুন করার জন্যে কাউকে পাঠাবে। তা না হয়েই পারে না। ওর মুখ বন্ধ করা ওদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। তার মানে তারিক আখতার একা নয়, জটিলেশ্বরের শিকারীও রওনা হয়ে গিয়েছে ওকে শিকার করার জন্যে। এখানে খোঁজ করবে না তো ওরা!

বাথরূমের দরজায় টোকা পড়তেই চমকে উঠল বরকতউল্লাহ। ছিঁড়ে গেল চিন্তার সূত্র। দরজা খুলে চলে এল ঘরে।

'আমি যাচ্ছি,' রানী বলল।

নির্বাক চেয়ে আছে বরকতউল্লাহ। নীল শাড়ি পরেছে রানী। অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। কামনার উত্তপ্ত ঢেউ বয়ে গেল বরকতউল্লার সারা দেহের উপর দিয়ে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল সে। ঢোক গিলে বোকার মত হাসল। রানী কি বুঝল কে জানে, চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। বরকতউল্লাহ পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। এতে আলী সাহেবের জন্যে টাকা আছে। আমার শেষ সম্বল। হারিয়ে ফেলো না। ফিল্ম আর পাসপোর্টটা নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।' এনভেলাপটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ঘুরে দাঁড়াল রানী। 'যদি খিদে পায়, ফ্রিজে খাবার আছে।'

'ধন্যবাদ।' পিছন থেকে রানীর দিকে চেয়ে ঢোক গিলল, তারপর ঠোঁট ভিজাল বরকতউল্লাহ। 'সাবধান! কেউ ফলো করছে কিনা খেয়াল রেখো।'

ঘাড় ফিরিয়ে শাণিত দৃষ্টিতে তাকাল রানী। বরকতউল্লার চোখে লোভ দেখে ঘৃণায় রী-রী করে উঠল ওর সর্বশরীর। একসাথে থাকার ফলে লোভী হয়ে উঠছে লোকটা। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলছে ক্রমশ ওকে। নানা কথা ভেবে লোকটা হয়তো নিজেকে বশে রাখবে। তবু যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততই ভাল। গাধাটার প্রতি ওর কোনই অনুভূতি নেই, রাগ এবং ঘৃণা ছাড়া। লোকটার উপস্থিতিটাই ওর কাছে চরম অস্বস্তিকর।

'লক্ষ রাখব।' ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানী। ও জানে পিছন থেকে ওকে গিলে খাচ্ছে লোকটা।

বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল রানী। সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে থেমে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। না, কেউ ওকে অনুসরণ করে আসেনি এখানে। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি টপকে আরও দুটো তালা উঠল ও। আলী সাহেবের দরজার পাশে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল দু'বার।

দেরি দেখে বিরক্ত হয়ে আবার বোতামে চাপ দিতে যাচ্ছিল রানী, এমন সময় দরজা খুলে গেল। হাত এবং কপালের শিরাগুলো চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকটার। বুড়ো, প্যাকাটির মত রোগা, লম্বা। তবে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েনি এখনও। মাথায় চুল নেই বললেই চলে, যা আছে সব সাদা। ক্লিন শেভ্‌ড়। চোখে পিচুটি।

'ভেতরে আসুন।' কণ্ঠস্বরে বিনয়ের আতিশয্য বুড়োর। দাঁত সব পড়েনি এখনও। কী সৌভাগ্য আজ আমার! কী সৌভাগ্য! এমন পরীর মত মেহমান এই হীন দরিদ্রের কাছে···আসুন, আসুন ' আলী সাহেব পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে গেল। রানী ভিতরে ঢুকল।

ছোট ড্রইংরুমে ঢুকে আলী সাহেব তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল হাতলহীন একটা চেয়ার। 'আসুন, বসুন।'

ভাঙা দুটো আর্মচেয়ার, একটা কাঠের চেয়ার একটা টেবিল এবং একটা মান্ধাতা আমলের আলমারি এলোমেলোভাবে অযত্নে রাখা। পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে সিঙ্গল খাট দেখা যাচ্ছে একটা।

'আমার গিন্নী আমাকে ফেলে পালিয়েছে,' সর্বক্ষণ হেসে কথা বলে আলী সাহেব। 'এখানে, এই চেয়ারে বসুন। ধুলো ঝেড়ে দিয়েছি, ময়লা হবে না শাড়ি।'

নড়বড়ে চেয়ারে সাবধানে বসল রানী। ব্যাগ থেকে টাকার এনভেলাপ, ফিল্ম কার্ট্রিজ, এবং পাসপোর্টটা বের করেই চমকে উঠল ও। আলী সাহেবের ডান হাতের প্রায় অর্ধেকটায় ব্যান্ডেজ।

'হাত ভেঙে ফেলেছেন নাকি?'

'কেটে ফেলেছি, ভাঙিনি।' আলী সাহেব হাসছে। 'সব কাজ নিজেকেই করতে হয় কিনা। খুব একটা মারাত্মক অবস্থা নয়, অবশ্য। তবে ডায়াবেটিস আছে বলে কিছুতেই ঘা শুকাতে চায় না। আমার মত বয়স হলে বুঝতে পারবেন কাটা-ছেঁড়া কিরকম নোংরা ব্যাপার। যাকগে, আমার সৌভাগ্যের কারণ কি বলুন দেখি?'

'মি. বরকতউল্লার কাছ থেকে এসেছি আমি।' উত্তরোত্তর বাড়ন্ত আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করে বলল রানী। তিনটে জিনিসই সে রাখল হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর। 'আপনি নাকি কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করে দেবেন?'

পাসপোর্টটা দেখল আলী সাহেব। 'দুর্ভাগ্য আর বলে কাকে! দরকারের সময়েই ঘটে বসে আছে দুর্ঘটনা। তাও আবার হাতেরই ওপর। হাতের ক্ষতটা শুকিয়ে গেলে অবশ্যই তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করব আমি।' এনভেলাপের দিকে নজর পড়ল তার। 'ওটায় বুঝি টাকা?' সেটা খুলে টাকাগুলো গুনল। বেশ সন্তুষ্ট দেখাল চেহারা। 'মি. বরকতউল্লাকে বড় ভাল লাগে আমার। সাহায্য করব, কথা

দিয়েছিলাম তাকে। খুব একটা বেশি সময় লাগবে না অবশ্যি।'

'তবু?'

'দু' হপ্তা তো বটেই।'

রানী তাকিয়ে রইল আলী সাহেবের দিকে। ওর হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে নিজেরই অজান্তে। 'কিন্তু অত দেরি হলে তো চলবে না। ওরা ইতিমধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে।'

কামানো গালে হাত বুলাচ্ছে আলী সাহেব। হাসি নেই মুখে। 'খুব খারাপ খবর। কিন্তু আমি নাচার...দু'হপ্তার আগে আমি এ কাজে হাত দিতে পারব না। সম্ভব হলে করতাম, বিশ্বাস করুন।'

দু'হপ্তা! দ্রুত ভাবছে রানী। তার মানে চোদ্দ পনেরো দিন। এতদিন আমার ঘরে আমি ওকে থাকতে দিতে পারি না।

'সত্যিই কি আপনি তার আগে পারেন না? টাকা কিছু বেশি দিলে...'

'না। নিখুঁত ভাবে করতে হবে কাজটা।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল বুড়ো রানীকে। করুণ হাসল। 'খুঁত থাকলে ধরা এবং মারা পড়বে বরকতউল্লাহ। সেই সাথে আমিও। দু'হপ্তা পর হলে কাজটা যত্ন নিয়ে করতে পারব। তার আগে আমি ঝুঁকি নিতে পারব না।'

হতাশ হয়ে বসে রইল রানী এক মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'তাই বলব তা হলে।'

'বলবেন আমি সত্যি দুঃখিত।' আলী সাহেব পিছু পিছু আসছে। 'এক কাপ চা না খেয়ে চলে যাবেন?'

'তেষ্টা নেই,' রানী বলল। 'ধন্যবাদ।' বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রানী না থাকায় অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বরকতউল্লাহ। বেশ বড়সড় ঘর। একপাশে একটা সরু ডিভান। ওটাই বিছানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোট্ট একটা কিচেন এবং টয়লেট সহ বাথরুমও আছে। দেয়ালে চারটে কাঠের তাক। ঘরের এক প্রান্তে একটা ফ্রেঞ্চ উইনডো। ওটা পেরিয়ে ব্যালকনিতে যাওয়া যায়। ব্যালকনির দু'পাশে দুটো প্রকাণ্ড টব। নিয়মিত পানি পেয়ে গাছ, লতাপাতা এবং ফুলে গোটা ব্যালকনিটা ঢাকা পড়ে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মসজিদের মসৃণ, খাড়া মিনার দেখা যায়। জরুরী প্রয়োজনে, কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে, রানীর বান্ধবী বা কেউ, অনায়াসে ব্যালকনিতে গা ঢাকা দিতে পারবে সে। বাইরের রাস্তা থেকে বা ঘর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। স্বস্তি বোধ করল সে বেশ একটু।

ডিভানের নিচে সুটকেসটা রেখে আর্ম চেয়ারে বসল সে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুক সমান উঁচু একটা ডানাওয়ালা কাঠের পরী। শৌখিন কোন লোক অ্যান্টিক শপ থেকে কিনে থাকবে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের মালিকই হয়তো কিনেছিল শখ করে। পরীটার দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে খানিকটা রেহাই পাচ্ছে যেন সে। অপূর্ব কারুকাজ। কাঠ খোদাই করে শিল্পী বড় সুন্দর একটা জিনিস বানিয়েছে। কার্ভিংগুলো কী নিখুঁত। যৌবন যেন উপচে পড়ছে দেহ ছাপিয়ে। এইরকম কিছু কিছু শৌখিন জিনিস সে কিনবে ঠিক করল তেহরানে একবার পৌছুতে পারলে। টাকার অভাব হবে না। টাকাগুলো তুলে যেখানে খুশি চলে যাও, খোলা

দুনিয়ায় বাধা নেই কোথাও। চাই-কি বাংলাদেশেও ফিরতে পারে সে। নানান কল্পনায় চোখ বুজে এল ওর, ঝিমুনি এল।

হঠাৎ কান খাড়া হয়ে গেল বরকতউল্লার। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। কানে আওয়াজ যেতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। এক লাফে ব্যালকনিতে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ভয় পেয়েছে। হাঁপাচ্ছে। খাড়া হয়ে আছে কান।

হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা কোল্ট পয়েন্ট থ্রী-টু অটোমেটিক। পায়ের শব্দটা এই ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। তালা খোলার শব্দটা বোমা ফাটার শব্দ হয়ে ঢুকল ওর কানে। লতাপাতার আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল। ঘরে ঢুকল রানী। ঘরে কাউকে না দেখে থমকে দাঁড়াল দু'পা এগিয়েই। ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাইছে সে চারপাশে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বরকতউল্লাহ।

'ওহ্!' দ্রুত দম বন্ধ করে আবার নিঃশ্বাস ছাড়ল রানী। 'আমি···আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।'

তিক্ত হাসল বরকতউল্লাহ। তাকে দেখে নিদারুণ নিরাশ হয়েছে রানী।

'যাব কোথায়? আসলে, সাবধানের মার নেই। পায়ের শব্দ শুনে ভাবলাম··· যাক, আমার পাসপোর্ট কখন দিচ্ছে আলী সাহেব?'

'হাত কেটে ফেলেছে লোকটা। দু'হপ্তা পর কাজে হাত দেবে।'

রক্ত উঠে এল বরকতউল্লার সারা মুখে। পরমুহূর্তে সাদা কাগজের মত হয়ে গেল। 'দু'হপ্তা! কী সাংঘাতিক!'

'সে তার হাত ব্যবহার করতে পারবে না এর আগে।' রানী থামল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল মরিয়া হয়ে। 'আপনি অতদিন কোনমতেই থাকতে পারবেন না! চলে যেতে হবে আপনাকে। আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না!'

বসে পড়ল বরকতউল্লাহ। দু'হপ্তা! শিকারী কুকুরের মত খুঁজছে ওকে তারিক আখতার এবং দিল মোহাম্মদ। সম্ভবত জটিলেশ্বর রায়ের মৃত্যুদূতও খুঁজছে। প-নে-রো দি-ন! অসহায় বোধ করল সে। পনেরো দিন টিকে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব। রানীর আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়? মাথা খারাপ। নির্ঘাত মরতে হবে তাহলে। আরও আগেই। এই ছোট অ্যাপার্টমেন্টটাই আপাতত তার জন্যে একমাত্র নিরাপদ স্থান।

রানী বলে চলেছে, 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি। বেরিয়ে যান!' রীতিমত খেপে উঠেছে সে। চেঁচাচ্ছে। 'হাবার মত অমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন? আপদ জুটেছে এসে! সুটকেস কোথায়? এক্ষুণি দূর হয়ে যান ওটা নিয়ে।'

রানীর মনের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল বরকতউল্লাহ। সত্যিই সে এখন ওর কাছে একটা আপদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যেমন ওকে ভালবাসে তেমনি ও যদি তাকে ভালবাসত তাহলে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হত এখানে। তিক্ততায় ভরে উঠল মন তার। যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে থাকে দয়ামায়া, সহানুভূতি এবং ত্যাগের প্রেরণা। সে সব এর কাছে আশা করা বৃথা।

'আমি এখান থেকে বেরুলেই,' শান্ত ভাবে বলল সে, 'ওরা ধরে ফেলবে আমাকে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। তোমাকে আগেই বলেছি, আমি সাহসী লোক

নই। কোনদিনই সাহসী ছিলাম না। যদি বলো, আমি চলে যাব, কিন্তু জেনে রেখো, ধরা পড়লে আমাকে কথা বলতে বাধ্য করবে ওরা। আমার ধরা পড়া মানেই তুমিও ধরা পড়ছ। তোমার এবং আমার দু'জনেরই স্বার্থে এখানে থাকতে চেয়েছিলাম আমি। যাবার আর কোন জায়গা আমার নেই।'

রানী চেয়ে আছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না ওর, কথাটা সত্যি। বলল, 'তাহলে আমিই চলে যাব। আমার কোন বান্ধবীর কাছে গিয়ে উঠব।'

'সেটা কি ভাল হবে?' কাঁপা হাতে বরকতউল্লাহ একটা সিগারেট ধরাল। 'তোমার বান্ধবী জিজ্ঞেস করবে এই জায়গা কেন ছাড়লে। আমি এখানে আছি একথাই কি বলা হচ্ছে না তাকে, প্রকারান্তরে?'

ধপ্ করে বসে পড়ল রানী।

'মোটামুটি একটা নিয়ম করে নিতে পারি আমরা,' শান্তকণ্ঠে বলে চলল বরকতউল্লাহ। 'তুমি মাঝ রাতের আগে ফেরো না ক্লাব থেকে। তুমি যতক্ষণ ক্লাবে থাকবে আমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারি। তোমাকে কোন রকম বিরক্ত না করলেই তো হলো?'

কোন কথা সরল না রানীর মুখে। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল নিজের মুঠি করা হাতের দিকে।

যতই দুর্বলতা থাকুক, ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বরকতউল্লাহ। ও কি সামান্য এতটুকু দয়া-মায়াও দেখাতে পারে না? ও কি মানুষ বলেও মনে করে না তাকে?

'সহজ যুক্তি ঢুকছে না কেন তোমার মাথায়?' জ্বালা প্রকাশ পেল বরকতউল্লার কণ্ঠে। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমাকে ধরা মানেই তোমাকেও ধরা? কেন বুঝতে পারছ না ধরা পড়লেই খুন হয়ে যাচ্ছি দু'জনেই?'

চোখ তুলে তাকাল রানী। সাদা হয়ে গেছে মুখ। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। 'কেন আমার এমন সর্বনাশটা করলেন! আমি তো বেশ ভালই ছিলাম। আপনি স্বার্থপরের মত, কাপুরুষের মত এর মধ্যে কেন জড়ালেন আমাকে?'

'নাহ্! বোঝানো যাবে না একে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বরকতউল্লাহ এপাশ ওপাশ। তারপর আবার শুরু করল, 'বোকার মত কথা বলছ তুমি, রানী। এখানে না এলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেতাম আমি। তার ফলে ধরা পড়তে তুমিও। আমাকে স্বার্থপর বলছ, কিন্তু তুমিই বা কম কিসে? দোষটা আমার? আমি তোমাকে নামিয়েছিলাম এই বিপজ্জনক খেলায়? না তুমি নিজের ইচ্ছেয় যোগ দিয়েছ জটিলেশ্বরের সাথে? নিজের কথা ছাড়া আর কিছু কি ভাবছ তুমি? আমি দু'জনের কথাই ভাবছি। আমার নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করছে তোমারও নিরাপত্তা। বুঝেছ এবার?' রানী কথা বলছে না দেখে বলল। 'থাক এখন। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এসো, লাঞ্চের কথা ভাবা যাক। খাবার কিছু আছে? খিদে পেয়েছে।'

পাঁচ

গত দু'দিন ধরে লাহোরে আছে চন্দ্রগুপ্ত। পার্ক লাগজারি হোটেলে উঠেছে সে। চালচলনে পুরোদস্তুর ট্যুরিস্ট। দিনে খাঁটি পর্যটকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শাহী

মসজিদ, আকবরের কেল্লা আর শালিমার বাগিচায়, রাতে চেখে বেড়াচ্ছে নাইট ক্লাবগুলোর মজা। রানী যেখানে গান গায়, মার্ভেল নাইট ক্লাবেও গেছে সে, রানীর গান শুনেছে, এবং লক্ষ করেছে কখন ও আসে, কখন ওর গান শেষ হয়। মেয়েটি কেমন গায় (চন্দ্রগুপ্ত সুর-কালা) তা না বুঝতে পারলেও ওর শরীরটা এক কথায় কাম্য ও লোভনীয় বলে মনে হয়েছে তার।

রানীর অ্যাপার্টমেন্টের আশপাশেও ঘুরে ফিরে দেখে এসেছে সে। নিচ তলার দরজা পেরিয়ে ভিতরেও ঢুকেছিল একবার। লক্ষ করেছে, এলিভেটর নেই। দারোয়ান নেই।

লাহোরে আসার দ্বিতীয় দিনে জটিলেশ্বরের কোডেড কেব্‌ল্‌ পেয়েছে চন্দ্রগুপ্ত। রানা ভিসা পেয়েছে এবং কাল সকালে রওনা দিচ্ছে।

নাইট ক্লাবে যে সময়টায় রানীর গান শুরু করবার কথা ঠিক সেই সময় টাকার মোড়কটা ব্রীফকেসে ভরে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রগুপ্ত। রানীর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল সে পায়ে হেঁটে। রাতের এই সময়টা রোজকার মত আজও প্রায় নির্জন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় জুতোর শব্দ গোপন করবার চেষ্টা করল না সে। সাধারণ একজন লোকের মত কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে উপরে উঠতে থাকল এবং সেই শব্দে কান খাড়া হয়ে উঠল বরকতউল্লার।

গত দু'দিন ভীষণ আতঙ্কে কেটেছে বরকতউল্লার। অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে সামান্য কোন শব্দ হলেই মুরগীর বাচ্চার মত ছুটে চলে গেছে সে ব্যালকনিতে। লতাপাতার আড়ালে। ওর ভয় দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানী—সঙ্গত কারণেই এড়িয়ে চলছে এখন। প্রাণভয়ে আধমরা লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে ও সারাটা দিনই কাটায় বাইরে বাইরে। হোটেল-রেস্তোরাঁয়, পার্কে, সিনেমায়, মিউজিয়ামে কাটিয়ে দেয় একা। রাত আটটার দিকে ফিরে আসে ও, ক্লাবে গান গাইতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে। বিষবৎ পরিত্যাগ করছে ও বরকতউল্লার সঙ্গ।

সময় কাটতে চায় না বরকতউল্লার। অস্বস্তিকর চিন্তা ভাবনাই তার একমাত্র সঙ্গী।

লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তাতে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে রানী কাঠের তাক আর বিছানাটা আড়াল করে নিয়েছে। মাঝরাতে ফিরে একটি কথাও না বলে পর্দার আড়ালে চলে যায় সে। সঙ্গীহীন বরকতউল্লাহ আর্ম চেয়ারে বসে সময় কাটায়। ক্লাবে যাবার আগে ও যখন পোশাক পাল্টায় বরকতউল্লাহ তখন পর্দার আড়ালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর নড়াচড়ার শব্দ শোনে। বড় করুণা হয় ওর নিজের উপর। তারা দু'জনেই তো নিঃস্ব, একা। দু'জনেই বিপদগ্রস্ত। রানীর কি একবারও মনে হয় না লোকটাকে একটু সান্ত্বনা দিই? এতটুকু মমতা বোধ জাগে না মনের মধ্যে? পরিষ্কার বোঝা যায় ও দূর হয়ে গেলেই খুশি হবে মেয়েটা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

আজও রানী ক্লাবে চলে গেছে। সেন্টের মিষ্টি সুগন্ধ এখনও ঘরের বাতাস ভারী করে রেখেছে। চার ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে ছটফট করবে সে এখন। শোবার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কে যেন উপর তলায় উঠে আসছে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতর। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সে এমন কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা যা দেখে কেউ বুঝে ফেলতে পারে ও আছে এখানে। চট্ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে পা টিপে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ। আস্তে ফ্রেঞ্চ উইনডোর কাঁচ লাগানো কপাট ভিড়িয়ে দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে লতাপাতার আড়ালে চলে গেল। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও এতটুকু ভরসা পায় না সে। অতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও কোনদিন মানুষের উপর গুলি ছুঁড়তে পারবে কিনা সন্দেহ আছে তার।

দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্ত। গোটা দালানের কোথাও কোন শব্দ নেই। কলিং বেলের বোতামে ছোট একটা চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কেউ দরজা খুলবে না, জানে সে। কেউ নেই ভিতরে। তবু সাবধানের মার নেই। কেউ যদি দরজা খোলে তাহলে তাকে বানানো গল্প বলার জন্যে তৈরি সে। উপরের অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দার নাম নিচের লেটার বক্সে দেখে এসেছে ওঠার আগে। ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে উপরে উঠে যাবে সে।

ধৈর্যের সাথে আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার বোতামে চাপ দিল চন্দ্রগুপ্ত। আরও খানিক অপেক্ষা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে এক টুকরো সেলুলয়েড বের করে খুলে ফেলল তালা। অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেওয়াল হাতড়ে টিপে দিল বাতির সুইচ।

ঝোপের ফাঁক থেকে উঁকি দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে দেখতে পেল বরকতউল্লাহ। মুহূর্তে জমে গেল সে বরফের মত। চিনতে পেরেছে। ভয়ে কাঁপছিল সে এতক্ষণ, কিন্তু সত্যিকার ভয় পেয়ে বন্ধ হয়ে গেল কাঁপুনি। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে শুধু। হাত পা অবশ হয়ে গেছে। নড়বার ক্ষমতা নেই।

জটিলেশ্বরের মৃত্যুদূত এই চন্দ্রগুপ্ত! নীতিশ গুহর সহকারী। কত মানুষ যে এর হাতে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু কি করে জানল ওরা যে ও এখানে আছে? কে খবর দিল? রানী?

বুকের ভিতর তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। বুড়ো আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল বরকতউল্লাহ সেফটি ক্যাচটা অফ আছে কিনা। আছে, কিন্তু থাকলে কি হবে, ও জানে ট্রিগারে চাপ দেয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে—কিছুতেই নরহত্যা করতে পারবে না সে। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে চন্দ্রগুপ্তের খুঁজে বের করার অপেক্ষায়। বেশিক্ষণ লাগবে না, ঠিকই খুঁজে বের করবে লোকটা তাকে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। কিছুই ঘটছে না। দরদর করে ঘামছে সে। আবার উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে চন্দ্রগুপ্ত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোজা কাঠের পরীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে পরীটার দিকে।

সবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে বরকতউল্লাহ। চন্দ্রগুপ্তের চওড়া কাঁধ আড়াল করে রেখেছে পরীটাকে। চন্দ্রগুপ্ত একটু ঘুরতেই দেখা গেল পরীর মাথাটা তার হাতে ধরা। মাথাটা মেঝেতে রেখে মূর্তির ফাঁপা গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর ব্রীফকেস খুলে ছোট একটা খয়েরী কাগজের মোড়ক বের করল। মোড়কটা পরীর গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে মাথাটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল দ্রুত হাতে। ঘরের

চারদিক আর একবার দেখে নিয়ে ব্রীফকেস হাতে দরজার দিকে এগোল, আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল করিডরে। বাইরে থেকে চাবি লাগানোর শব্দ হলো।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বরকতউল্লাহ। ভাগ্যকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে এখনও। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আস্তে করে ফ্রেঞ্চ উইনডোর কপাট খুলে ফেলল। চন্দ্রগুপ্তের জুতোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। সাবধানে অন্ধকার ঘরে ঢুকে সুইচ বোর্ডের দিকে এগোল সে।

সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রইল বরকতউল্লাহ। চন্দ্রগুপ্তের জুতোর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। নিচের সদর দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ হলো কয়েক সেকেন্ড পর।

আলো জ্বেলে চেয়ারে বসল বরকতউল্লাহ। আর একটু হলেই গিয়েছিলাম, ভাবল সে। ঘুমন্ত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত এসে হাজির হলে কি হত ভেবে দেহ-মন আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর এখনও। চোখের দৃষ্টি পরীটার উপর। বেঁচে আছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

রানী যখন ফিরে এল, তখনও বরকতউল্লাহ চেয়ারে বসে। ওর মুখের দিকে চেয়েই আঁৎকে উঠল রানী। ফ্যাকাসে মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর চোখের কোলে কালি দেখে মুহূর্তে বুঝে নিয়েছে সে কিছু একটা ঘটেছে। চট্ করে দরজা বন্ধ করেই বল্টু লাগিয়ে দিল।

'কি হয়েছে!'

আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করল বরকতউল্লাহ। কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলে কথা বলতে গিয়ে দু'বার ব্যর্থ হলো সে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় শুধু বলতে পারল, 'চন্দ্রগুপ্ত এসেছিল!'

রানী চেয়ে রইল। বরকতউল্লার ভয় ওর মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে।

'তালা খুলে ভিতরে ঢুকেছিল! আমি···আমি লুকিয়েছিলাম ব্যালকনিতে।'

'কে সে? কি সব আবোল তাবোল বকছেন!'

'চন্দ্রগুপ্ত! জটিলেশ্বর রায়ের লোক!' বরকতউল্লাহ বলল। 'ভেবেছিলাম আমাকে খুন করতে এসেছে।'

শিউরে উঠল রানী রক্তাক্ত লাশের কথা ভেবে।

'কেন সে আপনাকে···আপনাকে খুন করতে আসবে?'

'জটিলেশ্বর জানে আমাকে মেরে ফেলাই ওর জন্যে সব দিক থেকে ভাল। আমি ধরা পড়লে শেরমান এবং তুমি, দু'জনেই বাতিল হয়ে যাবে।' বরকতউল্লাহ অস্বাভাবিক জোরে কথা বলছে। 'কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আমাকে খুন করতে আসেনি।' আঙুল বাড়িয়ে কাঠের পরীটাকে দেখাল। 'একটা প্যাকেট রেখে গেছে ওটার ভেতর। ওরা কি ওখানেই জিনিসপত্র রেখে যায় বরাবর?'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না আমি।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানী পরীটার দিকে। 'ওটার ভেতর লোকটা কিছু রেখে গেছে বলছেন?'

'হ্যাঁ। পরীর মাথাটা নামিয়ে ভিতরে একটা প্যাকেট ভরে দিয়ে চলে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি জানো, তোমার জন্যেই রেখে গেছে কিছু একটা। তুমি অন্তত জটিলেশ্বর রায়ের কাজ এখনও করছ। বরকতউল্লাহ লক্ষ করল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে

গেছে রানী। 'তুমি জানো না এ ব্যাপারে কিছু? তাই যদি হয়, তাহলে এসো, দেখা যাক কি রেখে গেছে চন্দ্রগুপ্ত।'

'না! যেখানে আছে সেখানেই থাকুক ওটা। দরকার নেই।' ভয় পেয়েছে রানী।

'ছেলেমানুষের মত কথা বোলো না। তুমি একজন প্রফেশনাল এজেন্ট। মাথাটা খাটাও। আজ বা কাল, ওরা আমার বদলে আর একজনকে পাঠাবে এই লাহোরে। সেই আর একজন যেই হোক, আমার মত সে-ও তোমার সাথে যোগাযোগ করবে, এবং তুমি তার সাথে কাজও করবে, যেমন এতদিন আমার সাথে করেছ।'

'ওদের সাথে আর কোন কাজ আমি করছি না!' বরকতউল্লার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করল রানী। 'যথেষ্ট হয়েছে! এবার আপনি দূর হলেই আমি বাঁচি। যা আমি করতে চাই না তা আমাকে দিয়ে কেউ জোর করে করাতে পারবে না।'

কৃপার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বরকতউল্লাহ রানীর দিকে। ছেলে মানুষ! ভড়কে গেছে। ওর ভীতিটা বুঝতে পারছে সে। তারিক আখতারের লাহোরে আসবার খবর শুনে সে নিজেও আতঙ্কিত হয়েছিল।

'দয়া করে মন দিয়ে আমার কথা শোনো। অমন নার্ভাস হবার কিছু নেই।' শান্ত ভঙ্গিতে বলল বরকতউল্লাহ। 'একবার যখন ওদের হয়ে কাজ করেছ, ফেঁসে গেছ তুমি। ওরা তোমাকে ত্যাগ না করলে তোমার সাধ্য নেই এ কাজে ইস্তফা দেয়ার। দিলে মরতে হবে। স্রেফ খুন করে ফেলবে জটিলেশ্বর। ওদের ত্যাগ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। যেমন আমি যাচ্ছি। এই দেশ থেকে পালাবার বা লুকোবার উপায় না করতে পারলে তোমার কোনও চান্স নেই, নির্ঘাত খুন হতে হবে তোমাকে ওদের হাতে।'

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানী।

'আমি বিশ্বাস করি না! ওরা অমন কাজ করতে পারে না।'

'লাহোর ছেড়ে পালাচ্ছি কেন তাহলে আমি? কেন ওদের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করছি না? আমি জানতাম এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে একদিন না একদিন। জরুরী অবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম আমি মনে মনে।' বরকতউল্লাহ থামল। ইতস্তত করল খানিকক্ষণ। তারপর আবার বলতে শুরু করল। 'কথাটা বলার এটা সময় নয়। তবু বলতে হচ্ছে।' সারা মুখে ঘাম চকচক করছে। চোখের দৃষ্টিতে ব্যাগ্রতা ফুটে উঠল ওর। 'রানী আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই তোমার প্রেমে পড়েছি আমি। আমার কাছে তোমার মূল্য···' বরকতউল্লাহ দেখল আকস্মিক আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানী। 'বলা উচিত হয়নি কথাটা তোমাকে···আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত?' অপমানে কাঁপছে রানী। 'ভালবাসা! ছিহ্! লজ্জা করে না কথাটা উচ্চারণ করতে? তাহলে এখানে এলেন কেন? জবাব দিন। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কেন তাহলে ব্যবহার করছেন আমাকে? আমাকে ভালবাসেন···বলুন, আপনি নিজেকে ভালবাসেন।'

অনড় হয়ে বসে রইল বরকতউল্লাহ। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে ওর। সামলে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কোথাও যাবার জায়গা নেই

আমার, রানী। কোন প্রতিদানের আশা করি না আমি তোমার কাছে। ভেবেছিলাম সামান্য এতটুকু দয়া অন্তত তুমি আমাকে করবে।'

'কতবার এক কথা বলব!' চেঁচিয়ে উঠল রানী। 'আপনাকে আমি চাই না এখানে। আপনার ভালমন্দে কিছুই এসে যায় না আমার—কিচ্ছু না!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সরে গেল রানী। বরকতউল্লাহ চেয়ে রইল ওর দিকে। ভাবল, কি সুন্দর দেখতে ও। বলল, 'দু'জনেই আমরা পালাতে পারি। চলো না, তুমিও চলো আমার সাথে তেহরানে। আলী সাহেবকে বললেই তোমার জন্যেও একটা পাসপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে। পথে তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে পারি। তেহরানে পৌঁছে মাথা ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারো আমার সাথে থাকবে কিনা। পঞ্চাশ হাজার ডলার জমানো আছে ওখানে আমার।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানী। জ্বলছে ওর চোখ দুটো। 'এখান থেকে পালাবার প্রয়োজন পড়েনি আমার। জটিলেশ্বরকে জানিয়ে দেবেন, ওদের কাজও করব না আমি আজ থেকে। শুধু আপনি বিদায় হোন। আর কিচ্ছু চাই না আমি। আপনি আমাকে মুক্তি দিলেই আমি নিরাপদে থাকব।'

'কোন এজেন্টই নিরাপদে থাকতে পারে না, রানী। চলো পালাই একসাথে। তেহরানে আমার সাথে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। চাইকি বাংলাদেশে চলে যাব আমরা...'

'থামুন!' থরথর করে কাঁপছে রানী। 'বেরিয়ে যান এখান থেকে!' বরকতউল্লাহ চমকে উঠল রানীর অগ্নিমূর্তি দেখে। বুঝতে পারল, এসব কথাকে অশ্লীল প্রস্তাব হিসেবে নিচ্ছে সে।

প্রসঙ্গ বদলে নিচু গলায় বলল সে, 'চন্দ্রগুপ্ত কি রেখে গেছে দেখা দরকার আমাদের।'

'না! দরকার নেই!'

'তোমার ক্ষতি করার জন্যে কোন ষড়যন্ত্রও হতে পারে ব্যাপারটা। জটিলেশ্বরকে আমি বিশ্বাস করি না। সে হয়তো তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়। কি রেখে গেছে দেখা দরকার।' বরকতউল্লাহ পা বাড়াল কাঠের পরীটার দিকে।

নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করছে রানী। দেখল, পরীটার মাথা আলগোছে খসিয়ে নিচে নামাচ্ছে বরকতউল্লাহ।

•

তেহরান এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জের কোলাপসিবল গেটের সামনে দেখা পেল রানা প্রসূনের।

'হাই!' এগিয়ে এল প্রসূন। 'এই যে আপনার টিকেট। আপনার সুটকেসটা জমা দিন, তারপর কথা বলা যাবে।'

ওজন নেয়া, টিকেট দেখানো, ইত্যাদির পর সুটকেস জমা দিয়ে একটু দূরে সরে খালি একটা সোফায় বসল ওরা। কাউবয় শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করল প্রসূন। 'এই হলো ঠিকানা। সিমিকে পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু টাকাগুলো পাবেন কাঠ দিয়ে তৈরি একটা পরীর শরীরে।'

জটিলেশ্বর রায়ের কাছ থেকে তথ্যগুলো পেয়েছে সে। জটিলেশ্বর পেয়েছে লাহোর থেকে চন্দ্রগুপ্তের কোডেড টেলিগ্রামের মাধ্যমে।

'জলের মত সহজ কাজ। পরীর মাথাটা আলগাভাবে বসানো আছে। খুলে নামানো যায়। সময় পাচ্ছেন তিনদিন। রিটার্ন টিকেট বুক করা হয়েছে শনিবার। ওইদিন আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, ঠিক এই জায়গায়।'

'সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। ঠিকানাটা পড়ল ও। অচেনা জায়গা। 'কাঠের পরী?'

'হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ডানদিকের কোণে। ঢুকলেই চোখে পড়বে।'

'কেউ থাকে এই অ্যাপার্টমেন্টে?' পকেটে কাগজের টুকরোটা রেখে জানতে চাইল রানা।

'তা জানি না। তখন তো কেউ ছিল না, এখন কেউ থাকতে পারে।' তির্যক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল প্রসূন। 'অতগুলো টাকা একেবারে বিনা খাটনিতে পাবার আশা করতে পারেন না, পারেন কি? লোক থাকলে একটু বুদ্ধি খাটাতে হতে পারে, হয়তো বা জোরও।'

'জায়গাটা সম্পর্কে আর কি বলতে পারো তুমি আমাকে?'

'কোন পাহারাওয়ালা নেই। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে পাঁচতলায়। দরজার তালাটা কোন সমস্যাই নয়।' জটিলেশ্বরের কথাগুলোই মুখস্থ বলে গেল প্রসূন। 'তালা খুলে ঢোকার সময় আপনাকে শুধু জেনে নিতে হবে ভেতরে কেউ আছে কিনা।'

শ্রাগ করল রানা। খুব বেশি সহজ মনে হচ্ছে কাজটা। সেজন্যেই কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে মনটা। যুক্তি দেখাল নিজেকে ও—ক্ষতি কি, কিছু না পেলে বেড়ানো তো হবে!

'ঠিকানা পেলাম, টাকা কই?' হাত বাড়াল রানা।

পকেট থেকে একশো টাকার দশখানা পাকিস্তানী নোট বের করে রানার হাতে দিল প্রসূন। 'এই যে। এক হাজার। লোভে পড়ে গচ্চা দিচ্ছি। ধরেই নিয়েছি, এ আর ফিরে পাব না।'

হিপ পকেটে টাকা ভরল রানা। তখুনি লাউড স্পীকারে ফ্লাইট সেভেন ফরটিনের প্যাসেঞ্জারদেরকে চার নম্বর গেটের দিকে রওনা হতে অনুরোধ করা হলো।

'চলি,' রানা হাসল। 'ফিরতে দেরি দেখলে হার্টফেল কোরো না আবার। আমি টাকা পেলে তোমার ভাগ তুমি পাবে—এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। যতটা সহজ ভাবছ ততটা সহজ নাও হতে পারে কাজটা। দেরি হতে পারে।'

গেট অবধি রানাকে পৌঁছে দিল প্রসূন। 'শনিবারের অপেক্ষায় রইলাম। গুডলাক। কাজটা আসলে খুবই সহজ। আপনি দেখবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল রানা অন্যান্য যাত্রীদের পিছু পিছু। পাঁচ মিনিট পর তর তর করে উঠে গেল বোয়িং-এর অভ্যন্তরে।

সীট বেল্ট বেঁধে নিয়ে চিন্তাসাগরে ডুব দিল রানা। চন্দ্রগুপ্তের রহস্যময় অনুপ্রবেশ সারাক্ষণ অস্বস্তির মাঝে রেখেছে ওকে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে

পারছে না সে ব্যাপারটা। গত দুটো দিন অত্যন্ত সতর্ক থেকেছে সে, হোটেল কামরায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে গোপন মাইক্রোফোন বা টেপ রেকর্ডার। পায়নি কিছু। তবে? কেন এসেছিল চন্দ্রগুপ্ত? কি করতে পাঠিয়েছিল ওকে জটিলেশ্বর? কোন রকম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে না পেরে এখনও ভুগছে ও অস্বস্তিতে।

প্রসূন ছোকরাও অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে ওকে। ওর কাহিনীর সত্যতা যাচাই করার পরও কেন যেন সবটা বিশ্বাস্য বলে মেনে নিতে পারছে না ও কিছুতেই। কেমন একটা অলীক ভাব রয়েছে ওর ব্যবহারে। পাকিস্তানী ছবির চরিত্রাভিনেতা বলে মনে হয়েছে ছোকরাকে ওর।

ঝেড়ে দৌড় দিল প্লেনটা রানওয়ে ধরে। এখুনি গা ভাসাবে বাতাসে।

সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। লাহোর পৌছেই যাচাই হয়ে যাবে সব। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এদিকে বোয়িংটা আকাশে ডানা মেলবার সাথে সাথেই টেলিফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল প্রসূন জটিলেশ্বরের নাম্বারে।

জটিলেশ্বর রায় বলল, 'প্রাণেশ? কি খবর?' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

'রওনা হয়ে গেছে, স্যার। প্লেন এখন আকাশে।'

'গুড ওয়ার্ক! চলে এসো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল জটিলেশ্বর রায়। খুশিতে হাসি এসে গেল ওর। এতদিনে বাগে পাওয়া গেছে রানাকে।

নিভু নিভু চুরুটটা দাঁতে চেপে আপন মনে হাসল সে মিনিট তিনেক।

কাজের কথা মনে পড়তেই একটু গম্ভীর হলো জটিলেশ্বর রায়। রানা লাহোরে পৌছুচ্ছে একথা জানিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে টেলিগ্রাম করতে হবে। একটা স্লিপ প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল। বক্তব্যের শেষে যোগ করল: 'রানা তোমাকে চেনে। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে। ভুলেও আন্ডার-এস্টিমেট করবে না ওকে। সাবধান।'

সেক্রেটারি আসমা শেরীকে ডেকে কাগজটা তার হাতে দিয়ে টেলিগ্রামের নির্দেশ দিল জটিলেশ্বর রায়। আসমা বেরিয়ে যেতেই চেয়ারে হেলান দিয়ে নতুন চুরুট ধরাল।

পেপারনাইফটা তুলে নিয়ে চকচকে ব্লেডের দিকে তাকাল। নিজের মুখের বিকৃত প্রতিফলন দেখল সে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে ভেংচাল নিজেকে।

নিজের উপর খুব বেশি সন্তুষ্ট বোধ করলে এরকম উদ্ভট পাগলামি করে সে একা একা।

ছয়

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সুসজ্জিত অফিস কামরায় টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে তিনজন লোক।

দুর্গের মত দুর্ভেদ্য এই বিশাল দালানের প্রথম তিনটে তলা স্পেশাল পুলিসের হেড কোয়ার্টার।

দিল মোহাম্মদ খান, স্পেশাল পুলিসের সেকেন্ড-ইন-চার্জ, টেবিলে বিছানো প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ দেখছে। বরকতউল্লার আক্রমণের ফলে চাঁদির উপর খানিকটা জায়গা তার ফুলে আছে এখনও। ব্যথাও রয়েছে।

দিল মোহাম্মদের উল্টো দিকে বিশাল স্ফিংক্স-এর মত বসে আছে তারিক আখতার। সবুজ চোখের চঞ্চল দৃষ্টি একবার দিল মোহাম্মদের উপর, একবার ম্যাপের উপর, পরমুহূর্তে কঠোর চেহারার এক তৃতীয় ব্যক্তির উপর থমকে দাঁড়াচ্ছে। তৃতীয় লোকটা সিকান্দার বিল্লাহ। লম্বা, মেদহীন পেটা শরীর। সরু মুখ। মুখের ভাঁজে ভাঁজে নিষ্ঠুরতার ছাপ। মাথায় চুল খুব কম। লোকটা তারিক আখতারের ডান হাত। মানুষ শিকারে সারা পাকিস্তানে এর জুড়ি নেই।

'পালাতে পারবে না,' ম্যাপ থেকে চোখ তুলে বলল দিল মোহাম্মদ। 'নিশ্চয়ই এরই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ব্যাটা।' ম্যাপের মাঝামাঝি এক জায়গায় টোকা দিল সে। 'ওকে ধরা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।'

'তোমার কাছে সময় জিনিসটার খুব একটা দাম না থাকতে পারে,' ভরাট গলায় বলল তারিক আখতার, 'কিন্তু আমি এ জিনিসের গুরুত্ব দিতেই অভ্যস্ত। এই লোকের ব্যাপারে আগেই সাবধান করেছিলাম আমি তোমাকে—তোমারই অবহেলায় গত চার দিন সে নিরুদ্দেশ। এখনও বলছ তুমি এটা শুধু সময়ের ব্যাপার? আর কত সময়, দিল মোহাম্মদ? আমাকে আশ্বাস দিয়ে কোন লাভ নেই—কি কি ব্যবস্থা নিয়েছ শোনা যাক।'

কপালের ঘাম রুমাল বের করে মুছে ফেলল দিল মোহাম্মদ। চোখ নিচু করে বলল, 'দেশের বাইরে যেতে পারবে না, স্যার। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কেউ না কেউ লুকিয়ে রেখেছে ওকে। কিন্তু ক'দিন? চারদিকে সতর্ক চোখ রেখেছি আমরা। প্রত্যেকটা হোটেল, এয়ারপোর্ট আর ফ্রন্টিয়ার পোস্টগুলোকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আমরা…'

অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল তাকে তারিক আখতার। 'বুঝেছি। ঢিমে তেতলায় চলছে কাজ। ও যেচে ধরা না দিলে কিছুই করবার নেই তোমাদের। এবার আমাকেই লোক লাগাতে হবে দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, তোমাদের হাতে যদি ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে আমাকে। ওর সাথে সবার আগে কথা বলতে চাই আমি…বুঝতে পারছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'বরকতউল্লাকে চাই, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো বরকতউল্লার বদলে কে আসছে? ওরা নির্ঘাত আর একজনকে পাঠাবে। আমি জানতে চাই কে সে। সন্দেহজনক কাউকে পেলেই আটকাতে হবে—রোড, ট্রেন, এয়ার যে পথেই আসুক না কেন। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো এখন। যা বললাম তার ব্যবস্থা করো। আর যেমন ভাবে পারো, আল্লার ওয়াস্তে, ধরে আনো বরকতউল্লাকে।'

উঠে দাঁড়াল দিল মোহাম্মদ। নিজেরই বেদখল হয়ে যাওয়া অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল।

সিকান্দার বিল্লার দিকে তাকাল তারিক আখতার। বেপরোয়া ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাচ্ছে সে।

'তারপর? তোমার খবর কি, সিকান্দার? রিপোর্টে পেলে কিছু?'

'শেরমান নামের লোকটা,' সিকান্দার বলল সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে, 'বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তুলোর খরিদ্দার সে। মাসে দু'বার আসে লাহোরে। লোকটা চারদিন আগে দেখা করেছে জটিলেশ্বরের সাথে। সাপ্তাহিক রিপোর্টে খবরটা জানিয়েছে তেহরানের আশরাফ। তার ধারণা, ব্যাপারটা তেমন কিছু নাও হতে পারে। জটিলেশ্বর এরকম বহু লোকের সাথেই দেখা সাক্ষাৎ করে থাকে।'

'আশরাফ একটা গর্দভ,' তারিক আখতার বলল। 'শেরমান সম্পর্কে আর কি জানো?'

'বিশেষ কিছু না। ইরানী ব্যবসায়ী একজন। এখানে এসে প্রায়ই "মার্ভেল নাইট ক্লাবে" যায়। তার বিরুদ্ধে কোন রেকর্ড নেই, শুধু জটিল রায়ের সাথে চারদিন আগে দেখা করা ছাড়া।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল তারিক আখতার ছাতের দিকে। 'মার্ভেল নাইট ক্লাব চেনো তুমি?'

'গেছি কয়েকবার।' সিকান্দার বিল্লাহ সিগারেটের ছাই ফেলল কার্পেটে। 'খাবারটা বেশ ভাল। ছোট ছোট বুদ আছে, একা হওয়া যায়। নাচ তেমন জুতসই হয় না, তবে একটা মেয়ে আছে স্যার, পয়সার মাল। গান গায়। মেয়েটার বাবা বাঙালী ছিল, মা পাঞ্জাবী। বাপটা বাংলাদেশ আন্দোলনে জড়িত ছিল। খতম করা হয়েছে তাকে। মেয়েটার ডাক নাম রানী, ভাল নাম দিলারা দুররানী।'

আঙুলের নখ দেখছিল তারিক আখতার, চোখ তুলে তাকাল। 'শেরমানের সাথে কোন সম্পর্ক আছে ওর?'

'শেরমান ওর ভক্ত বলে মনে হয়। প্রায়ই ওকে সে ফুল-টুল দিয়েছে বলে জানা যায়। ওর সাথে ওর অ্যাপার্টমেন্টে শেরমান অবশ্য কোন দিন যায়নি।'

'ফুল...'

তারিক আখতার কি যেন ভাবল। 'হ্যাঁ...মেয়েটার ওপর নজর রাখা যায়, বিল্লাহ। লোক লাগিয়ে দাও। এটা হয়তো সময়ের অপব্যয়, কিন্তু, এখন সময় খরচা করা ছাড়া আমাদের করার কিছু নেইও।' আবার ছাতের দিকে চোখ তুলল সে। দৃষ্টিটা অচঞ্চল। 'এর সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই আমি। বুঝেছ?'

সিকান্দার বিল্লাহ উঠে দাঁড়াল। 'ইয়েস, স্যার।' বলেই বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল তারিক আখতার। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখ পড়ল পাশের দালানের কার্নিসে বসা দুটো কবুতরের উপর। পুরুষটা বেশ জাঁকজমক করে নাচছে মেয়েটার মন গলাবার জন্যে। পাত্তা দিচ্ছে না মেয়ে কবুতরটা। তারিক আখতার কিছুক্ষণ দেখল ওদেরকে। চটে গেল সে পুরুষ কবুতরটার উপর। মেয়েদের মোহে মোহিত হয়ে কি রকম বোকা হয়ে যায় পুরুষরা, কথাটা ভেবে ঘুরে দাঁড়াল সে।

শেরমান সম্পর্কে ভাবল কয়েক মিনিট। তারপর চিন্তাটা মোড় নিল বরকতউল্লাহ এবং তার বদলে সম্ভাব্য অন্য লোকের ব্যাপারটায়। দিল মোহাম্মদই হয়তো ঠিক বলেছে। ব্যাপারটা শুধুমাত্র সময় সাপেক্ষ। ধরা তাকে পড়তেই হবে।

পরীর শরীর থেকে খয়েরী কাগজে মোড়া প্যাকেটটা বের করে আনল বরকতউল্লাহ। জ্বলজ্বলে চোখে চাইল রানীর দিকে।

'দেখলে তো? ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। জটিলেশ্বরকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না আমি।'

আতঙ্ক লুকোবার চেষ্টা করল না রানী।

'কিন্তু··· কেন? কি করেছি আমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল বরকতউল্লাহ।

'সেটা বলব কি করে? দেখা যাক কি পাঠিয়েছে।' পকেট থেকে পেননাইফ বের করল সে।

'সেটা কি উচিত হবে···?'

'একশোবার! এর ভিতরে কি আছে জানতে না পারলে ওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করব কিভাবে?' চেয়ারে বসে প্যাকেটের সেলোটেপের নিচে ছুরির ব্লেড ঢুকিয়ে কাটতে শুরু করল বরকতউল্লাহ। পাশেই দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে রানী।

কাগজ খুলে একশো ডলারের বান্ডিল বের করে আনল বরকতউল্লাহ। দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে পুরু বান্ডিলটার দিকে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কাঁপা হাতে গুনতে শুরু করল বরকতউল্লাহ।

উত্তেজনাপূর্ণ নীরবতা। শুধু খশর খশর শব্দ হচ্ছে নোট গোনার। চাপা উল্লাসে ফেটে পড়ল বরকতউল্লাহ! 'কী সাংঘাতিক। পঁচাত্তর হাজার ডলার! মানে, সাড়ে সাত লাখ টাকা!'

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রানীর হাত-পা। ধপ্ করে বসে পড়ল বরকতউল্লার পাশে।

'এর মানেটা কি?'

খানিকক্ষণ নোটের তোড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘনঘন মাথা নাড়ল বরকতউল্লাহ। 'এর একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এটা কোন ষড়যন্ত্র নয় রানী। আমার বদলে যে লোক আসছে এ টাকা তার ফান্ড।' মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। 'আমাকে ওরা এত টাকা দেয়নি কখনও। তোমাকে আগেই বলেছি, আমার বদলে যে লোক আসবে সে তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। সহযোগিতা না করে উপায় নেই তোমার, জানে ওরা। সেজন্যেই এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে চন্দ্রগুপ্ত এই টাকা। এ টাকা ইনফরমেশন কেনার টাকা। ওরা ইতিমধ্যেই আমাকে খরচের খাতায় লিখে নিয়েছে। আমার বদলে অন্য লোক এখানে আসছে বা এসে গেছে। টাকাগুলো সে যাতে পায় সেজন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা তোমার ঘরটা ব্যবহার করছে মাত্র। তোমার বিপদের কথা এতটুকু চিন্তা করে দেখার দরকার মনে করেনি।'

কাঁপা শ্বাস টানল রানী। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে সে নোটগুলোর দিকে।

'এত টাকা!'

'এমন জঘন্য কাজ করার অধিকার ওদের নেই,' বলে চলল বরকতউল্লাহ। 'তোমার সাথে আলোচনা করতে পারত ওরা। সেক্ষেত্রে তুমি তোমার মতামত জানাতে পারতে—হয় রাজি হতে, নয়তো প্রত্যাখ্যান করতে। কিন্তু তোমার মতামতের ধার না ধেরে, তোমার নিরাপত্তার কথা না ভেবেই যা খুশি করছে ওরা।' সামনে ঝুঁকে টাকার বান্ডিলের উপর টোকা দিল সে। 'তারিক আখতারের লোক যদি এই ঘর সার্চ করে, অনায়াসে বের করে ফেলবে এই ডলারের বান্ডিল। তোমার অবস্থাটা কি হবে তাহলে ভেবে দেখেছ?'

'এখন কি করতে চান আপনি?'

'হাতে যখন এত টাকা,' বরকতউল্লাহ শান্তভাবে পরামর্শ দিল, 'পাকিস্তান থেকে পালাতে কোনই অসুবিধে হবে না তোমার। অনায়াসে মুক্তি পেতে পারো। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারো তুমি পৃথিবীর যে কোন জায়গায়। ইচ্ছে করলে আমার সাথে তেহরানে যেতে পারো। অনেক টাকা! একটা পাসপোর্ট কিনতে…'

টাকার দিক থেকে চোখ ফেরাল রানী। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে।

'না! রেখে দিন। ও টাকা আমার না, আমি ছোঁব না।'

রানীকে খুঁটিয়ে দেখল বরকতউল্লাহ। ওর চেহারার মধ্যে দৃঢ়তার ছাপ দেখে করুণ হাসি হাসল। 'ঠিক আছে, বোকামি করতে চাও, করো। তুমি না চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না।'

'কারও সাহায্যের দরকার নেই আমার।' সরে গেল রানী দু'পা। 'যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিন ওগুলো।' টাকার দিকে আবার একবার তাকাল ও। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আমি শুতে যাচ্ছি।' ঘুরে সরাসরি বরকতউল্লার দিকে তাকাল ও। 'জানি, আমি বোকা। কিন্তু চোর নই।'

'জীবন মরণের প্রশ্ন যেখানে,' বরকতউল্লাহ শান্ত গলায় বলল, 'সেখানে বোকা হওয়ার চেয়ে চোর হওয়াই ভাল বলে মনে করি আমি।'

খানিক ইতস্তত করে পর্দার আড়ালে চলে গেল রানী। বিছানায় উঠল ও, শব্দ শুনে বুঝতে পারল বরকতউল্লাহ। টাকার বান্ডিলের দিকে তাকাল সে। এই পঁচাত্তর হাজারের সাথে তেহরান ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার যোগ হলে রীতিমত ধনী বলা যায় তাকে। এই টাকার জোরেই সে সারাটা জীবন নিরাপদ থাকবে। ইতস্তত করার কোন কারণ দেখল না সে। উঠে দাঁড়াল। কিচেন থেকে নিয়ে এল পুরানো দুটো জং পত্রিকা। একশো ডলার নোটের আকারে ভাঁজ করল কাগজগুলো। সেগুলো খয়েরী কাগজে মুড়ে আবার সেলোটেপ দিয়ে বাঁধতে শুরু করল।

'কি করছেন, শুনি?' পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল রানী অধৈর্য কণ্ঠে। 'কি ভেবেছেন আপনি নিজেকে?'

'আর যাই ভাবি বোকা ভাবিনি।' নকল প্যাকেটটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো বরকতউল্লাহ। বেশ মজবুত হয়েছে জিনিসটা। উঠে গিয়ে দাঁড়াল সে কাঠের পরীটার সামনে। গলা দিয়ে প্যাকেটটা ঢুকিয়ে পরীর মাথাটা বসিয়ে দিয়ে ফিরল রানীর দিকে। 'বোকামি করতে আমি রাজি নই। টাকার মূল্য আমি বুঝি।'

'তার মানে টাকাগুলো নিচ্ছেন আপনি? অসম্ভব! ও টাকা আপনার নয়।'

টাকার বান্ডিলগুলো হাতে তুলে নিল বরকতউল্লাহ। 'শুয়ে পড়ো। ক্লান্ত হয়ে

পড়েছ। তুমি ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'কি করবেন আপনি ওগুলো নিয়ে?'

'কি করব না করব তা তোমার না জানাই ভাল। দয়া করে ঘুমুতে যাও এবার।'

'এত টাকা নিয়ে বর্ডার পেরোনো অসম্ভব। ফেঁসে যাব আমরা। আমি নই, লোভে পড়ে আপনিই বোকা বনে গেছেন।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বরকতউল্লাহ রানীর দিকে। হতাশায় ম্লান তার চোখের দৃষ্টি। 'জটিল একটা পরিস্থিতি থেকে তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমি, রানী। তুমি যে কী ভয়ঙ্কর বিপদে আছ তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। জটিলেশ্বরের নতুন এজেন্ট এখানে এসে এই টাকা কোন মতেই যেন না পায়। আমার বদলে যে লোকই আসুক, তারিক আখতারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না সে। একথা আমি হলপ করে বলে দিতে পারি। তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে জটিলেশ্বর যাকেই পাঠাক, তার পিছু পিছু তারিক আখতারও আসছে এখানে। তখন তোমার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো?' লম্বা শ্বাস টেনে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করল বরকতউল্লাহ। 'এসবের সাথে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। তুমি যখন এতই সৎ, পরের টাকা ছোঁবে না, ঠিক আছে, তোমার ভাল মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

বরকতউল্লার চোখে মুখে ব্যাকুল আন্তরিকতা লক্ষ করল রানী। ইতস্তত করল সে কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লুকোবেন আপনি নোটগুলো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বরকতউল্লাহ। 'পরীর পায়ের তলায়। যাতে তাড়াতাড়ি বের করা যায় দরকারের সময়। পায়ের নিচে আটকে দেব সেলোটেপ দিয়ে।'

'ঠিক আছে।' মুখোমুখি এসে দাঁড়াল রানী। 'আমি দুঃখিত মি. বরকতউল্লাহ। আর কোন অহেতুক ঝগড়া হবে না আমাদের মধ্যে। আমার প্রতি আপনার অনুভূতি কি রকম তা আমি বুঝি। আমি জানি আপনি আমার ক্ষতি চাইবেন না কখনোই। আপনি যদি মনে করেন সম্ভব, তাহলে আমিও আপনার সাথে চলে যাব পাকিস্তান থেকে।'

ম্লান হাসল বরকতউল্লাহ। রানী মত বদলেছে তাকে ভালবেসে নয়, বুঝতে পারছে সে। ঘাবড়ে গেছে প্যাঁচঘোঁচ দেখে।

'কাল সকালেই আবার দেখা করো তুমি আলী সাহেবের সাথে। তাকে বলবে, ইরানী পাসপোর্ট দরকার তোমার। টাকা পেলে খুশি হয়ে কাজটা করবে সে।' রাবার ব্যান্ডে বাঁধা বান্ডিলটা শূন্যে ছুঁড়ে খপ্ করে ধরল বরকতউল্লাহ। 'এটা রাখার জন্যে বড় এনভেলাপ আছে তোমার কাছে?'

'প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে কিচেনে একটা। ওতে হবে?'

'হবে।'

বরকতউল্লার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা হলো রানীর। 'কিছু মনে রাখবেন না, মি. বরকতউল্লাহ। কাউকে ভালবাসতে না পারলে আমার করার কিছু নেই, আছে কি? আপনার সাথে যে আচরণ করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আসলে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম আমি। এই বিপদ থেকে পালাতে না

পারলে পাগল হয়ে যাব আমি বুঝতে পারছি।'

রানীর দিকে চেয়ে বরকতউল্লাহ হাসল। 'যা হবার হয়েছে। মনের ওপর তো আর কারও জোর নেই। দিশে আমারও ছিল না। আমরা পারব, রানী। দেখো। তেহরানে পৌঁছে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতেও পারে। খুব খারাপ লোক নই আমি, রানী···আমার পুরো পরিচয় জানতে পারলে বলা যায় না, ভাল লেগেও যেতে পারে তোমার।'

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল রানী।

রানী ও বরকতউল্লাহ যখন কথা বলছে, ঠিক সেই সময় রাস্তার অপর দিকের একটা সাততলা দালানের পঞ্চম তলার এমুখো ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লার দু'জন লোক। ওদের ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নজর রাখতে হবে দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্টের উপর। এক বুড়ী একা থাকত ওই ফ্ল্যাটে। তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে গ্রামে তার নাতনীর কাছে।

বরকতউল্লাহ বা রানী টেরও পেল না ওদের কতটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মহাবিপদ। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রয়েছে ওরা এখন।

*

দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল নীতিশ গুহ। জটিলেশ্বর রায় ফাইলে নিমগ্ন। মুখ না তুলে চোখ উঠিয়ে দেখল সে। চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে আবার ডুবে গেল ফাইলে।

খাড়া হয়ে বসে প্রবল বেগে পা নাচাতে শুরু করল নীতিশ গুহ। এক মিনিট পর জটিলেশ্বর রায় ফাইলে সই করে আউট ট্রেতে ফেলল সেটা ঝপাং করে। সুইভেল চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে নীতিশ গুহের দিকে চোখ রেখে হাসল।

'গ্ল্যাড টু সী ইউ ব্যাক, নীতিশ। হ্যাড আ গুড ট্রিপ?'

নীতিশ গুহ নেপালে গিয়েছিল। অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ হয়েছে তার। গত দু'দিন ছিল না সে তেহরানে।

'খুব ভাল নয়, স্যার। আগামীকাল বিস্তারিত রিপোর্ট দেব। আজ বড় টায়ার্ড লাগছে।'

'এদিকের অবস্থা বেশ ভাল,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল জটিলেশ্বর রায়। 'চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে খবর পেয়েছি রানা পৌঁছেচে লাহোরে। সুনীল নাগ অপেক্ষা করছে রওনা হবার জন্যে। ওপেন রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করেছি আমি, যাতে কোন রকম দেরি না হয়। সম্ভবত দু'এক দিনের মধ্যেই লাহোরের উদ্দেশে ফ্লাই করতে পারবে সুনীল। রানা কাজ করে দ্রুত। মেয়েটাকে পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কাল্পনিক সিমির হদিস না পেয়ে টাকা উদ্ধার করেই চেষ্টা করবে ও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে। সারাক্ষণ ওর ওপর নজর রেখেছে চন্দ্রগুপ্ত।'

'ওর সাথে আর কেউ নেই?' জানতে চাইল নীতিশ গুহ। 'একা চন্দ্রগুপ্ত সামলাতে পারবে এত দিক?'

'তা পারবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম সাহায্য দরকার কি না, বলেছে—না। বড় কর্তব্যপরায়ণ ছেলেটা।'

সন্দিহান দেখাল নীতিশ গুহকে। 'কিন্তু আমার মনে হয়, ওর সাথে আর কাউকে দিতে পারলে ভাল হত, স্যার। রানা শুধু বুদ্ধিমান নয়, ভয়ঙ্করও। ওর মত ধুরন্ধর এজেন্ট যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় চন্দ্রগুপ্ত নজর রাখছে ওর ওপর, তাহলে আপনার কর্তব্যপরায়ণ ছেলের কপালে খারাবি আছে।'

রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জটিলেশ্বর, সামলে নিল। নড়েচড়ে বসল সুইভেল চেয়ারে। তারপর কণ্ঠস্বরে একটা দার্শনিক ভাব এনে বলল, 'তোমার দোষ হচ্ছে: তুমি পেসিমিস্ট। চন্দ্রগুপ্ত অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্ব বোঝে। যা করবার অতি সাবধানেই সে করবে।'

ভুরু কুঁচকে নীতিশ গুহ বলল, 'বলুন, চেষ্টা করবে। মানি, ছেলেটা সৎ, দায়িত্বশীল, কাজের গুরুত্ব বোঝে। কিন্তু বুদ্ধির প্রশ্নে কি তেমন কোন সার্টিফিকেট দেয়া যায়, স্যার, ওকে? মাথা মোটা বলে কতদিন বকা খেয়েছে আপনার কাছে, স্মরণ করুন? রানার বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত—এটা একটা কথা হলো, স্যার? যাই হোক, আপনি যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন, তবে ওর সাথে আর কেউ থাকলে আমি ভরসা পেতাম।'

'এ ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারো, নীতিশ।' হাসল জটিলেশ্বর। রানার বিরুদ্ধে স্বল্পবুদ্ধি চন্দ্রগুপ্তকে লাগিয়ে দিয়ে খুশি সে। এতে প্রমাণ হবে রানা ওর চেয়েও অযোগ্য। নিজের পরিকল্পনায় যথেষ্ট আস্থা আছে জটিল রায়ের। রানাকে বাগে পাওয়া গেছে যখন, নীতিশ গুহর সমালোচনা বা নীতিবাক্য শুনতে কিছুতেই রাজি নয় সে। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'যাক। শোনো, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—দারুণ গরম একটা মেমো এসেছে দিন চারেক হলো। মাঝে তুমি আবার নেপাল চলে গেলে বলে আর বলা হয়নি। এটা তোমার দেখা দরকার। টপ সিক্রেট!' উঠে দাঁড়িয়ে সেফের দিকে পা বাড়াল সে। কথা বলেই চলেছে। 'নয়াদিল্লীর মেমো। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা, চীন, এবং নেপালে ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতার পরিকল্পনা রয়েছে এতে। নির্ভেজাল বিস্ফোরক। দারুণ ব্যাপার! রাষ্ট্রপতির সীলমোহর দিয়ে নিজ হাতে সই করা মেমো। ওই সব দেশে আমাদের সিক্রেট সার্ভিসের কার্যকলাপ সম্পর্কেও কিছু বলা হয়েছে শেষের প্যারাগ্রাফে। জানা দরকার তোমার।'

ডায়াল ঘুরিয়ে গোটা কয়েক বোতামে চাপ দিতেই খটাং করে খুলে গেল সেফ।

ড্রয়ার টেনে লম্বা সাদা একটা এনভেলাপ নিয়ে চেয়ারে ফিরে এল জটিলেশ্বর। লাল ফিতে জড়ানো এনভেলাপটা নীতিশ গুহের হাতে দিল সে। 'পড়ে দেখো, গুহ। মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে তোমার।' ইন-ট্রে থেকে একটা ফাইল টেনে নিল সামনে। মুহূর্তে ডুবে গেল কাজে।

এনভেলাপটা খুলল নীতিশ গুহ। ভিতর থেকে দামী কাগজের দুটো শীট বেরুল।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর নীতিশ গুহের বিস্মিত কণ্ঠস্বর: 'কি এটা? ভুল করে অন্য এনভেলাপ দিয়েছেন, স্যার।'

ফাইল থেকে বহুকষ্টে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভুরু কুঁচকে তাকাল জটিল রায় নীতিশ গুহের দিকে।

'কি বললে?'

কাগজের শীট দুটো বাড়িয়ে দিল নীতিশ গুহ।

'নয়াদিল্লীর মেমো কোথায়? এটা তো গতমাসের বাতিল করা কোডের কী।'

'কী যা-তা বলছ!' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল জটিলেশ্বর। পরমুহূর্তে ছোঁ মেরে কাগজ দুটো ছিনিয়ে নিল নীতিশের হাত থেকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে কাগজের দিকে।

নীতিশ গুহ দেখল চোখের পলকে জটিলেশ্বরের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল। কাগজের শীট দুটো ডেস্কের উপর খসে পড়ল তার হাত থেকে। প্রমাদ গুনল নীতিশ গুহ। একলাফে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে। হায় ভগবান! হার্টফেল করছে নাকি!

'কি হলো, স্যার?' দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সে। 'শরীর খারাপ করছে? ডাক্তার ডাকব?'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বারণ করল জটিলেশ্বর। প্রাণপণ চেষ্টায় সামলে নিল কিছুটা। জ্বলজ্বলে চোখে চাইল নীতিশের দিকে। কিছু বলতে যাচ্ছিল নীতিশ, ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

'শাট আপ! ভাবতে দাও আমাকে।'

বিপদসঙ্কেত চিনতে ভুল করল না নীতিশ গুহ। এরকম মেজাজ আগে কখনও দেখেনি সে চীফের। চুপ করে বসে রইল সে অন্যদিকে চেয়ে।

কাগজের শীট দুটো আবার তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল জটিলেশ্বর রায়। এনভেলাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সেটাও দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এনভেলাপ এবং কাগজের শীট দুটো রেখে চেয়ার ছাড়ল সে। সেফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নীতিশ গুহ দেখল লোকটা পাগলের মত সেফের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে।

ঘুরে দাঁড়াল জটিলেশ্বর। ঝুলে পড়েছে মুখটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের মত।

'গুহ...অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছি!' ধীর পায়ে চেয়ারে ফিরে এল জটিলেশ্বর রায়। 'রানার সুটকেসে যে কাগজগুলো ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে দিয়েছিলাম... সেগুলো টপ সিক্রেট এনভেলাপে ভরে রেখেছিলাম আমি, যাতে পাকিস্তানীরা গুরুত্ব দেয় ব্যাপারটার। নয়াদিল্লীর মেমোর এনভেলাপটাও আমার ডেস্কেই ছিল। কিভাবে যেন...ইশ্‌শ্‌ কি করে হলো!...চন্দ্রগুপ্তকে আমি সেটাই দিয়ে দিয়েছি।' বিরতি দিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে। হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, 'রানার সাথে সেই টপ্ সিক্রেট মেমো লাহোরে চলে গেছে। এত জায়গা থাকতে—লাহোরে! মাইগড! পাকিস্তানীদের হাতে ওটা পড়লে সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে ওরা। আমি শেষ!'

পাথরের মূর্তির মত চীফের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে নীতিশ। হতভম্ব। কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনেছে কিনা বুঝে উঠতে পারল না কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু জটিলেশ্বরের অবস্থা দেখে আর কোন সন্দেহ রইল না তার। দ্রুত চিন্তা শুরু হয়ে গেল ওর সুশিক্ষিত মস্তিষ্কে। যে-কোন জটিল পরিস্থিতিতেও কমপিউটারের মত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার মাথা পরিষ্কার এবং দ্রুত কাজ করে বলেই এত উঁচু পদে উঠে এসেছে সে মাত্র দশ বছরের মধ্যেই।

'চন্দ্রগুপ্তকে টেলিগ্রাম করছি আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। 'এনভেলাপটা উদ্ধার

করবে ও। হাতে সময় আছে এখনও। রানাকে ফাঁসাবার পরিকল্পনা বাতিল করে দেব আমরা। চন্দ্রগুপ্ত যদি পাকিস্তানী পুলিসকে টেলিফোন না করে তাহলে ধরা পড়ছে না রানা, ওরা ওকে বাধাও দেবে না পাকিস্তান থেকে বেরোবার সময়। তার মানে দু'বার সুযোগ পাচ্ছি আমরা। চন্দ্রগুপ্ত যদি এনভেলাপটা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয় তাহলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই, টাকা নিয়ে ফিরে আসুক ও এখানে, তারপর দেখা যাবে। কি বলেন, স্যার?'

'তারিক আখতার আছে ওখানে,' শান্ত গলা জটিলেশ্বরের। 'ধরে ফেলবে রানাকে। চন্দ্রগুপ্তর কিছু জানাবার প্রয়োজন পড়বে না।'

'তাহলে তো সর্বনাশ! ধরা পড়বার আগেই উদ্ধার করতে হবে ওটা। চন্দ্রগুপ্তকেই।'

'এতবড় একটা কাজ ওই গর্দভ পারবে বলে মনে করো তুমি? মাই গড! তুমি ঠিকই বলেছিলে, গুহ। আমার উচিত ছিল আর কাউকে পাঠানো।'

'চন্দ্রগুপ্ত কাজের লোক। পারতেই হবে ওকে। আর কাউকে পাঠাবার সময় এখন আর নেই, স্যার।'

জটিলেশ্বর ইতস্তত করল খানিক। তারপর মাথা ঝাঁকাল। কাগজ কলম টেনে নিয়ে টেলিগ্রামটা লিখতে শুরু করল সে। তার অকম্পিত হাতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না নীতিশ গুহ। লোকটা নরকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। পা পিছলালেই স্নায়ুযুদ্ধ অস্ত্রযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে। তিলে তিলে গড়া নিজের নাম, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে এই একটি ভুলে। অথচ কি আশ্চর্য শান্ত রয়েছে লোকটা এখনও। এই না হলে চীফ!

'এতে হবে কিনা দেখো,' টেলিগ্রামের খসড়াটা এগিয়ে দিল জটিলেশ্বর।

'হবে স্যার।' নজর বুলিয়েই উঠে দাঁড়াল নীতিশ। 'কোড করে পাঠিয়ে দিই?'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জটিলেশ্বর মাথা কাত করল।

'খুশি হব, গুহ, শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যেই ব্যাপারটা চাপা থাকলে। মেমোটা যদি চন্দ্রগুপ্ত ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় তাহলে নয়াদিল্লীকে সতর্ক করে দেব আমি।' সিলিং-এর দিকে চাইল। 'তারপর আত্মহত্যা করব।'

টেলিগ্রামের খসড়া নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল নীতিশ গুহ।

সাত

চন্দ্রগুপ্ত পছন্দ করে না রানাকে। কোন গুরুত্বও দেয় না। তার ধারণা সাধারণ একজন এজেন্ট রানা। জানে, কারাতে এবং জুডোতে ব্ল্যাক বেল্ট আছে রানার, পিস্তলেও অব্যর্থ লক্ষ্য—কিন্তু তাতে কি? এমন তো আরও অনেকেই আছে। নেহায়েত কপাল গুণে এতদিন টিকে আছে লোকটা। টিকে আছে বলেই সবাই বলা কওয়া করে মাসুদ রানা এসপিওনাজ জগতের বিস্ময়। বিস্মিত হওয়ার কি আছে কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। পরিষ্কার জানে, ভাগ্যের জোরে এত বাহবা কুড়োচ্ছে লোকটা। ওর মত কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করতে হলে টের পেত বাছাধন। নীতিশ গুহ পর্যন্ত ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ—এটা ওর কাছে বড় অসহ্য

ঠেকে। বস্ না হলে কবে শুনিয়ে দিত দু'কথা। চীফ জটিলেশ্বর রায়ের প্রতি ওর অগাধ ভক্তি। একমাত্র তাঁর সাথে নিজের মতের মিল খুঁজে পায় চন্দ্রগুপ্ত—তিনিও রানাকে অতি সাধারণ এক এজেন্ট মনে করেন। গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক ভেবে মনে মনে রীতিমত গর্বিত হয় চন্দ্রগুপ্ত।

যাই হোক, রানার উপর নজর রাখার ব্যাপারে কোন রকম বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেনি সে। নীতিশ গুহ বারবার সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও। এবং ভুল সে করল ওইখানেই।

ব্যাগানযা হোটেলের রেজিস্টারে নাম সই করবার সময় দেখতে পেল রানা ওকে পলকের জন্যে। ডেস্কের পিছনের একটা কাঁচে মুহূর্তের জন্যে প্রতিফলিত হলো চন্দ্রগুপ্তের বিশাল চেহারাটা। দ্রুতপায়ে লবির শেষ প্রান্তে বারে গিয়ে ঢুকল। নিমেষে চিনতে পারল রানা ওকে।

চন্দ্রগুপ্ত! এখানেও! জেটের গতিতে চিন্তা চালু হয়ে গেল ওর মাথার মধ্যে।

থার্ড ফ্লোরে ওর কামরায় পৌছে পোর্টারকে বিদায় করে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরাল রানা। পরিস্থিতিটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

লাহোরে কেন চন্দ্রগুপ্ত? ওর পক্ষে লাগজারি হোটেলে ওঠাই স্বাভাবিক। ব্যাগানযায় কি করছে ও? তেহরানের হোটেলে ওর কামরায় ঢোকার সাথে এখন এই লাহোরে এসে হাজির হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠল রানা। ইশ্শ্! কি বোকা আমি! ঘুমোচ্ছিলাম নাকি এই কয়দিন? ভাবল সে! চোখ খুলে গেছে ওর। সন্দেহ জেগেছিল জটিলেশ্বরের নির্দেশে ঘরে ঢুকে অবাঞ্ছিত কিছু রেখে গেছে চন্দ্রগুপ্ত। সন্দেহ হওয়ায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ও হোটেল রূম। কিন্তু একটা জিনিস ভাল করে খোঁজ করেনি। অথচ সেই জিনিসটাই সাথে করে নিয়ে এসেছে সে লাহোরে।

সুটকেস!

সুটকেসেই কিছু রেখে এসেছিল চন্দ্রগুপ্ত। জিনিসটা যাই হোক, সাথে করে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে সে।

সুটকেস খুলে বিছানার উপর উপুড় করে যাবতীয় জিনিস নামিয়ে ফেলল রানা। শূন্য সুটকেসটা সাবধানে পরীক্ষা করল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ল না। পেননাইফ দিয়ে লাইনিং-এর একটা জায়গা কেটে সুটকেস থেকে ছিঁড়ে বের করে আনল লাইনিংটা। সুটকেসের তলায় লাল চওড়া ফিতে দিয়ে জড়ানো সাদা একটা এনভেলাপ।

ছোট্ট করে শিস দিল রানা। লাল চওড়া ফিতে দেখেই বুঝতে পারল ও এনভেলাপের ভিতর টপ সিক্রেট কিছু আছে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর এনভেলাপটা বিছিয়ে নিয়ে পেননাইফের ডগা ব্যবহার করে সাবধানে খুলে ফেলল রানা ওটার মুখ। ভিতর থেকে বেরোল দামী মসৃণ কাগজের দুটো শীট।

বারবার তিনবার পড়ল রানা লেখাগুলো। ভারতের রাষ্ট্রপতির সই পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। এ সই ওর চেনা। চিঠিটা যে জাল নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে হেডিং-এর দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও।

From the President of India,
কাদের কাছে বিলি করা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা:
For the Defence Minister,
For All HighP Commissioners & Ambassadors Concerned,
For I. S. S. Zonal Heads only.
(Copy 22)
একি এলাহি কাণ্ড! ভাবল রানা। এটা যদি পাকিস্তান বা চীনের হাতে পড়ে তাহলে ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যাবে। এই সাংঘাতিক মেমো ওর সুটকেসে ঢুকিয়ে দেয়ার কারণ কি? জটিলেশ্বর কি···অসম্ভব। কিন্তু এ কী অবিশ্বাস্য কারবার!

আরও একবার মেমোটা পড়ল রানা। আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিং-এর দিকে। দ্রুত কাজ চলছে মাথার ভিতর।

ভারতের প্রেসিডেন্ট বা জটিলেশ্বর রায় কক্ষনো চাইতে পারে না এই বিস্ফোরক মেমো পাকিস্তানে যাক। এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। লাইনের কোথাও, কেউ, সম্ভবত জটিলেশ্বর রায়, মস্ত কোন ভুল করেছে। মানুষ হিসেবে জটিলেশ্বর রায় খারাপ হতে পারে, দাম্ভিক হতে পারে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে, নীচমনা, কুটিল হতে পারে, কিন্তু ও ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং তাকে ব্যবহার করেছে এই ডকুমেন্ট লাহোরে বয়ে নিয়ে আসতে, সেটা এক কথায় অচিন্তনীয়। বিনা দ্বিধায় নাকচ করে দিল রানা সম্ভাবনাটা। আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্ত ডবল এজেন্ট নয়তো? না, তাও সম্ভব নয়। ডকুমেন্টটা যদি ফটো-কপি হত তাহলে চন্দ্রগুপ্তকে সন্দেহ করা যেত। কিন্তু এটা নম্বর দেয়া অরিজিনাল কপি। চন্দ্রগুপ্তের জানা আছে, এটার খোঁজ পড়বে হারাবার সাথে সাথেই। তাছাড়া ডবল এজেন্ট হতে হলে যে মাথা দরকার সেটার অভাব আছে ওর মধ্যে। ওকে বাদ দেয়া যায় অনায়াসে। একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো জটিলেশ্বর—জটিলেশ্বরই যদি হয়—বা আর কেউ ভুল করে বসেছে তাড়াহুড়োয়।

আমার তাতে কি এসে যায়? প্রশ্ন করল নিজেকে রানা। এখন বোঝা যাচ্ছে, ফাঁদ পেতেছিল ব্যাটারা। নকল প্রসূন চ্যাটার্জী আজগুবি গল্প শুনিয়েছে আমাকে। বাজি রেখে বলা যায়, ডলার-ফলারও নেই, কাঠের পরীও নেই কোথাও। অসহায় সিমির বিপদের কাহিনী তৈরি করা হয়েছে আমার মনে করুণার উদ্রেক করে আমাকে লাহোরে আসতে রাজি করাবার জন্যে। সবটাই ফাঁদ। অতি বুদ্ধি খাটিয়ে কুটিল কোন স্কীম তৈরি করেছিল জটিলেশ্বর রায়। মাঝপথে হিতে বিপরীত ঘটে গেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? কি পরিকল্পনা এঁটেছিল কুটিলেশ্বর? কি ধরনের বিপদে ফেলতে চেয়েছিল ওকে?

আরও খানিক চিন্তা করল রানা। কিন্তু কোন ব্যাখ্যা পেল না। কাগজ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কি করবে সে এগুলো নিয়ে? এমন কতগুলো তথ্য রয়েছে এর মধ্যে যেগুলো হাতে পেলে ধিনতা-ধিনাক নেচে উঠবে পাকিস্তান এবং চীন। মহা বিপদে পড়ে যাবে ভারত সরকার। পরোক্ষভাবে বাংলাদেশও জড়িত এর সঙ্গে। পুড়িয়ে ফেলার কথা ভাবল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল পুড়িয়ে

ফেললে জটিলেশ্বর রায়ের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে, এটা নিয়ে খেলা শুরু করলে মন্দ হয় না। নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারে ও এখন জটিলেশ্বরকে। শায়েস্তা করে ছেড়ে দিতে পারে। লোকটার সর্বনাশ চায় না রানা, এমন একটা বিরল প্রতিভা শেষ হয়ে যাক সেটা কখনোই কাম্য নয় ওর, কিন্তু একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকটা একের পর এক অন্যায় আক্রমণ করে যাবে, আর ও কিছুই বলবে না—সেটাও হতে পারে না। উচিত শিক্ষা দেবে ও এবার জটিলেশ্বরকে। ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে—এমন মোক্ষম সুযোগ পেয়ে ছাড়বে কেন সে?

কাগজ দুটো এনভেলাপে ভরে ফেলল রানা। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করে তার পিছনে আটকে দিল খামটা যত্নের সাথে। নাড়াচাড়ায় খসে পড়ে যাবে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারটা যথাস্থানে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ডকুমেন্ট লুকিয়ে রাখার পক্ষে জায়গাটা তেমন সুবিধের হলো না, তবে আপাতত কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওখানে রাখলেই চলবে, ভাবল রানা।

রিস্টওয়াচে দেড়টা বাজছে দেখে ঘরে চাবি মেরে বেরিয়ে এল সে। লাঞ্চটা সেরে নেয়া দরকার।

লাঞ্চ শেষ করে হোটেলেরই ট্যুরিস্ট-ব্যুরো কাউন্টার থেকে গাইড বুক আর লাহোরের ম্যাপ কিনল রানা। লাউঞ্জে বসে শহরের ম্যাপটা দেখল। প্রসূনের দেয়া ঠিকানাঅনুযায়ী ভিক্টোরিয়া রোড, রানা দেখল, ব্যাগানযা হোটেল থেকে খুব দূরে নয়। হেঁটেই যাবে ঠিক করল সে।

রাস্তায় নেমে অসংখ্য মোটর, ট্যাক্সি, টাঙা, ঠেলাগাড়ি, আর গিজগিজে লোক দেখে বুঝল চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তাকে অনুসরণ করা এখানে সহজ। ফুটপাথে বারবার দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দোকানের শো কেসের দিকে চেয়ে থাকার ফাঁকে ফাঁকে চারদিক দেখে নিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হাজার হাজার লোক চারপাশে, কিন্তু তাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তকে দেখতে পেল না ও।

চন্দ্রগুপ্ত তখন পার্ক লাগজারি হোটেলে ঢুকছে। রানা কোন্ হোটেলে উঠেছে জানতে পেরেই খুশি মনে চলে গিয়েছিল যাদুঘর দেখতে। দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্টের আশপাশটা একবার ভাল মত পরীক্ষা না করে রানা টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করবে বলে মনে করে না সে। দেখুক। নির্বিঘ্নে ঘুরে ফিরে আসুক। সন্ধে থেকে পিছু লাগলেই চলবে। যাদুঘর দেখে হোটেলে ফিরছে সে নিশ্চিন্ত মনে।

চাবি চাইতেই চাবির সাথে একটা টেলিগ্রামও দিল ডেস্ক ক্লার্ক। নিজের ঘরে উঠে গিয়ে টেলিগ্রামটা পড়ল চন্দ্রগুপ্ত। গোটা কয়েক হারিয়ে যাওয়া চিঠি ও ইনভয়েসের সন্ধান জানাবার অনুরোধ করা হয়েছে টেলিগ্রামে। অনুরোধের নিচে ইনভয়েস নম্বর এবং চিঠির তালিকা। চন্দ্রগুপ্ত জানে এই নম্বরগুলোই হলো আসল জিনিস। মেসেজ ইন কোড।

মিনিট বিশেক নম্বরগুলোর সাথে ধস্তাধস্তির পর মেসেজটা দাঁড়াল এই রকম:

Ult. Urg. MR. Pa, s. c. Im Rt. T. S. Ay.
d1. Liq. i. n. Rt. a. a. c. rpt. a. a. c. vt. J.

অর্থাৎ:

আলটিমেট আর্জেন্সি। পেপারস ইন মাসুদ রানাজ সুটকেস মাস্ট বি রিটার্নড ইমিডিয়েটলি। দে আর টপ সিক্রেট। মেক এনি ডিল উইথ হিম। ইফ নেসেসারি, লিকুইডেট হিম। রিটার্ন দিজ পেপারস. অ্যাট এনি কস্ট, রিপিট, অ্যাট এনি কস্ট। ভাইটাল। জটিলেশ্বর।

আরও একবার মেসেজটা পড়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে নিজের চোয়ালে ঘুষি মারল চন্দ্রগুপ্ত।

এ আবার কি ভেলকি! ফিরিয়ে আনতে বলছে কেন? যে কোন শর্তে! প্রয়োজন হলে রানাকে হত্যা করে। বাব্বা! আবার পড়ল সে মেসেজটা। গরম হয়ে উঠেছে ওর অ্যাসাইনমেন্ট। ঘটে গেছে ভয়ানক কিছু। উত্তপ্ত আঁচ অনুভব করল সে। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। হুকুম হুকুম। এনভেলাপটা ফিরিয়ে আনা কঠিন কোন কাজ হবে না। রানা জানে না তার সুটকেসে আছে ওটা। বাথরুমে ঢুকে টেলিগ্রাম এবং যে কাগজে মেসেজটা ডিকোড করেছে সেটা পুড়িয়ে ছাইটুকু কমোডে ফেলে চেন টেনে দিল সে। ব্রীফকেস খুলে থ্রী-টু পুলিস অটোমেটিকটা বের করল একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে নিয়ে পকেটে ভরল সেটা। এবার তিন ইঞ্চি লম্বা একটা সাইলেন্সার বের করে সেটাকেও পকেটে ঢোকাল দ্রুত। 'ইফ নেসেসারি, লিকুইডেট হিম।' লাইনটা বড় পছন্দ হয়েছে ওর। ভাবল, রানার সাথে দর কষাকষি করার চেয়ে তাকে সাফ করে দেয়াই সহজ হবে। নিজেকে ঈশ্বরের মত ক্ষমতাশালী মনে হলো ওর। ওর ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে এখন রানার জীবন।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ব্যাগানযা হোটেলে পৌঁছল চন্দ্রগুপ্ত। ঘড়ি দেখল, তিনটা বিশ। রিসেপশন ক্লার্কের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'মাসুদ রানা বলে এক ভদ্রলোক উঠেছেন এই হোটেলে?'

'ইয়েস, স্যার,' বলল ক্লার্ক। কী র‍্যাকের দিকে চেয়ে বলল, 'রুম নাম্বার থ্রী হানড্রেড সেভেন। থার্ড ফ্লোর। মি. মাসুদ রানা এই মুহূর্তে বাইরে। উনি ফিরলে কিছু বলতে হবে?'

'তার দরকার নেই,' চন্দ্রগুপ্ত বলল। 'পরে ফোন করব আমি। ধন্যবাদ।'

অ্যান্টিকস এর দোকানগুলোয় ঘুর ঘুর করল সে খানিকক্ষণ। একটু পর যখন বুঝতে পারল ক্লার্ক তাকে ভুলে গেছে, তখন ধীর পায়ে এলিভেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বোতাম টিপতেই নেমে এল খালি লিফ্‌ট্‌। ভিতরে ঢুকে তিন নম্বর বোতামটা টিপে দিল সে।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চন্দ্রগুপ্ত ভাবল, কাজটা নেহায়েতই সহজ সাদামাঠা হয়ে গেল। রানার অনুপস্থিতিতে এখন সে নিরুপদ্রবে এনভেলাপটা পুনরুদ্ধার করবে এবং তারপর জটিলেশ্বর রায়কে টেলিগ্রাম করবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। একটু বাধা পড়লেই যেন মজা হত।

তিনশো সাত নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একখানা সেলুলয়েডের টুকরো বের করে এদিক ওদিক তাকাল সে। নির্জন করিডর। দশ সেকেন্ডের মধ্যে তালা খুলে বেডরুমে ঢুকল সে। প্রশস্ত কার্পেট মোড়া ঘর, আর দামী সৌখিন ফার্নিচার দেখে হিংসা হলো ওর। হারামীটা স্টাইল জানে, স্বীকার করল সে মনে মনে। যেখানেই যাক, সেরা হোটেলে থাকবে ব্যাটা রাজার হালে। দরজায় বল্টু

লাগিয়ে দিয়ে লাগেজ র‍্যাকে রাখা সুটকেসটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্ত। সুটকেসটায় তালা লাগানো নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল। ঢাকনি তুলে ভিতরে চেয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর কলজেটা। লাইনিং ছেঁড়া। নেই ওটা!

শূন্য দৃষ্টিতে সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এনভেলাপটা এর ভিতর ছিল সে কথা রানার মত সাধারণ একজন এজেন্ট টের পেল কি ভাবে।

সুটকেসের ঢাকনি নামিয়ে রুমের চারদিকে তাকাল চন্দ্রগুপ্ত। রুমটা সার্চ করা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। সাধারণ এজেন্ট হলেও, ভাবল সে, ট্রেনিং পেয়েছে রানা। প্রফেশনাল। হয় সে ওটা সাথে করে নিয়ে গেছে, নয়তো এমন কোথাও লুকিয়ে রেখেছে যে খুঁজে পেতে হলে তোলপাড় করতে হবে সারাটা কামরা। সেটা এখন সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। আসুক ফিরে, তারপর দেখা যাবে।

পিস্তলটা বের করে সাইলেন্সার ফিট করল সে। রানার সাথে কথা না বলে এখন আর উপায় নেই। ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই ডকুমেন্টগুলো পড়ে ফেলেছে। তার মানে জটিলেশ্বর রায়কে ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ এখন ওর হাতের মুঠোয়। কামানো গালে হাত ঘষতে লাগল চন্দ্রগুপ্ত। যে-কোন মূল্যে ওর সাথে আপস চুক্তিতে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওকে। অর্থাৎ, রানার যে কোন দাবি মেনে নিতে পারে সে। ঠিক আছে অসুবিধে কি?—ও যা চাইবে তাতেই রাজি হয়ে যাবে সে। তারপর ডকুমেন্টগুলো হাতে এলে, টিপে দেবে ট্রিগারটা। শব্দহীন একটা বুলেট ঠিক জায়গা মত ঢুকে গেলেই ধীরে সুস্থে হোটেল থেকে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারে সে, পরবর্তী প্লেনে পৌঁছে যেতে পারে তেহরানে। ঝামেলার কিছুই দেখতে পেল না চন্দ্রগুপ্ত। খুশি মনে খুলে দিল সে দরজার বল্টু। তারপর ইজি চেয়ারে আরাম করে বসে বিশাল ঊরুর উপর সাইলেন্সার ফিট করা অটোমেটিকটা রেখে সিগারেট ধরাল। অপেক্ষা করবে সে রানার জন্যে।

এদিকে এগলি ওগলি ঘুরে খাস্তা খান রোডে পৌঁছে রানা নিশ্চিত হলো, কেউ ওকে অনুসরণ করে আসেনি। আরও খানিক এদিক ওদিক ঘুরে ভিক্টোরিয়া রোডে চলে এল সে। ঠিকানা মিলিয়ে নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে আবছা অন্ধকার লবি দেখতে পেল সে। ডাইনে বাঁয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। চুন, প্লাস্টার খসে পড়া দেয়ালে লাইন বন্দী গোটা কয়েক ডাক বাক্স। পাঁচতলার সেই ঘরটায় দিলারা দুররানী বলে একটা মেয়ে থাকে এখন। হয়তো আগেও থাকত। তবু দেখা দরকার।

সিঁড়ি ভেঙে পাঁচ তলায় উঠে গেল রানা। দিলারা দুররানী লেখা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

ঘরের ভিতরে খুটখাট শব্দ। পনেরো সেকেন্ড পর খুলে গেল দরজা।

কোমর পর্যন্ত ঝুলন্ত ঘন কালো চুল দেখেই মেয়েটাকে ভাল লেগে গেল রানার। শুধু চুল নয়, ফিগারটাও আকর্ষণীয়। এক নজরেই বোঝা যায়, বাঙালী। কিন্তু বাঙালী সুলভ সঙ্কোচের ছিটেফোঁটাও নেই চোখের দৃষ্টিতে। সহজ, স্বচ্ছন্দ। হালকা নীল রঙের শাড়িতে অপূর্ব লাগল ওর মেয়েটাকে। ভুবনজয়ী হাসি হাসল রানা।

'মাফ করবেন,' পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'দেখে মনে হচ্ছে

বাঙালী, বাংলায় কথা বলতে পারি?'

আলী সাহেবের কাছে আবার যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল রানী। সকালে একবার গিয়ে পায়নি তাকে। কথা নেই বার্তা নেই, সুদর্শন, ঋজু, চওড়া কাঁধের বাঙালী যুবকের আগমনে বুকের ভিতর অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ওর।

'পারেন। কি দরকার আপনার?'

মেয়েটাকে ছাড়িয়ে রুমের ভিতর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রানার। এক কোণে কাঠের পরীটা দেখতে পেল ও। যাক, প্রসূনের দেয়া তথ্যের অন্তত একটা অংশ মিথ্যে নয়।

'প্রসূন চ্যাটার্জী নামে কেউ থাকে এখানে?' রানা জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে ভাবতে শুরু করল ও, ভয় পাবার কারণ কি হতে পারে?

'না।'

'হায় হায়!' হতাশ হওয়ার অভিনয় করল রানা। 'ভুল ঠিকানা দিল নাকি? অনেক দিনের পুরানো বন্ধু···আচ্ছা, বলতে পারেন ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'না,' রানী বলল। 'এখানে ওই নামে কেউ নেই। ছিলও না।' কথাটা বলেই রানার মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল রানী।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করল রানা। তারপর নিজেকে শাসন করল—একসাথে বেশি আশা করা উচিত নয়। কাঠের পরীটা অন্তত আছে এখানে। ব্যাপারটা আরও খানিকটা ভেবে চিন্তে দেখে সাবধানে এগোনো দরকার। সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল ও। দিলারা দুররানী নামটা সুন্দর। মেয়েটাও। কে ও? অমন ভয় পেয়েছে কেন? বাইরে রাস্তার উপর দাঁড়াল রানা। সত্যিই কি টাকাগুলো পরীটার দেহের ভিতর আছে? যদি থাকে, কিভাবে সংগ্রহ করবে সে? খোঁজ করে বের করতে হবে মেয়েটা একা থাকে কিনা এবং কখন সে বাইরে বের হয় কিংবা আদৌ হয় কিনা। আচ্ছা, টাকার কথা মেয়েটা জানে না তো? ঘনঘন মাথা দোলাল রানা। কেমন যেন জটিল মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখন। প্রসূন ছোকরাটা জটিলেশ্বরের নিযুক্ত অভিনেতা, নাকি দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা, তাই নিয়ে খটকা বেধে গেছে রানার মনে। জটিলেশ্বরের পরিকল্পনার সাথে যদি প্রসূনের কাহিনীর কোন যোগ না থাকে তাহলে ডলারগুলো রয়েছে ওই পরীটার ভিতর। যদি থাকে, উদ্ধার করা খুব সহজ হবে না।

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন এইরকম সাত পাঁচ ভাবছে রানা, উল্টোদিকের দালানের পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে সিকান্দার বিল্লার নিযুক্ত লোক আজমল খান ফটো তুলে নিল ওর। রুটিন ওয়ার্ক। দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে যে-ই ঢুকুক বা বেরোক সবারই ফটো তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ছত্রিশটা ফটো তোলা হয়েছে। টেলিফটোলেন্স ফিট করা থারটি ফাইভ মিলিমিটার আসাহি পেন্ট্যাক্স সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজ বের করে সহকারী সুলতান বেগের হাতে দিল সে।

'ডার্করুমে নিয়ে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো ওয়াশ করে পোস্টকার্ড সাইজ প্রিন্ট করে ফেলো সব কটা ছবি।' বলল আজমল খান। 'শালা সিকান্দারের বাচ্চা অপেক্ষা করছে, দুই ঘন্টার মধ্যে ছবিগুলো হাজির করতে হবে ওর সামনে যাও, কুইক!'

ফিল্ম কার্ট্রিজ নিয়ে রওনা হয়ে গেল সুলতান বেগ ব্যস্ত পদে।

ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে রানা ভাবছিল দিলারা দুররানী সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কিভাবে সংগ্রহ করা যায়। মিনিট বিশেক হাঁটার পর সামনে একটা পাকা চত্বর দেখতে পেল ও। চোখ গিয়ে পড়ল চত্বর ছাড়িয়ে মার্ভেল নাইট ক্লাবের প্রবেশ পথে। পাশের উঁচু দেয়ালে একটা পোস্টার দেখে থমকে দাঁড়াল রানা। দিলারা দুররানীর ছবি! শরীরে কাপড়-চোপড়ের বালাই সামান্যই। পোস্টারটা পড়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না রানা। রোজ রাতে পপ গান গায় মেয়েটা মার্ভেল নাইট ক্লাবে। রানা ঠিক করল আজ রাতেই আসবে সে এখানে দিলারা দুররানীর গান শুনতে।

হোটেলে ফিরে চাবি চাইতে রিসেপশন ক্লার্ক চাবি দিয়ে বলল, 'এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজে গেছেন! পরে ফোন করবেন বললেন।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত হলো রানা। 'কে হতে পারে বুঝতে পারছি না। চেহারাটা মনে আছে আপনার?'

'ইয়েস, স্যার।' স্মরণ শক্তির জন্য গর্ব বোধ করছে লোকটা। 'লম্বা, বডিবিল্ডার। ভদ্রলোকের ডান কানের লতি নেই।'

নিঃশব্দে হাসল রানা।

'চিনেছি। জানতাম না ও লাহোরে আছে। পুরানো বন্ধু আমার।'

এলিভেটরে চড়ে রানা ভাবল, চন্দ্রগুপ্ত যখন ওর খোঁজ করছে সতর্ক থাকতে হবে। ওর সুটকেসে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ভরে দেয়ার পিছনে ওদের কি উদ্দেশ্য সেটা পরিষ্কার না জানা পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এলিভেটর থেকে নেমে নিজের কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠেলা দিয়ে কপাট দুটো দু'পাশে সরিয়ে দিল। ঘরের ভিতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে পা বাড়াল সামনে। চন্দ্রগুপ্তকে ইজি চেয়ারে বসে থাকতে দেখে মোটেই অবাক হয়নি সে।

'হ্যালো, অর্ধচন্দ্র, কেমন আছ?' দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'বউ কেমন আছে? কাচ্চা বাচ্চা ডজন ছাড়িয়ে গেছে নিশ্চয়ই এতদিনে?'

অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা চেপে ধরে আগুন নিভিয়ে ফেলল চন্দ্রগুপ্ত। বিশাল দেহের ভার একদিক থেকে আর একদিকে চাপিয়ে অটোমেটিকটা আড়চোখে দেখে নিয়ে হিসেব করল, দরকারের সময় দ্রুত হাতে তুলে নিতে অসুবিধে হবে কিনা। [illegible]লচে, ভরাট মুখটা ভাবলেশহীন। 'বসুন, মিস্টার মাসুদ রানা।' ভারী গলায় বলল সে, 'আপনার সাথে কথা আছে আমার।'

হাসল রানা। 'তাই বুঝি চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? শোনো মৌর্যবংশের সম্রাট, অত বড় একটা পেট নিয়ে গর্ভবতী গাভীর মত অযথা এই দুনিয়ায় বেঁচে আছ, চরে বেড়াচ্ছ, এই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আমার পেছনে লাগবার খায়েশ হলো কেন আবার? গতবার তোমার দোসর সমরজিতের কি দশা করে ছেড়েছিলাম মনে নেই? শখ মেটেনি এখনও তোমাদের?'

ঝট্ করে পিস্তলটা হাতে তুলে নিল চন্দ্রগুপ্ত। 'বেশি কথা বোলো না, ছোকরা!' দাঁতে দাঁত চেপে ধমক দিল সে। 'যা বলছি তাই করো। বসো ওই চেয়ারটায়!'

জোরে হেসে উঠল রানা। 'নইলে মারবে? মারো, চন্দ্রগুপ্ত। কি হলো? আঙুল সরছে না? করো, গুলি করো।'

সাবলীল ভঙ্গিতে লম্বা পা ফেলে চন্দ্রগুপ্তের সামনে এসে দাঁড়াল ও। হাসছে। 'কই গুলি করছ না কেন, অর্ধচন্দ্র?' বাম হাতে সাঁই করে কারাতের কোপ চালাল সে চন্দ্রগুপ্তের কব্জির উপর। পিস্তলটা হাত থেকে খসে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে ওয়ারড্রোবের কাছে।

বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতে গেল চন্দ্রগুপ্ত, ধাক্কা দিয়ে তাকে ইজি চেয়ারে প্রায় শুইয়ে দিল রানা। 'আরাম করো, অর্ধচন্দ্র। এখুনি আমাকে খুন করতে পারো না তুমি। কথা আছে আমার সাথে—মনে নেই?'

কব্জিতে ব্যথা পেয়েছে চন্দ্রগুপ্ত। বাম হাতে জায়গাটা ডলতে ডলতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল রানাকে। বিফল হলো বেচারা। দিব্যি বিছানায় গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল রানা মাথার নিচে দু'হাত দিয়ে। ছাতের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কি কথা? যা বলবার ঝটপট বলে কেটে পড়ো প্রাণ নিয়ে।' পিস্তলটা কুড়িয়ে এনে চেয়ারের কাছাকাছি টেবিলের উপর রেখে চন্দ্রগুপ্ত বসল আবার। 'আপনি···আপনার কাছে একটা টি. এস. মেমো আছে। ওটা আমি চাই।'

'ওটা তুমি চাও?' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'মামার বাড়ির আবদার নাকি? তুমি কেন, আরও কেউ কেউ চায় ওটা। ভুট্টো ওটা চান। মাও সে-তুং ওটা চান। আরও অনেকের মত আমার প্রাণাধিক সুহৃদ শ্রী শ্রী জটিলেশ্বর রায়ও ওটা চান।'

অতি কষ্টে রাগ চেপে রাখল চন্দ্রগুপ্ত। থম থম করছে তার ভরাট মুখটা। 'ওটা দিয়ে দিন, মি. মাসুদ রানা। আপনার রসালাপ আমি শুনতে আসিনি।'

'রসিকতা আমি করছি না তোমরা করছ, অর্ধচন্দ্র?' সহজ কণ্ঠে বলল রানা, 'প্রথম থেকে শুরু করলে কেমন হয়? তেহরানে তুমি আমার হোটেল রুমে ঢুকে এই টি. এস-টা আমার সুটকেসে ঢুকিয়েছিলে। কেন? একবার মনে হয়েছিল তুমি ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছ। কিন্তু পরে ভেবে চিন্তে দেখেছি, ওধরনের কাজ করার যোগ্যতা বা বুদ্ধিমত্তা তোমার নেই।'

চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল চন্দ্রগুপ্ত।

'অ্যাঁ! কী বললেন! আমি···ডাবল এজেন্ট?' রাগের ঠেলায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে।

'শান্ত হও, অর্ধচন্দ্র। বসো। প্রতিটি কথায় যদি অমন বিচলিত হয়ে ওঠো তাহলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ডাবল এজেন্ট নও। বোকা, সন্দেহ নেই, কিন্তু সৎ লোক। ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই ন? অন্যকিছুর বদলে ভুল করে জটিলেশ্বর এটা তোমাকে দিয়ে ফেলেছে। ঠিক'

'আপনার সাথে আমি কোন কথা বলতে চাই না। ওটা দিয়ে দন, কোন গোলমাল না করে চলে যাব।' চন্দ্রগুপ্ত সামনে ঝুঁকল। ঘাম ফ উঠেছে তার কপালে। চোখ দুটো লাল। 'আমি জানি বাংলাদেশ কাউন্টা ইন্টেলিজেন্স থেকে বের করে দেয়ার পর যা খুশি করে বেড়াচ্ছেন আপনি। কি একটা দেশের গোপন মেমো হাতে পেয়ে তার থেকে ফায়দা ওঠাবেন— , কিছুতেই হতে দেব না আমি। দিয়ে দিন ওটা, আমি তেহরানে ফেরত নি বি।'

'দায়ী কে, চন্দ্রগুপ্ত?' গম্ভীর হয়ে গেল া। 'আমি না তোমরা? তোমরা জড়িয়েছ আমাকে এর মধ্যে আমার ই র বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্যটা জানতে হবে

আমার। জানতে হবে, কি প্যাঁচে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিলে তোমরা আমাকে। জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেব ওটা তোমাকে ফেরত দেব কি দেব না। কাজেই শুরু করো। তবে সাবধান গর্দভচন্দ্র, কোন মিথ্যে গল্প শোনাবার চেষ্টা কোরো না আমাকে। ধরে ফেলব। এখানে পা দেবার পর থেকে বসে নেই আমি। দিলারা দুররানী সম্পর্কে সব জানি। সম্পূর্ণ কাহিনীটা এবার বলে ফেলো দেখি?'

টেবিলের উপর রাখা অটোমেটিকের দিকে তাকাল চন্দ্রগুপ্ত।

'উঁহুঁ! বোকামি কোরো না, অর্ধচন্দ্র।' মৃদু হাসল রানা। 'ওটা আমি এমন জায়গায় রেখেছি, তুমি খুঁজে পাবে না কিছুতেই। কিন্তু আমাকে খুন করলে···ইচ্ছেটা সেই রকমই দেখতে পাচ্ছি···আগে বা পরে··· পাকিস্তান এবং তার হাত দিয়ে চীনের কাছে পৌঁছবে ওটা। বুঝতে পেরেছ? নাও, শুরু করো। শোনা যাক জটিল রায়ের কুটিল পরিকল্পনার কথা।'

চন্দ্রগুপ্ত ইতস্তত করছে।

'সব শুনেও যদি ওটা না দেন আপনি? কি করে জানব যে আপনি ফেরত দেবেন?'

'তোমার জানার উপায় নেই। আমি জানি,' রানা বলল। 'হেসো না, আমার ওপর বিশ্বাস না রেখে পথ নেই তোমার।'

'বিশ্বাসের নিকুচি করি আমি!' খেপে উঠল চন্দ্রগুপ্ত। 'খুন হয়ে যাবে মাসুদ রানা! মা কালির দিব্যি···' রাগে কাঁপছে সে।

হেসে উঠল রানা।

'এসপিওনাজ লাইনে না এসে সিনেমার লাইন ধরা উচিত ছিল তোমার, চন্দ্রগুপ্ত। ডায়ালগটা তোমার মুখে মন্দ শোনাচ্ছে না। এখনও সময় আছে, দেশে ফিরে নেমে যাও।'

রাগ সামলে নিয়ে নিজের অবস্থা ভালমত বুঝে দেখল চন্দ্রগুপ্ত। অসহায় বোধ করছে সে। জটিলেশ্বর রায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হত। এই অবস্থায় কি করা উচিত ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ওর, অথচ হাতে সময়ও নেই। ওকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজকের কেব্‌লে জটিলেশ্বরের নির্দেশের কথা—'মেক এনি ডিল।'

'ঠিক আছে,' রাগত দৃষ্টিতে চাইল সে রানার দিকে, 'বলছি।' তর্জনী তুলল সে শাসনের ভঙ্গিতে, 'কিন্তু সব শোনার পরও যদি ওটা ফেরত না দেন, তাহলে এসপার ওসপার হয়ে যাবে—আজই।'

গড় গড় করে বলে গেল চন্দ্রগুপ্ত বরকতউল্লার পলায়নের কথা, তার বদলে সুনীল নাগকে লাহোরে পাঠাবার জন্যে রানাকে স্মোক স্ক্রীন হিসেবে ব্যবহার করবার কথা, প্রাণেশ মজুমদারকে দিয়ে প্রসূন চ্যাটার্জীর অভিনয় করাবার কথা, গত মাসের বাতিল করা কোডের সিগন্যাল ওর সুটকেসে ভরে দিতে গিয়ে ভুল হয়ে যাওয়ার কথা, রানা কাঠের পরীর ভিতর থেকে ডলারগুলো সংগ্রহ করবার সাথে সাথে তাকে স্পেশাল পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনার কথা।

চোখ বুজে সব শুনল রানা। চন্দ্রগুপ্ত থামতে চোখ মেলে ম্লান হাসল।

'তার মানে আমার পেছনে ব্লাড হাউন্ড লেলিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছিল

কুটিলেশ্বর? শেষ করে দিতে চেয়েছিল জন্মের মত!' অবাক হয়ে উপলব্ধি করল রানা কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে লোকটার মনের বিষ। এতটা কল্পনাও করতে পারেনি সে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থতমত খেয়ে গেল সত্যের মুখোমুখি হয়ে। এতটা ঘৃণা করে জটিলেশ্বর ওকে! 'যাই হোক,' বলল রানা, 'কাঠের পরীর ভেতর পঁচাত্তর হাজার ডলার তাহলে সত্যিই আছে?'

'আছে। আমি নিজ হাতে রেখে এসেছি।'

'ও. কে.,অর্ধচন্দ্র,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। পা দুটো ঘুরিয়ে নামাল কার্পেটের উপর, উঠে বসল খাটের কিনারে। 'এবার কাজের কথা হোক। আজ রাতে দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে টাকাগুলো নিয়ে আসবে তুমি। আশেপাশেই থাকব আমি। দেখা হবে আমাদের এয়ারপোর্টে। তুমি আমাকে টাকাগুলো দেবে—আমি তোমাকে মেমোটা দেব। অলরাইট? তারপর তুমি তেহরানে ফিরে গিয়ে আমার ভালবাসা জানাবে কুটিলেশ্বরকে। বলবে, টাকাগুলো রেখে দিয়েছি আমি ফাইন হিসেবে। কিন্তু সাবধান! দয়া করে পুলিসকে খবর দিয়ো না। জেনে রাখো, আমি ধরা পড়লে গড় গড় করে বলে দেব ওদের গোপন মেমোর বিষয়বস্তু। এবং তার বিনিময়ে মুক্ত করব নিজেকে। বোঝা গেছে?'

'হুম!'

অটোমেটিকটা পকেটে ভরে দরজার দিকে এগোল চন্দ্রগুপ্ত।

'আজ রাত সাড়ে দশটার দিকে,' রানা বলল। 'আমি থাকব আশেপাশেই। লক্ষ রাখব তোমার ওপর। এক পা এদিক ওদিক দেখলেই হাওয়া হয়ে যাব। বোঝা গেছে?'

'হুম!' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল চন্দ্রগুপ্ত।

আট

প্রকাণ্ড অফিসরুমে ঢুকে প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল সিকান্দার বিল্লাহ। গভীর মনোযোগের সাথে একটা ফাইলের পাতা উল্টাচ্ছিল তারিক আখতার, চোখ তুলে চাইল, ফাইল বন্ধ করে সরিয়ে দিল একপাশে।

'কি খবর, সিকান্দার?'

চেয়ার টেনে বসল সিকান্দার বিল্লাহ।

'বিশেষ কিছু না, তবে একটা ছবি এনেছি, স্যার, দেখে আগ্রহ হবে আপনার।' পকেট থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটো বের করে তারিক আখতারের হাতে দিল সে।

ফটোর দিকে তাকাল তারিক আখতার। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু দপ্ করে জ্বলে উঠল যেন ওর সবুজ চোখ দুটো।

'মাসুদ রানা!' শান্ত গলায় বলল সে।

'ভাগ্য গুণে পেয়েছি, স্যার। আজমল খানকে নির্দেশ দিয়েছিলাম দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ থেকে যারাই বেরুবে তাদের প্রত্যেকের ছবি তুলতে। ধরা পড়েছে একটা গভীর জলের মাছ।'

'মাসুদ রানা!' নামটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল তারিক আখতার। বসে রইল চুপচাপ। চিন্তা করছে। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, 'বরকতউল্লার বদলে রানাকে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে।' তাকাল সিকান্দার বিল্লার দিকে। 'কী আশ্চর্য! রানা বাংলাদেশের এজেন্ট।' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। 'বরকতউল্লার বদলে রানা…নাহ্, এটা হতে পারে না। দু'জন আলাদা দুই ক্লাসের এজেন্ট। কোথাও ঘাপলা আছে। বরকতউল্লার বদলে যে লোক আসবে তাকে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে এখানে…চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে…না, রানা হতে পারে না।'

'হয়তো স্থায়ীভাবে কাউকে পাঠাবার আগে সাময়িক কাজ চালাবার জন্যে একে পাঠিয়েছে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল তারিক আখতার। 'জটিলেশ্বরের কাজের পদ্ধতি এটা নয়।' আবার সশব্দে চিন্তা করতে শুরু করল সে। 'রানাকে হয়তো স্মোক স্ক্রিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জটিলেশ্বর হয়তো চাইছে রানাকে আমরা বরকতউল্লার রিপ্লেসমেন্ট বলে মনে করি।'

সিকান্দার বিল্লাহ হাল ছেড়ে দিয়ে শ্রাগ করল। সিগারেট ধরাল। বুদ্ধি খাটানো, চিন্তা করা তারিক আখতারের কাজ। ওর কাজ সেই ভাবনা চিন্তাগুলোকে কাজে পরিণত করা।

'আর কিছু?' তারিক আখতার জিজ্ঞেস করল। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে ফটোটার দিকে।

'খাস্ত্র খাঁ রোডে মোহাম্মদ আলী নামে এক বুড়োর কাছে গিয়েছিল আজ দিলারা দুররানী। সকালে। পায়নি। এই মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। সন্দেহজনক চরিত্র। পাসপোর্ট জাল করে—এই সন্দেহে ধরা পড়েছিল বছর দুয়েক আগে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একটার পর একটা ব্যবসা ধরা এবং ছাড়া লোকটার সুপরিচিত অভ্যাস। ইদানীং করে চামড়ার ব্যবসা। দিল মোহাম্মদের বিশ্বাস, এখনও সে পাসপোর্ট জাল করে। যদিও প্রমাণ নেই তার হাতে।'

'মেয়েটা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল তো এতক্ষণ পর্যন্ত আঙুল চুষছ কেন তোমরা? দিল মোহাম্মদ অ্যারেস্ট করেনি কেন আলীকে?'

'ও বলছে প্রমাণ নেই…শুধু সন্দেহের ওপর…'

'প্রমাণের দরকার নেই আমাদের,' চটে উঠে বলল তারিক আখতার। 'অ্যারেস্ট করে পিটালেই প্রমাণ বেরিয়ে যাবে। আস্তানাটা সার্চ করো। পাসপোর্ট জাল করলে কিছু না কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবেই। ডু ইট অ্যাট ওয়ান্স।'

চেয়ার ছাড়ল সিকান্দার বিল্লাহ।

'আর রানা?'

'ওকে ঘাঁটিয়ো না এখন। ওর ব্যাপারে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেব আমি। পরে।' আশ্চর্য এক টুকরো ক্রূর হাসি ফুটে উঠল তারিক আখতারের ঠোঁটে। 'তবে খেয়াল রেখো, হাত ফসকে বেরিয়ে না যায় আবার। কোথায় উঠেছে বের করে ফেলো, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিয়ো না, অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। বরকতউল্লার হদিশ দিতে পারে ও আমাদের।'

'আর, দিলারা দুররানী?'

'ওকেও ভয় দেখিয়ো না। বরকতউল্লার হদিশ ওর কাছ থেকেও পেতে পারি আমরা। ওর ঘরে মাইক্রোফোন রেখে আসার ব্যবস্থা করো। আজ রাতে বাইরে বেরুলে আজমল খানকে পাঠাও ওর রুমে। রানা ওর ওখানে গিয়েছিল যখন, আবার যাবে। ওদের কথাবার্তার টেপ রেকর্ড চাই।'

'অলরাইট বস্।' দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ। খেলা জমে ওঠায় উৎসাহে ফেটে পড়ছে সে।

ফটোটা ফেরত দেয়নি তারিক আখতার। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই চোখদুটো ফিরে এল ওর উপর। দেখছে রানাকে। মনে মনে বুলল—সময় ফুরিয়েছে তোমার, মাসুদ রানা। এতদিনে পেয়েছি তোমাকে। কল্পনাও করতে পারবে না তুমি কতটা ভয়ঙ্কর তারিক আখতারের প্রতিশোধ। মনের পর্দায় ভেসে উঠল বড় ভাই জেনারেল এহতেশামের মুখটা।—বদলা নেব এবার, ভাইয়া। দেখে শান্তি হবে তোমার আত্মার। আমিও শান্তি পাব।

নৃশংস ভঙ্গিতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল সে রানার ছবিটা।

রানা সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন ওদের মনে। গত এক ঘণ্টা ওকে নিয়ে আলোচনা করেছে রানী ও বরকতউল্লাহ, কিন্তু ওর হঠাৎ আগমন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কে লোকটা? প্রসূন চ্যাটার্জীই বা কে? লোকটা জটিলেশ্বরেরই কোন এজেন্ট নয়তো? কিন্তু তাহলে কোন রকম ইঙ্গিত দিল না কেন? বরকতউল্লাহকে খোঁজার জন্যে এসেছিল? তাহলে জোর না খাটিয়ে ফিরে গেল কেন?

ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বরকতউল্লার হাত পা। বাথরুমে লুকিয়েছিল সে রানী যখন কথা বলছিল রানার সাথে। অটোমেটিকটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। নেয়ে উঠেছিল ঘেমে।

'কিছুই মগজে ঢুকছে না আমার,' হতাশ হয়ে বলল সে শেষ পর্যন্ত। 'এত আলোচনা করে লাভ নেই কোন। লোকটা হয়তো সাধারণ কেউ, ভুল ঠিকানায় এসেছিল বন্ধুর খোঁজে।' রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল সে। 'আলী সাহেবের ওখানে যাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

রানী নড়ে বসল। কি যেন ভাবল সে। তারপর মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ…যাই আমি।'

বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছে বরকতউল্লাহ রানীর পাসপোর্টের জন্যে। ফিল্ম কার্ট্রিজটা দিল সে ওকে। 'কমপক্ষে দুই হাজার টাকা চাইবে।' একশো ডলারের একটা নোট বের করল বরকতউল্লাহ। 'বাকি টাকা পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে দেব, বলবে।'

রানী যখন রওনা হচ্ছে ঠিক সেই সময় তেত্রিশ নম্বর খাস্তা খাঁ রোডের পাঁচ তলায় জানালার সামনে বসে হাতের ব্যান্ডেজটা নতুন করে বাঁধছিল বৃদ্ধ মোহাম্মদ আলী। সকালে ডাক্তারখানায় গিয়েছিল সে। ইঞ্জেকশন দিয়েছে, কিন্তু ব্যথা কমেনি তাতে। ডাক্তারের মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তার হাতের অবস্থা ভাল নয়। পরদিন যেতে বলেছে ডাক্তার আবার। বরকতউল্লার পাসপোর্টের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা

রয়েছে ওর মনে। না জানি কি বিপদে আছে লোকটা। রাগ হলো নিজের হাতটার উপর। ঠিক দরকারের সময়ই ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেল বটিটা। আর সময় পেল না, ঠিক…গাড়ির শব্দে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল আলী সাহেব। সাথে সাথেই বুকের মধ্যে লাফ দিল ওর প্রাচীন হৃৎপিণ্ডটা। পুলিস ভ্যান!

জনা দশেক সশস্ত্র পুলিস লাফ দিয়ে নামল রাস্তায়। ছয়জন ঘিরে ফেলছে বাড়িটা, চারজন দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে সিঁড়ি ঘরের দিকে।

ভূমিকম্প শুরু হলো আলী সাহেবের বুকের ভিতর। বুঝে ফেলেছে সে। কি ঘটতে চলেছে সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই তার মনে। গত একটি বছর ধরে এই আশঙ্কা করছে সে। ব্যান্ডেজ বাঁধা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দু'পায়ে দাঁড়াল আলী সাহেব। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। চাবি লাগাল, বল্টু লাগাল, তারপর মোটা কাঠের হুড়কোটা জায়গা মত বসিয়ে দিয়ে কান পাতল দরজায়।

কয়েক জোড়া বুট জুতোর শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে অন্তত পাঁচ মিনিট লাগবে ওদের। ভাগ্য ভাল হলে আরও বেশি সময় লাগবে। তার আগেই ধ্বংস করে ফেলবে সে সব প্রমাণ। তার বন্ধু-বান্ধবরা জড়িয়ে পড়তে পারে এমন কোন কিছু ওদের হাতে পড়া চলবে না।

বেডরুমে ঢুকে সিঙ্গেল খাটের নিচ থেকে টেনে বড় একটা টিনের বাক্স বের করল আলী সাহেব। একজোড়া কম্বল বের করে রাখল মেঝেতে। তারপর এক গ্যালনের একটা পেট্রল-টিনের মুখ খুলে উপুড় করে সবটা পেট্রল ঢেলে দিল কম্বলের উপর। কলিং বেল বেজে উঠল। ড্রইংরুমে এসে আলমারির নিচের ড্রয়ারটা টেনে বের করে আনল আলী সাহেব দরকারী সব কাগজপত্র। নাম-ধাম-ফটোহীন পাসপোর্টগুলোয় চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কোনটা বাদ পড়ল কিনা। এবার ড্রয়ারের ভিতর থেকে বরকতউল্লার ছবি পাসপোর্ট এবং আরও দু'জন বন্ধুর ছবি বের করে আনল। ভারী কাঁধের ধাক্কায় দরজার চৌকাঠ কেঁপে উঠল। একবার দরজার দিকে চেয়ে নিয়ে পাসপোর্ট, ফটো এবং কয়েকটা এনভেলাপ নিয়ে ধীর পায়ে বেডরুমে ফিরে এল। কম্বলের উপর রাখল সব। দরজার একটা কপাট ফেটে গেছে, ভেঙে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। আর দেরি করা যায় না, ভাবল আলী সাহেব। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কম্বলের দিকে ছুঁড়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান আগুনের শিখা সিলিং পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। লম্বা একটা লাঠি দিয়ে আলী সাহেব জ্বলন্ত কাগজগুলো খোঁচাতে লাগল, ছাই ছড়াতে লাগল, যাতে বন্ধুরা বিপদে পড়তে পারে এমন কোন প্রমাণ বা চিহ্ন থেকে না যায়।

এইবার ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা ক্যাপসুল বের করল সে। এ ধরনের পরিস্থিতি একদিন আসবেই, জানত সে। তাই ক্যাপসুলটা সব সময় নিজের সাথে রেখেছে সে গত একটি বছর।

ধুলোমাখা প্রিয় আরাম কেদারায় আরাম করে বসল আলী সাহেব, মুখে পুরল ক্যাপসুলটা।

দরজাটা ভেঙে গেছে আধাআধি। ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে সিকান্দার বিল্লার ঘর্মাক্ত মুখটা দেখতে পাচ্ছে আলী সাহেব। ফাঁক গলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা

করছে। বিড়বিড় করে শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করে নিয়েই কামড় দিল আলী সাহেব ক্যাপসুলে।

বরকতউল্লাহ টের পেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে রানী। ওর পায়ের শব্দ চেনা হয়ে গেছে এই কদিনে।

গত একটা ঘণ্টা বড় দুশ্চিন্তায় কেটেছে ওর। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি। আলী সাহেবের হাতের ক্ষত সেরে যাবে, বুঝিয়েছে ও নিজেকে, দু'একদিনের মধ্যেই পাসপোর্টটা তৈরি হয়ে যাবে—কিন্তু মনের গভীরে পরিষ্কার উপলব্ধি করেছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বিপদের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকলেও রানীর সান্নিধ্য উপভোগ করছে সে। ধন্য মনে করছে নিজেকে ওর কাছাকাছি থাকবার সুযোগ পেয়ে। রানী তার সাথে তেহরানে যেতেও রাজি হয়েছে। এসব ব্যাপার স্বভাবজাত আতঙ্ক দমন করতে সাহায্য করেছে তাকে। লাহোর এয়ারপোর্টে একা পুলিস কন্ট্রোলের মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে যাবার কথা ভাবলে বুক কাঁপে তার। কিন্তু রানী সাথে থাকলে যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে সে। ওকে রক্ষা করার চিন্তায় নিজের কথা গৌণ হয়ে যাবে।

দরজা খুলে গেল। রানীর রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ। শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত উঠে এল উপরে।

দ্রুত ভিতরে ঢুকল রানী। দরজা বন্ধ করে দিল। দু'পা এগিয়ে গেল বরকতউল্লাহ।

'কি...' গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে, 'কি হয়েছে!'

ভ্যানিটি ব্যাগটা মেঝেতে ফেলে ঝপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানী।

'মারা গেছে। আমি গিয়ে দেখি লাশ নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেরে ফেলেছে...'

প্রাণহীন মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বরকতউল্লাহ কয়েক সেকেন্ড। তারপর ধপাস করে বসে পড়ল সামনের চেয়ারে। এ কী বলছে রানী! অসম্ভব! হতেই পারে না!

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে...' গলা দিয়ে ঝাপসা আওয়াজ বেরোল বরকতউল্লার।

'স্পেশাল পুলিস ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। অ্যাম্বুলেন্সও দেখলাম একটা। পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম স্ট্রেচারে শোয়ানো একটা লাশ তুলছে ওরা অ্যাম্বুলেন্সে। লাশ ঢাকা চাদরটা একটু সরে যেতেই দেখলাম—আলী সাহেব। মারা গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে শিউরে উঠল বরকতউল্লাহ। ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা, তিল তিল করে এতদিন ধরে তেহরানের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা, পালাবার পরিকল্পনা—সব শেষ। সব কিছুর সমাপ্তি হয়ে গেছে আলী সাহেবের মৃত্যুর সাথে সাথে! সব ভেস্তে গেছে। লাহোর ছেড়ে পালানো এখন এক কথায় অসম্ভব।

বরকতউল্লার অবস্থা বুঝতে পারল রানী। লোকটাকে ভেঙে পড়তে দেখে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল ও।

'টাকা রয়েছে আমাদের,' বলল সে। 'এখনও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

রানীর কথা কানে গেল বরকতউল্লার, কিন্তু ও জানে এসব অর্থহীন কথা। নিখুঁত একটা জাল পাসপোর্ট ছাড়া পালানো অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। নিজের কথা ছেড়ে রানীর কথা ভাবতে হবে তাকে এখন। রানীকে ছেড়ে চলে যাবে সে। নিরাপদে খুব বেশিদিন থাকতে পারবে না রানী, কিন্তু সে চলে গেলে বিপদের মাত্রা কমবে ওর। শোলডার হোলস্টারে রাখা অটোমেটিকটার কথা ভাবল ও। সবচেয়ে ভাল হয় এখান থেকে সোজা হেঁটে বেরিয়ে নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে নিজের কপালের পাশে ব্যারেল ঠেকিয়ে অটোমেটিকের ট্রিগার টেনে দেয়া। কথাটা ভাবতেই গাল দুটো কুঁচকে উঠল তার। কপালের পাশে ঠাণ্ডা ব্যারেলের স্পর্শ অনুভব করার পর ট্রিগারে চাপ দেয়ার মত সাহস থাকবে তার? পারবে সে?

'এই যে!' রানীর গলা তীক্ষ্ণ। 'শুনতে পাচ্ছেন আমি কি বলছি? হাতে আমাদের অনেক টাকা···পঁচাত্তর হাজার ডলার। এই টাকার জোরেই বিপদ কাটিয়ে উঠব আমরা। টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন জিনিস নেই। জাল পাসপোর্টও কেনা যাবে। অতটা ভেঙে পড়ার কোন কারণ দেখছি না আমি।'

মাথা তুলে তাকাল বরকতউল্লাহ। চোখ দুটো চকচক করছে।

'আলী সাহেব ছাড়া আর কাউকে চিনি না আমি। পাসপোর্ট জাল করে এমন নিশ্চয়ই আরও কেউ আছে লাহোরে, হয়তো প্রচুর টাকা দিলে রাজিও হয়ে যাবে। কিন্তু কে সে?'

উঠে দাঁড়াল রানী। পায়চারি শুরু করল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ওকেই এখন দায়িত্ব নিতে হবে বুঝতে পারছে সে। অনুভব করল, সাদামাঠা, দুর্বল লোকটাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একটা কোমল অনুভূতি জাগছে ওর মধ্যে। লোকটা ওকে বাঁচাতে চেয়েছিল, এখন লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে বাধ্য ও। হঠাৎ মনে পড়ল ওর শাকুর খানের কথা।

'একজনকে আমি চিনি···সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে!' কথাটা বলে চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানী। 'ভদ্রলোকের নাম আবদুস শাকুর খান। ডাক নাম সাগর। ওর মা বাঙালী ছিল, বাবা পাঠান। আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ওর বাবা! একই সাথে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিস। একই সাথে মারা গেছে দু'জন। শাকুর ফার্মিং করে। কোহাটের কুশলগড়ে কয়েক একর জমি নিয়ে সুন্দর ফার্ম করেছে। ওর চেনা জানা লোক থাকতে পারে যে আমাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ওকে টেলিগ্রাম করব আমি।'

আশার আলো ফুটে উঠল বরকতউল্লার চোখে।

'ঠিক জানো তো? লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়?'

'একশোবার। ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিল, ছেলেবেলায় একসাথে খেলাধুলা করেছি আমরা। খুবই সৎ লোক, কথার নড়চড় দেখিনি কোনদিন।'

অবাক চোখে রানীর দিকে চেয়ে রইল বরকতউল্লাহ কয়েক সেকেন্ড। অনুভব করল, রানীর আত্মবিশ্বাস ওর মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে ক্রমে।

ময়লা রুমাল বের করে ভেজা ভেজা মুখটা মুছল, তারপর মাথা নাড়ল বরকতউল্লাহ। 'না। তারচেয়ে আমি চলে যাচ্ছি, রানী। আমি থাকলে বিপদে পড়বে

তুমি। সেটা আমি ঘটতে দিতে চাই না। না…চলেই যাব। কোন একটা রাস্তা হয়তো পেয়ে যাব…'

'আহ্! চুপ করুন!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে ধমক দিল রানী। 'কোথায় যাবেন আপনি শুনি? মাথা ঠাণ্ডা করুন। যতক্ষণ এই ঘরে আছেন, বিপদের আশঙ্কা নেই।' হঠাৎ তার দিকে চেয়ে হাসল রানী। 'আপনি আমার উপকার করার চেষ্টা করেছিলেন, এখন আমার প্রতিদান দেবার সময়।' উঠে দাঁড়াল ও। 'যাই। নাস্তা রেডি করে ফেলা যাক।'

রানী কিচেনে গিয়ে ঢোকার পরও চেয়ারে বসে রইল বরকতউল্লাহ। তিক্ত চিত্তে ভাবল সে—খোদা! কী দুর্বল আর অসহায় আমি! এই পৃথিবীতে জোরের সাথে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কেন দিলে না আমাকে, মাবুদ!

খিদে ছিল না। জোর করে খেল বরকতউল্লাহ। তার অসহায় সদা শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে খারাপ লাগল রানীর। বরকতউল্লার কাঁধ ধরে একটু চাপ দিল ও। 'ভয়ের কি আছে? দুশ্চিন্তা কিসের?' বলল, 'পুরুষ মানুষের কি এত ভয় পেলে চলে?' উঠে দাঁড়াল ও। 'তৈরি হয়ে নিই আমি, নইলে পৌছতে দেরি হয়ে যাবে আবার।'

'হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাবে।' দু'চোখের কোণে কৃতজ্ঞতার পানি নিয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেল বরকতউল্লাহ।

রানার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের হোটেলে ফিরে গেল চন্দ্রগুপ্ত। তেহরানের একটা বিশেষ নাম্বারে ট্রাঙ্কল বুক করে নিজের কামরায় উঠে গেল এদিক ওদিক কোনদিকে না চেয়ে। কান মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে ওর। দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল সে। পুরু ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে মোটা মাথাটা ঘামাবার চেষ্টা করল মিনিট দশেক। সিগারেটটা ছোট হতে হতে ঠোঁটে গরম আঁচ লাগতেই তাড়াতাড়ি ওটা অ্যাশট্রেতে ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, এমনি সময় লাইন পাওয়া গেল তেহরানের। বেশ কিছুক্ষণ নানান রকমের কণ্ঠস্বরে হাঁকাহাঁকির পর আসমা শেরীর ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট।'

দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রগুপ্ত।

'দিস্ ইজ চন্দ্রগুপ্ত। স্পীকিং ফ্রম লাহোর। সেই ইনভয়েসগুলো সম্পর্কে আপনাদের টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি।'

'ইয়েস মি. চন্দ্রগুপ্ত। উইল ইউ হোল্ড এ মোমেন্ট, প্লীজ?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রগুপ্ত। ইমার্জেন্সির দরুন নিতান্ত বাধ্য হলেই শুধু ফোন করতে পারে সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিটে। বর্তমান পরিস্থিতিকে অবশ্যই ইমার্জেন্সি বলা চলে। চন্দ্রগুপ্ত বুঝতে পারছে, রানার সাথে তার চুক্তির কথা জানা দরকার জটিলেশ্বরের।

'ইয়েস, মি. চন্দ্রগুপ্ত?' জটিলেশ্বর রায়ের গলা চিনতে কষ্ট হলো না চন্দ্রগুপ্তের।

'নিখোঁজ ইনভয়েসগুলো, আমাদের থার্ড পার্টি পেয়েছে, স্যার। আমরা একটা চুক্তিতে পৌছুতে চেষ্টা করছি। ইটস্ ক্যাশ অন ডেলিভারি। ও. কে.?'

সামান্য একটু বিরতি, তারপর জটিলেশ্বর রায় বলল, 'তোমার হাতে যা আছে, সব?'

'সব। পুরোটা। রাজি হয়ে যাব?'

'উপায় কি?' তিক্ত শোনাল জটিলেশ্বরের কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে তো বলেই দিয়েছি··· যে কোন শর্তে···'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নিজের শক্ত চোয়ালে একটা ঘুসি মারল চন্দ্রগুপ্ত। হাসল। তারপর ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে গেছে সে, আর কোন চিন্তা নেই।

ঠিক সোয়া দশটায় হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল চন্দ্রগুপ্ত। দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশ খানিকটা দূরে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সে। এগোল হেঁটে।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় হাজির হলো সে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে। আশে পাশে কোথাও রানার ছায়া পর্যন্তও চোখে পড়ল না, কিন্তু সে পরিষ্কার জানে কাছে পিঠেই লুকিয়ে আছে শয়তান লোকটা, দেখছে তাকে। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

আজমল খানও উঠছিল তখন। ভেবে চিন্তে এই সময়টাই বেছে নিয়েছে সে সিকান্দার বিল্লার দেয়া মাইক্রোফোনটা রানীর ঘরে কোথাও গুঁজে দেয়ার জন্যে। নিচে চন্দ্রগুপ্তের পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল।

রেলিং-এর উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে নিচের দিকে চাইল আজমল খান। আবছাভাবে দেখতে পেল সে প্রকাণ্ডদেহী একজন লোককে, উঠে আসছে উপরে। জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ছুটল আজমল খান। উঠে গেল ছয় তলায়। চন্দ্রগুপ্তের ভারী পদশব্দ উঠে আসছে, শুনতে পাচ্ছে সে পরিষ্কার। বরকতউল্লাহও শুনল। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আলো নিভিয়ে দিল সে। ত্রস্তপায়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে ফ্রেঞ্চ উইনডোর কপাটটা বাইরে থেকে ভিড়িয়ে দিল সাবধানে। লতাপাতার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল পিস্তল হাতে।

রানীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল চন্দ্রগুপ্ত। আজমল খান ছয় তলার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে তাকে।

অ্যাপার্টমেন্টে কেউ নেই বুঝতে পেরে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল চন্দ্রগুপ্ত। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

বরকতউল্লাহ দেখছে। সরাসরি কাঠের পরীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্ত। আলগা মাথাটা নামিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল সে খয়েরী কাগজে মোড়া পার্সেল। পরীর মাথাটা যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েই পা বাড়াল দরজার দিকে। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ সেরে আলো অফ করে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সে অন্ধকার ল্যান্ডিং-এ। দরজায় চাবি লাগিয়ে ছোট একটা পেন্সিল টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল চন্দ্রগুপ্ত।

আজমল খান দেখছে তাকে। সে দেখল চন্দ্রগুপ্তের বাঁ হাতে এখন একটা প্যাকেট মত দেখা যাচ্ছে। ঢোকার সময় ওটা ওর হাতে ছিল না। জিনিসটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। পার্সেলের ভিতর কি আছে জানতে হবে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে জুতো জোড়া সিঁড়ির উপর নামিয়ে রেখে পিছু পিছু নিঃশব্দে নামতে শুরু

করল সে। চন্দ্রগুপ্ত দোতলার সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে যাচ্ছে। পেন্সিল টর্চের আলোয় তার সামনের ধাপগুলো আলোকিত।

দোতলার ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে দেয়াল হাতড়ে টাইম সুইচটা খুঁজে পেয়ে টিপে দিল আজমল খান। আলো জ্বলে উঠল সিঁড়িতে। চোখের পলকে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল চন্দ্রগুপ্ত। হাতের পেন্সিল টর্চ ফেলে দিয়ে ঝট্ করে বের করে ফেলল পিস্তল। চন্দ্রগুপ্তের ক্ষিপ্রতা দেখে মুহূর্তের জন্যে থ খেয়ে গেল আজমল খান। গুলি করল চন্দ্রগুপ্ত। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ বাড়িটা। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে রেলিঙের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আজমল খান। এক খাবলায় বাম কাঁধের খানিকটা মাংস নিয়ে দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে গুলিটা। কিন্তু সেই অবস্থাতেই গুলি করল সে পর পর তিনবার।

হাতুড়ির ঘা পড়ল যেন চন্দ্রগুপ্তের বুকে, পেটে আর ডান হাতে। কেঁপে কেঁপে উঠল ওর বিশাল দেহটা প্রতিটা গুলির আঘাতে। তারপর ধড়াস করে সিঁড়ির উপর আছড়ে পড়ে নেমে গেল গড়াতে গড়াতে। টাইম সুইচটা মাত্র এক মিনিটের জন্যে অন থাকে। তাও ঠিক মত সার্ভিস দিচ্ছে না সেটা কিছুদিন থেকে। বিশ সেকেন্ড পরেই অফ হয়ে গেল আলো।

দাঁতে দাঁত চেপে সোজা হয়ে দাঁড়াল আজমল খান। সুইচটার খোঁজে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল আবার। বাঁ হাতটায় আগুন জ্বলছে যেন দাউ দাউ করে। ঝুলে পড়েছে অবশ হয়ে। আঙুল বেয়ে রক্ত পড়ছে ঝর ঝর। সুইচটা খুঁজে পেল না সে। চন্দ্রগুপ্তের উঠে দাঁড়াবার শব্দ পেল সে। থেমে থেমে, পা ঘষে ঘষে নামছে চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত কতটা আহত হয়েছে ঠাহর করতে না পেরে শত্রু পালাচ্ছে ভেবে সিঁড়ি বেয়ে এলোপাতাড়ি পা ফেলে নামতে শুরু করল আজমল খান।

পায়ের শব্দ পেল চন্দ্রগুপ্ত। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার গুলি করল সে। অন্ধকারে আজমল খানের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা বাতাসে শিস কেটে। বসে পড়ল আজমল খান। চন্দ্রগুপ্তের পা ঘষে ঘষে এগিয়ে যাবার শব্দ পেল সে আবার। প্রকাণ্ড দেহটা বহুকষ্টে ছেঁচড়ে টেনে এগোচ্ছে লোকটা, বোঝা গেল।

ফুসফুসে গুলি খেয়েছে চন্দ্রগুপ্ত। জীবনের ইতি এখানেই, বুঝতে পেরেছে সে। শ্বাস টানতে পারছে না। রক্ত উঠছে নিঃশ্বাসের সাথে। শুধু মনের জোর ওকে টেনে নিয়ে চলেছে সামনে। বাম হাতে আঁকড়ে ধরে আছে খয়েরী প্যাকেটটা। লবিতে নেমে কুলকুচি করে গরম রক্ত ফেলল মেঝেতে, তারপর পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেল স্বল্পালোকিত রাস্তায়। এদিক ওদিক চাইল রানার খোঁজে। টাকাগুলো যদি কোনমতে রানার হাতে পৌঁছে দেয়া যায়, তাহলে কথা রাখবে না লোকটা? ওর মৃত্যুর পর টি.এসটা তেহরানে দেবে না পৌঁছে?

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে লবিতে নেমে এল আজমল খান। রাস্তার মৃদু আলোয় চন্দ্রগুপ্তের বিশাল কাঠামোটা দেখেই পিস্তল তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল।

বাঁকা হয়ে গেল চন্দ্রগুপ্ত পিছন দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় স্থির হয়ে রইল ওইভাবে কয়েক সেকেন্ড। তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল কাৎ হয়ে। প্যাকেটটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশের ড্রেনে।

গুলির শব্দ শুনে উল্টোদিকের বাড়ির পাঁচ তলা থেকে দৌড়ে নেমে এসেছে

সুলতান বেগ। হাতে পিস্তল।

কাছেই একটা বাড়ির দরজার আড়াল থেকে দেখছে রানা। ও দেখল পড়ে গেল চন্দ্রগুপ্ত। হাত থেকে পার্সেলটা খসে চলে গেল নর্দমায়। হোলস্টার থেকে ওর প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে. বের করল রানা। ঠিক সেই সময় শুনতে পেল সাইরেন। দ্রুত এগিয়ে আসছে পুলিসের গাড়ি। পার্সেলটা উদ্ধার করা যাবে না—বুঝে নিল রানা নিমেষে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছুটল সে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দ পায়ে চলে এল একটা গলিমুখে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে থামছে পুলিসের গাড়ি। আরও একটা গাড়ি আসছে, বোঝা গেল সাইরেন শুনে। গলিপথে পা চালাল সে।

মাথার মধ্যে চলছে দ্রুত চিন্তা। সব গোলমাল হয়ে গেছে। পঁচাত্তর হাজার ডলার এখন ড্রেনে। ওগুলো উদ্ধার করবার কোন আশাই যখন নেই তখন সময় থাকতে কেটে পড়াই ভাল। লাহোরে থাকার আর কোন মানেই হয় না। ক্রমে গরম হয়ে উঠছে এখানকার আবহাওয়া।

হঠাৎ মনে পড়ল টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটার কথা। চন্দ্রগুপ্ত নেই যে ওটা জটিলেশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ওর নিজের কোন গরজ নেই এ ব্যাপারে। চুলোয় যাক ডকুমেন্ট—এখন প্রাণ বাঁচানো ফরজ।

কিন্তু কথাটা মনের মধ্যে উঠতেই মন্থর হয়ে গেছে রানার চলার গতি। আমার কি?—ভাবল সে। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল—জাহান্নামে যাক জটিলেশ্বর। যে লোক ওর সাথে এতবড় শত্রুতা করতে পেরেছে সে যদি খতম হয়ে যায় তাতে ওর মাথাব্যথার কিছুই নেই।

যতই বোঝাক না কেন, মন ব্যাটা বুঝল না। নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। একটা ল্যাম্প পোস্টে কাঁধ ঠেকিয়ে ভাবল, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সে পাকিস্তান বা চীনের হাতে পড়তে দিতে পারে না। সাথে সাথেই সমাধান এসে গেল: ওটা ছিঁড়ে ফেললেই চুকে যায়। কিন্তু, না, এই সমাধানেও সন্তুষ্ট হলো না মন। তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না জটিলেশ্বরের। মন খতিয়ে দেখল রানা জটিলেশ্বরের সর্বনাশ সে চায় না, ইতিমধ্যেই ক্ষমা করে বসে আছে।

অর্থাৎ, বুঝতে পারল রানা, ওটা জটিলেশ্বরের হাতে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করল সে। পুলিসকে আন্ডার-এস্টিমেট করলে চলবে না। সার্চ হবেই। বিনা সার্চে এখন এদেশ থেকে বেরোতে পারবে এমন আশা করা বাতুলতা। বের করে ফেলবে ওরা ডকুমেন্টটা। দিলারা দুররানীর কথা মনে পড়ে গেল। জটিলেশ্বর রায়ের এজেন্ট মেয়েটা। ডকুমেন্টটা ওর কাছে পৌঁছে দেয়া নিশ্চয়ই ওই মেয়েটারই দায়িত্ব এখন। ওকে গছিয়ে দিলেই চুকে যায়।

রানীর সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। বেশ খানিকটা হালকা হয়ে গেল ওর মন। দ্রুত পায়ে এগোল বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তায় উঠে কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। মার্বেল নাইট ক্লাবের সামনে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। ভিতরে ঢুকে দেখল জমজমাট

বাজনার সাথে নাচ হচ্ছে ফ্লোরে। আবছা অন্ধকারে কোথাও একটা খালি টেবিল চোখে পড়ল না ওর। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একজন ওয়েটার।

'সরি, স্যার। খালি টেবিল নেই।'

দশ টাকার একটা নোট বের করল রানা। 'কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দাও। প্রাইভেসি দরকার।'

নোটটা হাত বদল হলো। কেতা দুরস্ত সালাম ঠুকল ওয়েটার।

'সাড়ে এগারোটা থেকে একটা কেবিন রিজার্ভ করা আছে, স্যার। এখন খালি। আধ ঘণ্টার জন্যে ওটা ব্যবহার করতে পারেন।'

'চমৎকার!' ওয়েটারকে অনুসরণ করে সরু একটা করিডর ধরে ছোট একটা কেবিনের ভিতর ঢুকল রানা। চার জনের বসার উপযুক্ত চেয়ার এবং টেবিলসহ কেবিনটার বিশেষত্ব হচ্ছে, সরাসরি স্টেজের সবটুকু দেখা যায় এখান থেকে।

'এতে চলবে, স্যার?'

'হ্যাঁ...দাঁড়াও।' স্টেজ থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড শব্দে বিরক্ত হয়ে মুখ বাঁকা করল রানা। চেয়ারে বসে মানিব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার উল্টো পিঠে ইংরেজীতে লিখল: একটু আসতে পারেন? আপনার কাঠের পরীটা কেনার ব্যাপারে আমি আগ্রহী। কার্ডটা ওয়েটারের হাতে দিয়ে বলল, 'দিলারা দুররানীর হাতে দেবে এটা। ফিরে এসে আরও দশটা টাকা নিয়ে যেয়ো।'

'ইয়েস, স্যার। ডিনার পাঠিয়ে দেব, স্যার?'

'না... মিস দিলারাকে পাঠিয়ে দাও। জলদি।'

ওয়েটার চলে যেতে আবছা অন্ধকারে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল রানা, নাচ দেখায় মন দিল। নাচছে বেঢপ ফিগারের তিনটে ধিঙ্গি মেয়ে। বেশিক্ষণ কষ্ট সহ্য করতে হলো না। তিন মিনিট পরই এদের অনুষ্ঠান শেষ হলো। আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা। বোঝা যাচ্ছে এটা বিরতি। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল রানা। দিলারার প্রোগ্রাম কখন? কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে? এভাবে বসে থাকা উচিত হচ্ছে?

দশ মিনিট পর ধীরে ধীরে খুলে গেল কেবিনের দরজা। ভিতরে ঢুকল দিলারা দুররানী। ওর পরনে এখনও সেই নীল শাড়ি। মেকাপ রূমে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ওয়েটার চিরকুটটা নিয়ে গিয়ে দিয়েছে ওকে। ভয় পেয়েছে ও। আড়ষ্ট দেখাচ্ছে মুখটা। চোখে সতর্ক, সন্দিহান চাউনি। রানাকে দেখেই পিছিয়ে গেল এক পা, দৌড়ে পালাবার জন্যে ঘুরতে গিয়েও থামল, চেয়ে রইল ওর দিকে। বিস্ফারিত চোখ।

'ভেতরে আসুন,' উঠে দাঁড়াল রানা। হলরূম থেকে লোকজনের শোরগোল ভেসে আসছে বলে উঁচু করতে হলো ওকে গলা। 'চিনতে পেরেছেন দেখতে পাচ্ছি। ভয় নেই। আমার দ্বারা কোন সুন্দরী মহিলার ক্ষতি হয়নি কোনদিন।'

এক চুল নড়ল না দিলারা দুররানী। চেয়ে আছে রানার চোখের দিকে। আতঙ্কে পাথর।

'কি—কি চান আপনি?'

'বসুন, কথা আছে। শান্ত হয়ে বসুন দু'মিনিট। একটা ফান্টা আনতে বলব?'

'না··· কি চান আপনি? কি কাজ···'

'কাজটা আমার নয়। আপনার। ওভাবে দরজার সামনে হানড্রেড মিটার স্প্রিন্টের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে বলা যাবে না। সত্যি বলছি, অযথা ভয় পাচ্ছেন। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভেতরে এসে বসুন।'

উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে রানীর শরীর। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল চেয়ারে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

'এবার ভাল করে লক্ষ করুন···' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'দেখুন তো আপনার কাছে এর কোন অর্থ আছে কিনা?' টাইয়ের নট ঠিক করল রানা, বাম পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঘাড়ের পিছনটা মুছল, তারপর টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়ল কোটের কলার থেকে। জটিলেশ্বরের অপারেটাররা নিজ দলের অপরিচিত এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হলে এই সিগন্যাল ব্যবহার করে, জানে রানা।

কম্বিনেশন সিগন্যাল চিনতে পারল রানী। বুঝতে পারল সুদর্শন এই বাঙালী যুবকটি ভারতীয় স্পাই, এবং এসেছে জটিলেশ্বর রায়ের কাছ থেকে। কিন্তু তাতে ভয়ের মাত্রা বাড়ল বই কমল না তার।

মাথা কাত করল ও।

'ফাইন।' রানা বলল, 'এবার মন দিয়ে শুনুন। আমার নাম মাসুদ রানা। আমি জটিল রায়ের লোক নই, ভারতীয়ও নই—আমি বাংলাদেশের লোক, খামোকা জড়িয়ে গিয়েছি আপনাদের সাথে। চন্দ্রগুপ্ত মারা যাওয়ায় ওর কাজটা করতে হবে আপনাকে। ভূমিকাটা জেনে নিন, বুঝতে সুবিধে হবে।' রানা শুরু করতে যাচ্ছিল কেমন ভাবে জটিলেশ্বর রায় ওকে স্মোক স্ক্রিন হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু রানী বাধা দিল।

'থামুন, ওসব কথা শুনতে চাই না আমি! ওই লোকের কাজ আমি আর করছি না। আমাকে এসব বলে কোন লাভ নেই।'

তীক্ষ্ণ চোখে দেখল রানা রানীকে। চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা কঠোর। 'কি আবোল-তাবোল বকছেন? আপনি জটিল রায়ের এজেন্ট নন?'

'আমি আর তার কাজ করব না,' মরিয়া হয়ে বলে উঠল রানী। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'কাজেই আপনার কোন কথা শোনার আমার প্রয়োজন নেই!'

'প্রয়োজন আছে!' বলল রানা। 'আমি যে কাজ দেব সেটা করতেই হবে আপনাকে। বসুন।'

ধমক খেয়ে খানিক ইতস্তত করল রানী। রানার চোখের দিকে চেয়ে বাধ্য হলো আদেশ পালন করতে। বসে পড়ল।

'এসব ছেলেখেলা নয়।' ধমকের সুরে বলল রানা। 'থুক্কু দিলেই ভুল শুধরানো যায় না। ইচ্ছে হলে খেললাম, ইচ্ছে না হলে বান্ধবীর সাথে আড়ি দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম—সেসব খেলার বয়স পার হয়ে গেছে আপনার। জেনে রাখুন, যে খেলায় নেমেছেন সেখান থেকে ফিরবার পথ নেই।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নরম কণ্ঠে শুরু করল রানা আবার। 'শুনুন···'

সুনীল নাগকে লাহোরে পাঠানোর ব্যাপারে জটিলেশ্বর রায়ের পরিকল্পনা, কিভাবে জটিলেশ্বর রায় ওকে স্মোক স্ক্রীন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং

পঁচাত্তর হাজার ডলার সহ ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে সবই বলল সে রানীকে। চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা এবং কিভাবে সে গুলি খেয়ে মরেছে সে কথাও বলল। 'তার মানে টাকাগুলো গেছে,' উপসংহারে জানাল রানা। 'আমরা এখন ফেঁসে গেছি এই টপ্ সিক্রেট ডকুমেন্ট নিয়ে, এটা যেমন করেই হোক জটিলেশ্বর রায়কে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি ওটা বের করে নিয়ে যেতে পারব না। থরো সার্চ হবে এয়ারপোর্টে। কাজেই আপনাকে এর ব্যবস্থা করতে হবে। যে চ্যানেলে...' রানীকে প্রবলভাবে মাথা নাড়তে দেখে থামল রানা।

'চন্দ্রগুপ্ত পায়নি টাকা। আমরা পেয়েছি। পরীর পায়ের নিচে লুকানো আছে।'

'আমরা? আমরা কে?'

ইতস্তত করল রানী। সুদর্শন লোকটার মধ্যে নিমেষে আস্থা অর্জন করবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা আছে। রানী অনুভব করল অনায়াসে বিশ্বাস করা যায় একে। বরকতউল্লার মত নয়। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সূর্য কিরণের মত ঠিকরে বেরোচ্ছে এর চোখমুখ থেকে। পরিষ্কার বুঝতে পারল একে সব বললে বিপদের সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। দ্বিধা দূর করে বরকতউল্লার আগমন থেকে শুরু করে সব ঘটনা বলে ফেলল রানী।

সব শুনে থ হয়ে গেল রানা।

দরজায় টোকা পড়ল। চমকে উঠল দু'জনেই। খুলে গেল দরজা। বিদঘুটে চশমা চোখে, হাতে সুটকেস—কেবিনের ভিতর ঢুকল বরকতউল্লাহ।

নয়

খয়েরী কাগজ মোড়া প্যাকেটটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। ভাঁজ করা খবরের কাগজের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ভাঁজ খুলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল কোথাও কোন চিহ্ন আছে কিনা। তারপর ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বাঘের চোখে চাইল বাম কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা আজমল খানের দিকে। রাগে কাঁপছে সে।

'এর জন্যে লোকটাকে খুন করেছ তুমি?'

একমাত্র সিকান্দার বিল্লাহ বুঝতে পারল কি পরিমাণ খেপে গেছে তারিক আখতার। এখন কথা বলতে গেলে ফেটে পড়বে বোমার মত।

আজমল খানের পাশ থেকে দিল মোহাম্মদ বলল, 'এছাড়া আর কি করতে পারত, স্যার...'

'থামো তুমি! তোমার সাথে কথা বলছি না আমি।' তারিক আখতারের সবুজ চোখ আজমল খানের দিকে নিবদ্ধ। 'পুরানো দুটো খবরের কাগজের জন্যে খুন করেছ তুমি ওকে?'

'গুলি করেছিল, স্যার,' চোখ নিচু করে নরম গলায় বলল আজমল খান। 'আর কোন উপায় ছিল না আমার।'

'এটা এখন একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা হয়ে গেল,' তারিক আখতার বলল। 'ঠেলাটা কে সামলাবে শুনি? এ লোক জটিলেশ্বর রায়ের এজেন্ট। ভারতীয়

অ্যামব্যাসাডার অনুসন্ধান চালাবে। সব দেশের খবরের কাগজে এ সম্পর্কে হেডিং হবে। শুধু তাই নয়, কমপক্ষে তিনজন পাকিস্তানী এজেন্টকে খুন করে শোধ তুলবে ওরা। তোমার বোকামির জন্যে যে কন্টিং অপারেশনের পরিকল্পনা করেছিলাম, সব ভেস্তে গেল। গুলি করবে না? গুলি তো করবেই! সিঁড়ির আলো জ্বালাতে গিয়েছিলে কেন গাধার মত?'

কাজটা করে অসংখ্য বাহবা আর পিঠ-চাপড় আশা করেছিল আজমল খান—ধমকের মুখে গুলিয়ে গেল সবকিছু। ঘামে ভিজে গেছে ওর পাথরে খোদাই করা নিষ্ঠুর মুখ।

'আমি···আমি ভেবেছিলাম···' কথা খুঁজছিল সে, কিন্তু থেমে গেল ধমক খেয়ে।

'ভেবেছিলে। ঘিলু ছাড়া ভাবলে কি করে? যাও, বেরিয়ে যাও!'

তারিক আখতারের চেহারা নির্বিকার, কিন্তু সবুজ চোখ দুটোয় বিষাক্ত তীরের মত দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল আজমল খান। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিকান্দার বিল্লার দিকে তাকাল তারিক আখতার। 'লোকটার শাস্তি হওয়া দরকার। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

একটু বিরতি। তারপর দিল মোহাম্মদের দিকে ফিরে তারিক আখতার জানতে চাইল, 'রানা কোথায়?'

'রানা? মাসুদ রানা? আমি···আমি জানি না, স্যার। তার পিছনে লোক লাগানো আছে। এ ব্যাপারের সাথে কি সম্পর্ক···'

'খোঁজ নাও কোথায় সে। জানতে চাই আমি।'

দিল মোহাম্মদ ডেস্কের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিতে যাচ্ছিল, বারণ করল তারিক আখতার। 'অন্য কোথাও যাও। এই টেলিফোন আমার দরকার।'

'ইয়েস, স্যার।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দিল মোহাম্মদ মনে মনে তারিক আখতারের গুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে।

হাত দুটো মুঠো পাকাল তারিক আখতার। সিকান্দার বিল্লাহ বুঝতে পারল ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে রয়েছে ব্রিগেডিয়ার, কথা না বলাই এখন নিরাপদ। আধ মিনিট চুপচাপ চিন্তা করবার পর বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল তারিক আখতার, 'কী একটা অপারেশন! তোমার চোখের সামনে আত্মহত্যা করল মোহাম্মদ আলী—ঠেকাতে পারলে না। ওই গাধাটা জটিলেশ্বরের প্রিয় লোকটাকে খুন করে বসল। জানো, এর ফলে দিলারা মেয়েলোকটা সাবধান হয়ে যাবে? এবং এরপর রানাও···আমার কথা মত কি একটা কাজও হবে না!'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে,' বলল সিকান্দার বিল্লাহ। 'এখন আমাদের কর্তব্যটা কি, বস্?'

কয়েক সেকেন্ড অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ব্রিগেডিয়ার সিকান্দার বিল্লার মুখের দিকে। মনে মনে গুছিয়ে নিল প্ল্যান প্রোগ্রাম।

'[illegible] আর দিলারা দুররানীকে ধরে ফেলতে হবে এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ওদেরকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। এখন থেকে গোটা ব্যাপারটা আমি নিজেই দেখব। এসব গর্দভদের ওপর আর নির্ভর করা যাবে না। এখন দরকার অ্যাকশন।' সিকান্দার বিল্লার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল ব্রিগেডিয়ার। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলল, 'অ্যাকশন শুরু করবার আগে দিল মোহাম্মদের রিপোর্টটা জানা দরকার। মেয়েটাকে পিকাপ করা যাবে নাইট ক্লাব থেকেই, কিন্তু রানার খবর জানি না আমরা এখনও। লোকটা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত।'

'চিন্তা করবেন না, স্যার। ধরা ওকে পড়তেই হবে। একবার টর্চার চেম্বারে ঢোকাতে পারলে দেখা যাবে কে কত ধূর্ত।'

নিঃশব্দে হাসল তারিক আখতার।

'কিন্তু পার্সেলের ভেতর নিউজ পেপার কেন? দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্টে চোরের মত লুকিয়ে ঢুকেছিল কেন চন্দ্রগুপ্ত? ধরা যাক, মূল্যবান কিছু খুঁজছিল লোকটা, কিন্তু সেটা সরিয়ে বাজে কাগজ ভরে দিয়েছিল মেয়েলোকটা এই প্যাকেটে।' মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে তাকাল সে। 'অবশ্য ওগুলোর মধ্যে কোন গুপ্ত মেসেজ থাকতেও পারে। পরীক্ষা করা দরকার।'

ঘরে ঢুকল দিল মোহাম্মদ। চোখ বসে গেছে। সাদা চুনের মত মুখ। কপাল ঘামে ভেজা।

'ওরা তাকে হারিয়ে ফেলেছে, স্যার!' বলল সে ভাঙা গলায়। 'তিনজন লোক লাগিয়েছিলাম এক মাসুদ রানাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে…ওদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে…'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তারিক আখতারের শরীরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে চেয়ার ছেড়ে। ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল দিল মোহাম্মদ। 'এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তোমার, দিল মোহাম্মদ। তোমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম—এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপালে পার পাবে না তুমি, তোমাকেই দায়ী হতে হবে। জেনে রাখো কথাটা। রানাকে আমি চাই! যেখান থেকে পারো, ধরে আনো ওকে!' সিকান্দার বিল্লার দিকে চাইল সে। 'মেয়েটাকে তুলে আনব এখন আমরা। ওর কাছে জানা যাবে কোথায় লুকিয়ে আছে বরকতউল্লাহ। তাকেও আমি চাই।' তাকাল দিল মোহাম্মদের দিকে। 'মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করো!' ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল সিকান্দার বিল্লা।

কপালের ঘাম মুছল দিল মোহাম্মদ। তারপর রিসিভার তুলে নিল। এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন আর সমস্ত বাস স্টেশনে নির্দেশ দিতে শুরু করল সে, প্রত্যেকটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানীকে নির্দেশ দিল, প্রত্যেক সীমান্ত পো'কে সতর্ক করে দেয়ার ব্যবস্থা করল।

'যেমন করে হোক আটকাতে হবে এই লোককে,' বলে চলল সে। 'কিছুতেই যেন ফস্কে বেরিয়ে না যেতে পারে।'

নিজের কাহিনী শোনাচ্ছে বরকতউল্লাহ। রানা এবং রানীর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছে সে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভয়ে। গুলির শব্দ শুনেই বুঝে নিয়েছে সে পুলিস আসবে এবং এসেই সার্চ করবে পুরো বাড়িটা—তাই প্রথম

সুযোগেই সন্তর্পণে বেরিয়ে এসেছে সে।

'তোমার কিছু কিছু জিনিস সুটকেসে ভরে নিয়ে এসেছি আমি।' রানীর দিকে চেয়ে বলল সে। 'ওখানে ফিরে যাওয়া যাবে না। ওরা এখন তোমাকে খুঁজবে। এখানেও আসতে পারে।'

পাতলা-সাতলা, লম্বা, দুর্বল, আত্মকেন্দ্রিক, ভীরু লোকটাকে প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করল রানা। পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি করবে এই লোক। নিজের স্বার্থ ছাড়া বুঝতে চাইবে না আর কিছু।

'টাকাগুলো কোথায়?' বরকতউল্লার চোখের উপর চোখ রাখল রানা।

চমকে উঠল বরকতউল্লাহ। দ্রুত তাকাল রানীর দিকে।

'ওকে বলেছি আমি,' রানী বলল।

মনে মনে প্রমাদ গুনল বরকতউল্লাহ। টাকার গুরুত্ব তার কাছে অসীম। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোককে রানী কি করে বলল যে ওদের কাছে এত টাকা আছে?

'আমি বুঝতে পারছি না···আমি···'

'ব্যাখ্যায় পরে আসব আমরা,' তাগাদার সুরে বলল রানা। 'টাকাগুলো কোথায়?'

খানিক ইতস্তত করে রানীর দিকে তাকাল বরকতউল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশায়।

'টাকার কথা জানেন উনি,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানী।

আরও কয়েক সেকেন্ড উশখুশ করে বিমর্ষ কণ্ঠে বলল বরকতউল্লাহ, 'আমার সুটকেসে।'

লম্বা করে দম নিল রানা।

'ভেরি গুড, টাকাগুলো কাজে লাগবে। এবার চলুন, কেটে পড়া যাক।' সোজা বরকতউল্লার দিকে চাইল রানা। 'রাস্তাঘাট ভাল মত চেনা আছে তো? কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা আছে?'

মাথা নাড়ল বরকতউল্লাহ।

রানীর দিকে চাইল রানা।

রানী ইতস্তত করছে। 'যদি গাড়ি থাকত···আমার পরিচিত একজনের ওখানে যাওয়া যেত। শাকুর খান। কিন্তু সে তো অনেক দূর। কোহাট। কুশলগড়ে একটা খামার আছে ওর।'

'গাড়ির জন্যে চিন্তা নেই। গাড়ি জোগাড় হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি যখন ওর ওপর আস্থা রাখছেন, চলুন, কোহাটেই যাওয়া যাক। উঠে পড়ুন··· পিছন দিক দিয়ে বেরুবার রাস্তা আছে?' উঠে দাঁড়াল রানা।

'হ্যাঁ।' রানী দ্বিধাগ্রস্ত। অবাক হয়ে চাইল রানার চোখে। ব্যস, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লোকটা?

'জলদি করুন।' তাড়া দিল রানা। 'হাতে সময় নেই।'

'কিন্তু কাউকে কিছু না বলে, এমনি করে হঠাৎ···এভাবে তো চলে যেতে পারি না আমি···।'

রানীর একটা বাহু ধরল রানা। টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। হাসল চোখের উপর

চোখ রেখে।

'চলুন!'

কেন জানি শিরশির করে উঠল রানীর বুকের ভিতরটা। অচেনা এই দুঃসাহসী লোকটার স্পর্শে, না কি অজানা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে বলে, ঠিক বুঝতে পারল না—অদ্ভুত এক শিহরণে রোমাঞ্চিত হলো ওর সর্বশরীর।

অসহায় ভাবে একবার রানা, আর একবার রানীর দিকে তাকাল বরকতউল্লাহ। তারপর বলল, 'উনি ঠিকই বলছেন, রানী। যে কোন মুহূর্তে তোমার খোঁজে এখানে এসে হাজির হতে পারে স্পেশাল পুলিস।'

'আর কোন কথা নয়,' রানা বলল। রানীর হাত ধরে টেনে বের করে আনল প্যাসেজে। 'এগোন। অনর্থক দেরি করবেন না। কোন দিকে যাব আমরা?'

রানার কণ্ঠস্বরে জলদি করবার তাগাদা অনুভব করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াল রানী। গজ দশেক এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে থামল ও। দরজাটা খোলাই ছিল। অন্ধকার একটা আঙিনায় এসে দাঁড়াল তিনজন। আর কয়েক পা এগিয়েই পাওয়া গেল কার পার্ক। এদিকটা আলোকিত। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানান জাতের গাড়ি। কয়েকটার নাম্বার প্লেটে বিদঘুটে লেখা দেখে বোঝা গেল ট্যুরি'দের।

গাড়িগুলো চোখে পড়তেই দাঁড়াল রানা। 'এখানে দাঁড়ান আপনারা। আমি আসছি এখুনি।' দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সে সামনে।

একে একে চারটে গাড়ি পরীক্ষা করল রানা, পঞ্চমটার ইগনিশন লকে চাবি পাওয়া গেল। মার্সিডিজ বেঞ্জ। সন্তুষ্ট চিত্তে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। পার্কিং লাইট জ্বেলে দিয়ে হাত নাড়ল রানী ও বরকতউল্লার উদ্দেশে।

ছুটতে শুরু করল ওরা। সুটকেস হাতে আগে এসে হাজির হলো বরকতউল্লাহ। উঠে পড়ল ব্যাক সীটে। রানী উঠল রানার পাশের সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

মেইন রোডে উঠে অল্প কিছু দূর গিয়েই রিয়ার ভিউ মিররে দেখল রানা পুলিসের দুটো জিপ ঢুকছে মার্ভেল নাইট ক্লাবের গেট দিয়ে।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!' কথাটা বলে রানীর দিকে ফিরে হাসল রানা। বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল পিছন দিকে।

পিছনে চেয়েই জিভ শুকিয়ে গেল রানীর।

'আর দু'মিনিট দেরি করলেই…' কি ঘটত কল্পনা করে শিউরে উঠল রানী।

দশ মিনিটে লাহোর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। সোজা রাওয়ালপিন্ডির দিকে না গিয়ে সারগোদার পথ ধরল রানা। সোজা হয়ে বসে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। ক্রমেই বাড়ছে স্পীড। চন্দ্রালোকিত নির্জন রাস্তা। আধ ঘণ্টা চুপচাপ। হঠাৎ কথা বলে উঠল বরকতউল্লাহ।

'এদিকে কোথায় চলেছেন? ওয়াগা বা কাসুর হয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেলে ভাল হত না?'

'ওদের জন্যে ভাল হত,' বলল রানা। 'খুব সুবিধে হত আমাদের ধরে ফেলতে। বর্ডার-চেকপোস্টগুলো এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে আমাদের রিসিভ করবার জন্যে।'

সারগোদার কাছাকাছি এসে আবার নীরবতা ভঙ্গ করল বরকতউল্লাহ।

'আশা খুব কম। গাড়িটার খোঁজ পড়বে। আমরা…'

'শান্ত হোন,' রানা বলল। 'গাড়ির খোঁজ পড়তে দেরি আছে এখনও। অনুষ্ঠান শেষ হবে, তারপর গাড়ির মালিক টের পাবে যে গাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না, তারপর সে পুলিসে খবর দেবে। ব্যাপারটা কি ঘটেছে পুলিসকে সেটা বোঝাতেই তো হিমশিম খেয়ে যাবে বিদেশী লোকটা। অন্তত একটা ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে। ততক্ষণে আমরা টালাগাঙ ছাড়িয়ে যাব। বাকি পথটুকুও নিরাপদেই চলে যেতে পারব, কারণ কেউ জানে না আমরা কোন্ দিকে চলেছি।' রানীর দিকে ফিরল রানা। 'শাকুর খান সম্পর্কে শোনা যাক।'

শাকুর খান সম্পর্কে বলতে শুরু করল রানী। দুই পরিবারের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতার কথা বলল, দু'জনের বাবার বন্ধুত্ব এবং পরিণতির কথা বলল। শেষে বলল, 'কোহাটের কুশলগড়ে সিন্ধু নদের তীরে ওর ফার্ম। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে, আমার বিশ্বাস, সাহায্য পাবই।'

'সেটাই আসল কথা,' বলল রানা। 'সাহায্য আমাদের দরকার পড়বে।' পাহাড়ী এলাকার উপর দিয়ে রাস্তা। গাড়ি উঠছে উপর দিকে। 'জটিলেশ্বর রায়ের ওপর বিরক্তি ধরে গেছে, কেমন?' বরকতউল্লাহকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'দোষ আপনার নয়। ভদ্রলোক সত্যিই বিরক্তিকর।'

রানার গলায় সহানুভূতির রেশ লক্ষ করে সামনের দিকে ঝুঁকে এল বরকতউল্লাহ।

'বেশ ছিলাম। কিন্তু তারিক আখতার এসে হাজির হবার পর থেকেই সব গোলমেলে কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। আমি বুঝলাম…'

'তারিক আখতার!' এক পর্দা চড়ে গেল রানার কণ্ঠস্বর। 'কি বললেন? তারিক আখতার? ব্রিগেডিয়ার?'

'হ্যাঁ।'

'ও লাহোরে?'

'হ্যাঁ। আমাকে খুঁজছে…'

'সেরেছে! এই সর্বনেশে কথাটা এতক্ষণে শোনাচ্ছেন।' রানাকে লক্ষ করে ভয় পেল রানী। রানাকে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মৃদু হেসে বলল, 'তারিক আখতারের সাথে আমার রীতিমত ভালবাসা আছে। সাপ যেমন নেউলকে ভালবাসে, তেমনি। আপনি ঠিক জানেন ও লাহোরে?'

'খুব ভাল করে জানি।'

গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। চিন্তা করছে সে। ওরা তিনজন কতখানি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। তারিক আখতারকে চেনে ও। তারিক আখতার যেখানে, সিকান্দার বিল্লাহও সেখানে। সিকান্দার বিল্লাহ পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিকারী। মানুষই তার একমাত্র শিকার। নেশা। যদি একবার টের পায় যে ও এখন পাকিস্তানে, তাহলে ক্ষুধার্ত শার্দুল হয়ে যাবে ওরা দু'জন। চেষ্টার ত্রুটি করবে না কোনদিক থেকেই।

রানাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে না দেখে রানী এবং বরকতউল্লাহ দু'জনেই ভয়

পেল। সারগোদায় ট্যাঙ্ক ভর্তি করে পেট্রল নিল রানা। কোহাট পৌঁছে যাবে এই পেট্রলে, কিন্তু সুযোগ পেলে আবার ভরে নিতে হবে ট্যাঙ্ক আগেই কোথাও।

'শাকুর খান সম্পর্কে আরও কিছু শোনা যাক,' অবশেষে কথা বলল রানা। 'ওর সাথে আপনার পরিচয়ের কথা লাহোরের ক'জন জানে? কবে শেষ দেখা হয়েছে আপনাদের, কোথায়? সাক্ষী আছে? আমি তারিককে চিনি। আপনার পরিচিত সবাইকে খুঁজে বের করবে ও। শাকুরকে আপনি চেনেন একথা জানা মাত্র কুশলগড়ে খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করবে।'

'এক বছরেরও বেশি হলো দেখা হয়নি শাকুরের সাথে আমার,' বলল রানী। 'বন্ধু-বান্ধব কাউকে ওর কথা বলেছি বলে মনে পড়ছে না। নাহ, বলিনি। ও সাহায্য করবে, আমি জানি। আমার বাবা ওর বাবার অনেক উপকার করেছিলেন একসময়।'

'শাকুর খানের ফার্মে গেছেন কখনও?'

'মাত্র একবার। বছর দু'য়েক আগে।'

'জায়গাটা কি রকম?'

'পাহাড়ী এলাকা। পশ্চিমে পাহাড় আর পাহাড়। নির্জন···একেবারে নির্জন।'

'কে কে থাকে তার সাথে।'

'কানিজা, মানে শাকুরের স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। পাঠান এক মেয়েকে বিয়ে করেছে ও বছর খানেক হলো।'

'মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায়?'

'হ্যাঁ। অনেক আগে থেকেই চিনি ওকে আমি। লাহোরে আমাদের পাশের বাড়িতেই ছিল ওরা কয়েক বছর। খুব ভাল মেয়ে।'

'শাকুরের ঘর দোরের অবস্থা কি রকম? গোলা ঘর আছে?'

'আছে। দুটো। থাকার জন্যে যে বাড়িটা বানিয়েছে সেটাও বেশ বড়সড়। তিনটে ঘর।'

'ঠিক আছে। পরের কথা পরে—আগে গিয়ে তো দেখা যাক। এছাড়া করার আর কিছুই দেখছি না আমি। এই গাড়িটা আমাদের দরকার লাগতে পারে হঠাৎ তাড়া খেয়ে পালাবার সময়। গোলাঘরে লুকিয়ে রাখা যাবে এটাকে!' স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রানা মার্সিডিজের। হু-হু করে ছুটে চলেছে যেন এক দৈত্য নির্জন অন্ধকার রাস্তা ধরে—জ্বলছে চোখ দুটো।

কথাবার্তা শুনে রানাকে রীতিমত ভয়ই পাচ্ছে বরকতউল্লাহ। ওর যা যা করা উচিত ছিল, অর্থাৎ কল্পনায় নিজেকে দিয়ে যা যা করাতে চেয়েছে সে, অথচ পরিষ্কার জেনেছে নিজের সাধ্য নেই করবার, ঠিক সেই সব করছে এই লোকটা। অনুশোচনা আসছে নিজের অক্ষমতায়। সুটকেসের টাকাগুলোর জন্যেও রীতিমত উদ্বিগ্ন সে। এই লোকটা এতকিছু করবার পর যদি টাকায় ভাগ বসাতে চায়, ঠেকাবার রাস্তা নেই। কিন্তু এটাও ধ্রুব সত্য, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, কেউ যদি তাদের বাঁচাতে পারে তবে এই লোকই পারবে। একে ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।

প্রতিকূল আবহাওয়া আঁচ করে নিতে দেরি হলো না রানার। বুঝতে পারল বরকতউল্লাহ লোকটা গোলমালের কারণ হয়ে উঠতে পারে। রোগা-পাতলা প্রৌঢ়

লোকটা যে রানীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাও টের পাচ্ছে ও। প্রেমের ব্যাপারটা জটিল করে তুলতে পারে পরিস্থিতিকে। লোকটাকে আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেয়ার জন্যে বলতে শুরু করল ও জটিলেশ্বর রায় স্মোক স্ক্রিন হিসেবে ওকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল কিভাবে। প্রসঙ্গত প্রসূন, সিমি, পঁচাত্তর হাজার ডলার, ইত্যাদিও এল। তেহরানে ওর সুটকেসের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের গোপন কাগজ পুরে দেয়ার কথা এল।

'বেশি চালাকি করতে গিয়েই ঠকে বসে আছে জটিলেশ্বর। ভুল করে আমার সুটকেসে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল জেনুইন একটা টপ সিক্রেট সরকারী মেমো। ওটা পাকিস্তানের হাতে পড়লে আরেকটা যুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়।' উপসংহার টানল রানা। 'জিনিসটা এখন আমার কাছে। এটা যদি ওকে ফিরিয়ে না দিই বারোটা বেজে যাবে জটিলেশ্বরের। বুড়ো শকুনটার জন্যে দুর্বলতা আছে আমার।' হাসল ও। 'ও না থাকলে একশো ভাগের এক ভাগ কমে যাবে আমার বেঁচে থাকার আনন্দ। তাছাড়া এত বড় একটা প্রতিভাবান লোক যে কোন জাতির গৌরব। ও নষ্ট হয়ে গেলে পৃথিবীর ক্ষতি। সুতরাং জিনিসটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি। কিন্তু কাজটা যে এতটা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।'

'ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসাডারকে দিতে পারতেন না ওটা?' রানী জানতে চাইল। 'জটিলেশ্বর রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন তিনি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে।'

'দিলেই তিনি এটা পড়তেন। সাথে সাথেই বুঝতেন এটা জটিলেশ্বর রায়ের পার্সোনাল কপি। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি জানতে চাইতেন লাহোরে এটা এল কিভাবে। উঁহুঁ, জটিলেশ্বরকে বাঁচাতে হলে এটা তার হাতেই পৌঁছে দিতে হবে আমাকে।'

'ডকুমেন্টটা আপনার সাথেই রয়েছে?' প্রশ্ন করল বরকতউল্লাহ তিক্ত কণ্ঠে।

রোগা, দুর্বল মুখটার উপর নজর বুলাল রানা ভিউ মিররে চোখ রেখে। বলল, 'সাথেই রয়েছে। কথা ছিল চন্দ্রগুপ্ত টাকাগুলো এনে দেবে আমাকে, বদলে এটা দেব আমি ওকে। তার কাছে গছাতে পারলে নিরাপদে থাকত জিনিসটা। কিন্তু মারা গেল ব্যাটা। সুতরাং সব দায়িত্ব এখন আমার ওপর।'

খানিকক্ষণ বিরতি। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করল বরকতউল্লাহ। বলল, 'টাকাগুলো কিন্তু আমাদের! এই দেশ ছেড়ে পালাবার জন্যে লাগবে এ টাকা আমার আর রানীর। আপনি এ থেকে কিছুই পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে কিন্তু কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই।'

'কপাল গুণে টাকাগুলো হাতে পেয়ে আপনার মাথাটা ঘুরে গিয়েছে দেখছি,' বলল রানা। 'টাকার মূল্য সেটা ভোগ করতে পারার মধ্যে। যতক্ষণ না আপনি পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় উঠতে পারছেন ততক্ষণ এ নিয়ে মাথা গরম করে লাভ কি? আর অধিকারের প্রশ্ন যদি তোলেন তাহলে আমি বলব, ও টাকায় আমারও অধিকার আছে। আমার যতটা আছে আপনার ততটা নেই। সুটকেসটা রেখে আপনাকে যদি এখানে রাস্তার ওপর নামিয়ে দিই, কি করতে পারেন আপনি?'

'চেষ্টা করেই দেখুন না কি করতে পারি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বরকতউল্লাহ।

গাড়ির গতি মন্থর করল রানা। তারপর দাঁড় করাল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে

তাকাতেই মুখোমুখি হলো ও বরকতউল্লার অটোমেটিকের।
'ডকুমেন্টটা দিন আমাকে!' কম্পিত কণ্ঠে বলল বরকতউল্লাহ। চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা আপনাকে চাই না! ওটা দিয়ে নেমে চলে যান গাড়ি থেকে!'
রানা চেয়ে রইল, মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি চালাতে পারেন?'
'না।' পরিষ্কার জবাব বরকতউল্লার।
'তাহলে? আমি নেমে গেলে কি করে পৌছবেন কুশলগড়ে?'
'সেটা আমি বুঝব। নেমে যান আপনি।'
হো-হো করে হেসে উঠল রানা।
'সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই—এ বড় অদ্ভুত সমস্যা। খোদার কসম বলছি, আপনাদের এখানে ছেড়ে দিয়ে নেমে যেতে পারলে বেঁচে যেতাম আমি—মুক্ত বিহঙ্গের মত সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতাম নিরাপদ দূরত্বে।'
কথাটা বলেই ঝট্ করে ঘুরল রানা। চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটার। লাফ দিয়ে এগোল গাড়িটা। ছয় সেকেন্ডে স্পীড উঠে গেল সত্তরে।
'গাড়ি থামান, নয়তো আমি…নয়তো…' রাগে কাঁপছে বরকতউল্লাহ।
উড়ে চলেছে মার্সিডিজ রাস্তার উপর দিয়ে! স্পীড এখন নব্বই।
'করুন, গুলি করুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাক সব।'
এতক্ষণে ধৈর্য হারাল রানী।
'খুব হয়েছে, মি. বরকত! বুঝতে পারছেন না আপনি, উনিই একমাত্র বাঁচাতে পারেন আমাদেরকে? শুধু শুধু ঝামেলা করছেন কেন?'
আহত বোধ করল বরকতউল্লাহ। রানীর ঠাণ্ডা গলার দৃঢ়তাই তাকে বুঝিয়ে দিল ওর মুরোদ সম্পর্কে রানীর কি ধারণা। হোলস্টারে অটোমেটিকটা রেখে দিয়ে সীটের পিছনে পিঠ রাখল সে ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে।
'অযথা উত্তেজিত হবেন না, মি. বরকতউল্লাহ,' সান্ত্বনা দিল রানা। 'শান্ত হোন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাদের। কে কি পাবে সেটা বিপদমুক্তির পরই না হয় ভেবে দেখা যাবে।'
'টাকার ভাগ আপনি পাচ্ছেন না।' ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল বরকতউল্লাহ। 'যদি মনে করেন…'
'থামবেন আপনি!' চেঁচিয়ে উঠল রানী।
একেবারে চুপ হয়ে গেল বরকতউল্লাহ। দু'মিনিট পর পর ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।
গভীর রাত। নির্জন, বহুদূর বিস্তৃত রাস্তা। উল্কা বেগে ছুটছে মার্সিডিজ। রাস্তার এক পাশে পাহাড়, অপর পাশে ধু-ধু বিরান মাঠ। জ্যোৎস্নার মোলায়েম আলো পড়ে মোহময় লাগছে সবকিছু।
মিয়ানওয়ালা ছেড়ে বেরোবার সময় খট্কা লাগল রানার। একটা পুলিস আউট পোস্টের সামনে হাত দেখাল দু'জন সেপাই। থামল না রানা। গাড়ির পিছন পিছন কয়েক পা দৌড়ে থেমে গেল ওরা। একজন গাড়ির নম্বর টুকছে নোট বইয়ে। অস্বস্তি বাসা বাঁধল রানার মনে। এদের কি সতর্ক করে দেয়া হয়েছে?
মিনিট পাঁচেক পর চৌরাস্তা পাওয়া গেল। বাঁয়ে মোড় নিয়ে ছুটল মার্সিডিজ

লাঙ্গারের দিকে! দশমিনিট পর মুখ খুলল রানী।

'ব্রিজটা পেরিয়ে ঢুকতে হবে বামদিকের গলি দিয়ে।' খানিক পরে বলল, 'এই যে, এই গলিটা। আধ মাইল গিয়ে আবার ঘুরতে হবে বামে। এসে গেছি প্রায়।'

আধমাইল গিয়ে রানীর নির্দেশে ঘুরল রানা, কিন্তু ঘুরেই থেমে দাঁড়াল।

'আপনি একা যান। গিয়ে বলুন আরও দু'জন সাথে আছে আপনার। ওর অসুবিধে থাকলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

'অসুবিধে হবে জানলে এতটা পথ আসি?' রানী বলল। 'ও বরং খুশিই হবে সাহায্য করার সুযোগ পেলে। আমি জানি...'

রানা হাসল রানীর কথায়। 'আমি তো জানি না। আমি যখন চার্জ নিয়েছি, আমার জানতে হবে। যান, যা বলছি করুন।'

গাড়ি থেকে নামল রানী, ইতস্তত করল খানিক, তারপর পা বাড়াল।

চটে উঠে বলল বরকতউল্লাহ, 'আপনি ওভাবে হুকুম করতে পারেন না ওকে! কি মনে করেছেন আপনি নিজেকে?'

ঘাড় ফেরাল রানা। বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল বরকতউল্লার দিকে।

'আপনি বিরক্ত করে ফেলেছেন আমাকে। ভাল চান তো চুপ করে থাকুন। 'একদম শাট্ আপ! নইলে ফল শুভ হবে না।'

'কি বললেন?'

হোলস্টার থেকে অটোমেটিকটা বের করতে গেল বরকতউল্লাহ। কিন্তু তার আগেই চোখের পলকে বের করে আনল রানা নিজের পিস্তলটা। বরকতউল্লার হাত তখনও তার অটোমেটিকের বাঁট পর্যন্ত পৌঁছেনি। বিস্ফারিত চোখে চাইল রানার পিস্তলটার দিকে।

'বেরিয়ে যান গাড়ি থেকে!' রানা বলল। 'কুইক!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে পড়ল বরকতউল্লাহ গাড়ি থেকে। সুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই ধমক খেয়ে সোজা হয়ে গেল আবার। রানাও নামল পিস্তল হাতে নিয়ে। 'যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফেলে দিন এবার পিস্তলটা মাটিতে।'

দ্রুত হুকুম পালন করল বরকতউল্লাহ।

'সামনে বাড়ুন।'

কয়েক পা এগোল বরকতউল্লাহ। অটোমেটিকটা তুলে নিল রানা, গুলিগুলো বের করে পকেটস্থ করল, তারপর ডাক দিল, 'এই যে!' বরকতউল্লাহ ঘুরে দাঁড়াতে অটোমেটিকটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে। 'আপনার মঙ্গলের জন্যেই গুলিগুলো সিজ্ করলাম।' খপ করে শূন্যে ধরতে গিয়ে হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেল বরকতউল্লার পিস্তলটা। তুলে নিয়ে হোলস্টারে পুরে রাখল সে ওটা। হেঁট হয়ে গেছে মাথা।

'মনে রাখবেন,' রানা বলল, 'আমি যা বলব তাই করতে হবে, আমি যা সিদ্ধান্ত নেব সেটাই আইন। কোন যুক্তি তর্ক শুনতে চাই না আমি। যদি আমার নেতৃত্ব পছন্দ না হয় দূর হয়ে যেতে পারেন যেখানে খুশি।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলে ঘুরে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ্।

সিগারেট ধরাল রানা মার্সিডিজের বনেটের উপর উঠে বসে।

*

তারিক আখতারের মত এমন একজন বাঘা লোককে দিলারা দুররানীর মত সাধারণ একটা মেয়ে কাঁচকলা দেখিয়ে ভেগে গেছে জেনে এত বেশি সন্তুষ্ট বোধ করল দিল মোহাম্মদ যে তা তার চোখে মুখে ফুটে উঠল, চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও। ডেস্কের এদিকে একটা চেয়ারে বসে চেয়ে রয়েছে সে অসহিষ্ণু তারিক আখতারের মুখের দিকে।

ডেস্কের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে তারিক আখতার ঝুঁকে রয়েছে সেটার উপর। ভুরু জোড়া কোঁচকানো। মেয়েটা ওর আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে,নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে সে, তা সম্ভব নয়। ধরা তাকে পড়তেই হবে। এবং ধরা পড়লে সে তেরোটা বাজাবে ওর। নিজের হাতে করবে সে যা করার।

দরজায় টোকা দিয়ে আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই ভিতরে ঢুকল সিকান্দার বিল্লাহ।

'রানা আছে মেয়েটার সাথে,' দরজা বন্ধ করেই ঘোষণা করল সে। 'আরও একজন লোক আছে ওদের সাথে··· চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি তাতে মনে হয় এ লোক বরকতউল্লাহ।'

সোজা হয়ে বসল তারিক আখতার। 'রানা··· ঠিক জানো?'

'নাইট ক্লাবের এক ওয়েটার দশ টাকা বকশিশ পেয়ে একজন লোককে একটা বুদের ব্যবস্থা করে দেয়। তার বর্ণনা অনুযায়ী কোন সন্দেহ নেই লোকটা রানা। রানা তার হাতে একটা কার্ড পাঠিয়েছিল দিলারা দুররানীর কাছে। তাতে লেখা ছিল একটা কাঠের পরী কিনতে ইচ্ছুক সে। কয়েক মিনিট পর বরকতউল্লাহ এসে জোটে ওদের সাথে। ওয়েটার ওদেরকে পিছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। পিছনেই কার পার্ক। একটা মার্সিডিজ পাওয়া যাচ্ছে না।' সিকান্দার বিল্লাহ অভিব্যক্তিহীন কণ্ঠে রিপোর্ট করছে, আর তারিক আখতারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'কাঠের একটা পরী রয়েছে দিলারা দুররানীর অ্যাপার্টমেন্টে।'

'মার্সিডিজের নম্বর পেয়েছ?'

'এই যে,' পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো বের করে ডেস্কে রাখল সিকান্দার বিল্লাহ।

চোখ দিয়ে ইশারা করল ব্রিগেডিয়ার দিল মোহাম্মদকে।

'গাড়িটা ট্রেস করো।'

ডেস্ক থেকে ছোট্ট কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল দিল মোহাম্মদ।

দশ সেকেন্ড চোখ বুজে চুপচাপ চিন্তার পর প্রশ্ন করল তারিক আখতার, 'মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করা হয়েছে?'

'হয়েছে, স্যার।' একটা চেয়ারের হাতলে বসল সিকান্দার বিল্লাহ। একটা হাত রাখল চেয়ারের পিঠে। 'বরকতউল্লাহ ওখানেই লুকিয়ে ছিল। তার কিছু কাপড় চোপড় আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। কাঠের পরীর গায়ে পাওয়া গেছে চন্দ্রগুপ্তের আঙুলের ছাপ। পরীর মাথাটা আলগা। নামানো যায়। ভেতরটা ফাঁপা। কিছু না কিছু নিশ্চয়ই লুকানো ছিল ওখানে। খুব সম্ভব ওই পার্সেলটা।'

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারিক আখতার। তারপর বলল, 'গাড়িটা পেয়েছে ওরা ভাল। এতক্ষণে বেরিয়ে গেছে লাহোর ছেড়ে। সীমান্তের দিকে যাবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু ট্রেস করতে না পারলে বোঝার উপায় নেই কোন্ দিকের সীমান্ত। ইন্ডিয়া, ইরান, না আফগানিস্তান? আমার মনে হয় কাছাকাছি কোথাও বর্ডার ক্রস করবার চেষ্টা করবে না মাসুদ রানা। ওর জানা আছে, এদিকে কড়া পাহারা। গাড়ি যখন আছে···আফগানিস্তানে বা ইরানে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিকান্দার বিল্লাহ।

'এখুনি ওরা বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করবে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা ওরা আপাতত লুকিয়ে থাকবে কোথাও। যখন ওদের মনে হবে খোঁজাখুঁজির কড়াকড়ি একটু শিথিল হয়েছে, তখন চেষ্টা করবে। লুকোবার জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। দিলারা দুররানী সম্পর্কে আরও খোঁজ নেয়া হচ্ছে—আমি দেখি গিয়ে কতদূর কি জানা গেল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ব্রিগেডিয়ার। দরজার দিকে এগিয়ে গেল সিকান্দার বিল্লাহ। পিছন থেকে ব্রিগেডিয়ারের কথা শুনে দাঁড়াল আবার।

'ওদেরকে পেতেই হবে, বিল্লাহ। যেমন করে হোক। দরকার হলে আর্মি নামাব অপারেশনে।'

নিষ্ঠুর, নিঃশব্দ হাসি হাসল সিকান্দার বিল্লাহ।

'অতদূর যেতে হবে না, স্যার। খামোকা মাথা গরম করছেন। আগেই ধরা পড়ে যাবে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সে।

দশমিনিট পর দিল মোহাম্মদ ফেরত এসে দেখল তারিক আখতার ম্যাপ দেখছে আগেরই মত ভ্রূ কুঁচকে।

'সারগোদায় পেট্রল নিয়েছে, স্যার, মার্সিডিজটা,' রিপোর্ট দিল সে। 'তারপর আর কোন সন্ধান নেই। তিনজন আরোহী ছিল গাড়িটায়। একজন ড্রাইভ করছিল, তার পাশে একটা মেয়ে, পিছনে আর একজন লোক। রানা, দিলারা, বরকতউল্লাহ।'

মুখ তুলে তাকাল তারিক আখতার। চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর।

'তোমার দায়িত্ব ওরা যাতে সীমান্ত পেরোতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। কত লোক লাগাবে তা জানতে চাই না আমি। এরা তিনজন যেন কোনমতে সীমান্তের ওপারে যেতে না পারে।'

'সেই ব্যবস্থাই করে এলাম, স্যার,' বলল দিল মোহাম্মদ। 'বর্ডার সীল্ড।'

অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে বিদায় জানাল তাকে তারিক আখতার। দিল মোহাম্মদ চলে যেতে সিগারেট ধরিয়ে সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল সে। নিজের উপর রেগে আগুন হয়ে আছে সে। সিকান্দার যখন বলেছিল শেরমান ফুল দেয় মেয়েটাকে তখনই তার উচিত ছিল ওকে অ্যারেস্ট করা। রানাকেও ধরে ফেলা উচিত ছিল আগেই। অতি সাবধান হতে গিয়ে নিজেই ঘোলাটে করে ফেলেছে সে গোটা পরিস্থিতিটা। দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিল সে নিজেকে। এই সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়ে দাঁড়াবে সুদূর পরাহত। শান্তি হবে না ভাইয়ের আত্মার। নিজ হাতে রানাকে খুন করতে না পারলে শান্তি

পাবে না সে নিজেও।

আধঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখল সিকান্দার বিল্লাহ, ডেস্কের ওপাশে আগের মতই বসে আছে তারিক আখতার।

'সম্ভাব্য একটা সূত্র পাওয়া গেছে, স্যার।' কথাটা বলে একটা কোয়ার্টার সাইজ ফটোগ্রাফ এগিয়ে দিল সে। 'এটা পাওয়া গেছে দিলারা দুররানীর ছবির অ্যালবামে।'

ফটোটা দেখল তারিক আখতার। রানী এবং স্বাস্থ্যবান এক যুবক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার পরনে হাফ প্যান্ট, চেক শার্ট এবং কাদা মাখা বুট। ওদের পিছনে একতলা একটা কাঠের বাড়ি। ডানদিকে বড় বড় দুটো গোলা ঘর।

মুখ তুলল ব্রিগেডিয়ার।

'নির্জন একটা ফার্মহাউস লুকোবার জন্যে চমৎকার জায়গা। চেক করা দরকার। কে লোকটা?'

'শাকুর খান। বাপ পাঠান, মা বাঙালী। ওর বাবা ছিল দিলারার বাপের বন্ধু। স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বলে একসাথে ধরা পড়ে ওরা দু'জন। দু'জনই মারা যায় টর্চার চেম্বারে। বাবার মৃত্যুর পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কোহাট চলে যায় শাকুর খান। কুশলগড়ে আট দশ একর জমি কিনে নিয়ে ফার্মিং করছে।'

ম্যাপের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার।

'কোন সন্দেহ নেই ওইদিকেই চলেছে ওরা। খুশাব, কাঠ্‌ঠা, জাবা, টালাগাঙ, পিণ্ডিগেব, মিয়ানওয়ালা, লাঙ্গার—প্রত্যেকটা থানায় ওয়ায়্যারলেসে খবর দাও। আটকানোর চেষ্টা যেন না করে,—শুধু গাড়িটা দেখা মাত্র জানাবে আমাদের। পুরো আফগানিস্তান বর্ডারকে হুঁশিয়ার করে দাও। একটা ছুঁচোও যেন বর্ডার ক্রস না করতে পারে।'

'ইয়েস, স্যার!' বেরিয়ে যাচ্ছিল সিকান্দার বিল্লাহ, কিন্তু থামল ব্রিগেডিয়ারের ডাকে।

'শোনো, এসব কাজের ভার দিল মোহাম্মদকে দিয়ে তুমি লোক রেডি করো। এক্ষুণি রওনা হব আমরা।'

'তিন গাড়ি স্পেশাল পুলিস দাঁড় করিয়ে রেখেছি, স্যার, বাইরে। তিন ছক আঠারো জন।'

'ভেরি গুড! তবে রানা যখন রয়েছে ওদের সাথে, আঠারো দুগুণে ছত্রিশ জন লাগবে ওকে ধরতে হলে। এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।'

এমনি সময়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল দিল মোহাম্মদ। হাঁপাচ্ছে।

'খুশাব থানা থেকে খবর এসেছে, স্যার! কাঠ্‌ঠার দিকে চলেছে মার্সিডিজ।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল তিনজন অফিস কামরা থেকে।

***

অকস্মাৎ সীমান্ত-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫

এক

খটখটে তিনটে কাঠের চেয়ার আর একটা বেঞ্চ ছাড়া বড়সড় ঘরটায় আর কোন আসবাবের বালাই নেই। শিক্ষিত লোকের ফার্মিংয়ের কথা শুনে রানার ধারণা হয়েছিল রীতিমত ধনী লোক বুঝি শাকুর খান। আসলে নেহায়েত গরীবী না হলেও সাদামাঠা হাল। অনুর্বর বাজে জমি পড়েছে ওর কপালে। যথেষ্ট পরিশ্রম করে এ জমি থেকে তুলতে হয় বছরের খোরাক। কাঠের ঘর। শীতকালে খুবই কষ্ট হয় বোঝা যাচ্ছে। রানা, বরকতউল্লাহ ও রানী বসেছে তিনটে চেয়ারে–বেঞ্চিতে ওদের মুখোমুখি বসেছে শাকুর ও কানিজা। আন্তরিকতার কার্পণ্য নেই, বুঝতে পারল রানা–সুখী দম্পতি।

পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে শাকুরের বয়স। সুঠাম, মজবুত শরীর, গোলগাল মুখটা, চোখে সরল, সাদা-সিধে চাউনি। তবে সদা প্রস্তুত একটা ভাব রয়েছে ওর চালচলনে।

কানিজা পাঠানের মেয়ে, বছর দুয়েকের ছোট হবে স্বামীর চেয়ে। সাদামাঠা চেহারা। তাগড়া না হলেও শক্ত সমর্থ। মেয়েটার শান্ত, উদ্বেগশূন্য, সদা-খুশি মুখটা দেখে খুশি হলো রানা। যে-কোন জরুরী পরিস্থিতিতে এর ওপর ভরসা করা যায়, ভাবল সে। শাকুরের পরনে ট্রাউজার, শার্ট। সালোয়ার-কামিজ পরেছে কানিজা।

ঘুমুচ্ছিল ওরা। রানী দরজায় ধাক্কা দিয়ে উঠিয়েছে। মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে আশ্রয় ও সাহায্য চাইছে রানী, তাও নিজে একা নয়, সাথে জুটিয়ে এনেছে আরও দু'জন লোককে–ব্যাপারটা কিভাবে গ্রহণ করবে শাকুর খান, সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল রানার মনে। কিন্তু সব চিন্তার অবসান হয়েছে যখন দেখা গেল বিপদের কথা শুনে মুখ গোমড়া করা বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা তো দূরে থাকুক, শুধু শাকুর নয়, তার স্ত্রী পর্যন্ত ছুটে এসেছে অভ্যর্থনা জানাতে। রাস্তা থেকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে। বিপদের কথা শুনেও ইতস্তত করেনি ওরা। গোলাঘরের দরজা খুলে গাড়িটা তার ভিতর লুকিয়ে রেখে এসে বসেছে ওরা বাইরের ঘরে। বিশ্রামের জন্যে পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও রাজি হয়নি রানা। আগে কথা হবে খোলাখুলি–তারপর বিশ্রাম।

কথা বলছে একা রানাই।

'আমাদের সম্পর্কে আপনারা যত কম জানবেন, আপনাদের এবং আমাদের জন্যে ততই ভাল। কাজেই পরিচয় পর্ব ডিঙিয়ে একেবারে কাজের কথায় আসা যাক।' সরাসরি শাকুরের চোখের ওপর দৃষ্টি রাখল রানা। 'পালাচ্ছি আমরা। শুধু পুলিস নয়, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোক ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার খুঁজছে আমাদের। খুব সম্ভব এতক্ষণে সমস্ত বর্ডার সীল করে দেয়া হয়েছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ওরা আমাদের ধরার ব্যাপারে। এই

অবস্থায় বর্ডার পেরোতে হবে আমাদের। টাকা-পয়সা কোন সমস্যা নয়–প্রচুর আছে, দু'হাতে খরচ করতে পারব। পালানোর ব্যাপারে আপনার পক্ষে কোনরকম সাহায্য করা সম্ভব?'

রানাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখল শাকুর খান। চিন্তা করল। তারপর মাথা দোলাল ঘন ঘন।

'এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে টাকা দিয়ে আপনি বর্ডার ক্রস করতে পারছেন না।' শান্ত গলায় বলল সে। 'নকল পাসপোর্ট করেও লাভ দেখি না। ওসব দেখিয়ে আপনারা কেউ বর্ডার চেকপোস্টকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। অন্তত আগামী দু'মাস তো নয়ই। তাছাড়া ব্রিগেডিয়ার তারিক যদি আপনাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তাহলে নির্ঘাত সে ট্রুপ্স্ কল করবে। শুরু হবে কম্বিং অপারেশন।' কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর আবার শুরু করল সে। 'তবে একটা জায়গা আছে যেখান দিয়ে ক্রসিং সম্ভব। কিন্তু এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে সে জায়গা। পাহাড়ী হাঁটা পথ। পথের অবস্থাও সুবিধের নয়। চারদিনের রাস্তা, রোজ যদি বিশ মাইল করে হাঁটেন।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। রানী বা বরকতউল্লাহ দু'জনের কেউই আশি মাইল পথ হাঁটতে পারবে না। 'গাড়ি ব্যবহার করে দূরত্ব খানিকটা কমিয়ে নিতে পারি না আমরা?'

'রাস্তা যদি নিরাপদ মনে করেন তাহলে বেশ কিছুটা দূরত্ব কমিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পাহারা বসাবে ওরা রাস্তায়। সুবিধের চেয়ে বিপদের ঝুঁকিই বেশি। একমাত্র নিরাপদ উপায় হলো হাঁটা, রাস্তা থেকে দূরে থাকা।'

'পথঘাট ভাল মত চেনা আছে আপনার?'

'নখদর্পণে আছে। চারবার চারটে দলকে পার করে দিয়ে এসেছি আমি এই পথে। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল ভেঙে সে জায়গায় পৌঁছতে হয়। আমি আপনাদের ম্যাপ এঁকে দেব। সাথে করে নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু কানিজাকে একা এখানে রেখে আমি যাব না।'

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, এই লোককে কাজে লাগাতে পারলে উপকারে আসবে। শুধু স্পষ্টভাষীই নয়, লোকটা বুদ্ধিমান।

'আপনারা দু'জনও চলুন না,' বলল সে। 'এখানে পচে মরছেন কেন? চলুন আমাদের সাথে। নতুন ভাবে জীবন শুরু করার মূলধন যোগাড় হয়ে যাবে।'

'কোথায় যাব?' একটু অবাক দেখাল শাকুরকে। 'বাংলাদেশে? ওরা কি আমাদের নেবে? আমার মাতৃভাষা বাংলা হতে পারে, কিন্তু আমার বাপ পাঠান, আমিও পাঠান। এদেশের বাইরে কোথায় গিয়ে ঠাঁই পাব আমরা?'

'দুনিয়াটা খোলা আছে আপনাদের সামনে,' বলল রানা। 'যে-কোন দেশে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারেন। বাংলাদেশেও।'

শাকুর এবং কানিজা পরস্পরের দিকে তাকাল।

'এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লাভ কি আপনাদের?' ঘরের চারদিকে চাইল রানা। 'এখানে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারেননি আজও। আর কবে? বরং আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখুন। সাথে আমাদের পঁচাত্তর হাজার ডলার আছে। দশ

দিয়ে গুণ করলে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। মানুষ আমরা পাঁচজন। পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক একজন এক একটা ভাগ নিতে পারি আমরা। আপনারা দু'জন পাচ্ছেন ত্রিশ হাজার ডলার–অর্থাৎ তিন লাখ টাকা। এই টাকা দিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারেন যেখানে খুশি। ভারত, শ্রীলংকা বা বাংলাদেশ...যেখানে খুশি। যাবেন আমাদের সাথে?'

বরকতউল্লাহ দুই হাতে আঁকড়ে ধরল সুটকেসটা। 'এরকম প্রস্তাব দেয়ার কোন অধিকার আপনার নেই।' রানার প্রস্তাব চমকে দিয়েছে ওকে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই টাকা আপনার নয়। আমার এবং রানীর।'

চারজনই তাকাল বরকতউল্লার দিকে। কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। রানী শান্ত কণ্ঠে নীরবতা ভাঙল।

'মি. বরকত, টাকাগুলো আমাদের নয়। দয়া করে বোকার মত চেঁচাবেন না।'

'তুমি সবসময় আমাকে বোকা বোকা করছ!' আবার চেঁচাল বরকতউল্লাহ। 'তুমি বুঝতে পারছ না, আমি তোমারই স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছি? এই টাকা...'

'মি. বরকত! আপনি থামবেন কিনা বলুন!' কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বরকতউল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানী। 'দিন, সুটকেসটা আমাকে দিন।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বরকতউল্লাহ রানীর মুখের দিকে। সুটকেস ছেড়ে দিল সে।

'ঠিক আছে, নাও।' ভাবাবেগে কাঁপছে গলা। 'নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছ তুমি। তোমার ধারণা আমি বোকামি করছি, কিন্তু আসলে তুমিই বুঝছ না. কি করছ তুমি।'

'আমি যা করছি, বুঝেশুনেই করছি। অনর্থক ঝামেলা করবেন না।' সুটকেসটা নিয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানী। 'এই নিন, যা ভাল বোঝেন করুন।'

শাকুরের দিকে ফিরল রানা। 'তিরিশ হাজার ডলার। বর্ডারের ওপারে আমাদেরকে পৌঁছে দিলে পেতে পারেন। ইচ্ছে করলে এখানেও ফিরে আসতে পারেন আপনারা।'

চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়াল শাকুর। 'আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা দরকার আমাদের,' বলল সে। 'মাফ করবেন।' কানিজার হাত ধরে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুটকেস খুলে ডলারের প্যাকেট পেল রানা। প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে বান্ডিলটা বের করে নিয়ে বলল, 'শাকুর খান পথঘাট চেনে। কিভাবে নিরাপদে বর্ডার পেরোনো যায় জানা আছে ওর। শুধু জানা নয়, রীতিমত বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ওকে ছাড়া পথ চিনে পৌঁছতে পারব না আমরা। সেজন্যেই টাকার কথাটা বললাম।

রানী মাথা নেড়ে সমর্থন করল রানাকে। 'বুঝতে পেরেছি আমি। ভাল করেছেন।'

'পরের টাকা বিলিয়ে দিয়ে মহৎ লোক সাজছেন উনি!' তিক্ত গলায় বলল বরকতউল্লাহ।

দ্রুত হাতে টাকা গুনে আলাদা আলাদা ভাগ করছিল রানা, বিরক্তির সাথে তাকাল। 'আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি–আমার কাজকর্ম পছন্দ না হলে দূর হয়ে যেতে পারেন। এই যে আপনার ভাগ। আমাদের সাথে আপনাকে যেতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি আপনাকে। ইচ্ছে করলে নিজের ভাগ নিয়ে কেটে পড়তে পারেন।'

কটমট করে বরকতউল্লাহ চাইল রানার মুখের দিকে।

'সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই টিটকারি দিচ্ছেন। অসহায় একজন লোককে...'

'আহা...এ তো মহা মুশকিল দেখছি! মেয়ে মানুষেরও বাড়া! এদিকও পছন্দ না, ওদিকও পছন্দ না–কোন্‌টা পছন্দ আপনার? যা চান তা করুন না?'

উত্তর দিতে না পেরে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বরকতউল্লাহ রানীর দিকে।

'এ লোক একটা ধাপ্পাবাজ! বুঝতে পারছ না তুমি? ইতিমধ্যেই তোমার-আমার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখবে...'

'টাকাগুলো আপনার বা আমার নয়,' রানী বলল। 'একথা কতবার বলতে হবে আপনাকে, মি. বরকত?'

অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল লোকটা রানীর দিকে। হাল ছেড়ে দিয়ে অপরিপুষ্ট কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে! তাহলে কিছু বলার নেই আমার।'

নোটগুলো সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে বেঞ্চের ওপর সাজিয়ে রাখল রানা। শাকুর আর তার স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছে। আনমনে চোখ বুলাচ্ছে ঘরের চারপাশে। কাঠের দেয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে চোখ পড়ল ওর। চোখ সরিয়ে নিয়েই সচকিত ভঙ্গিতে আবার চাইল ছবিটার দিকে। তড়াক করে উঠে এগিয়ে গেল ফটোগ্রাফটা কাছ থেকে পরীক্ষা করার জন্যে। ফটোয় রানী ও শাকুরকে দেখা যাচ্ছে। ওদের পিছনে এই বাড়িটা, ডানদিকে গোলাঘর দুটো। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এই ফটোটা...এর কোন কপি আছে আপনার কাছে?'

ফটোটার দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারল রানী কি ভাবছে রানা। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা।

'হ্যাঁ...অ্যালবামে...আমার ঘরে...'

'বুঝেছি।' হাত নেড়ে থামিয়ে দিল রানা ওকে। দরজার দিকে এগোল ও। 'শুনুন, চলে আসুন আপনারা! জলদি!'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল শাকুর ও কানিজা। এ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শাকুর বলল। 'ভেবে দেখলাম, যাব আপনাদের সাথে।'

হাসল রানা।

'এখন আর ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, মি. শাকুর।' আঙুল তুলে ফটোটা দেখিয়ে বলল, 'এর কপি রয়েছে দিলারার অ্যাপার্টমেন্টে। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পেয়ে গেছে সে কপি। আপনার এই ফার্ম খুঁজে নিতে বেশি দেরি হবে না ওদের। আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছে যেতে পারে ওরা। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া দরকার আমাদের। এই যে, আপনাদের ভাগের টাকা।' দুটো ভাগ এক সাথে

করে দিল রানা শাকুরের হাতে। 'চলুন। দেরি করা উচিত নয় আর।'

নোটগুলোর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল শাকুর অপলক দৃষ্টিতে, তারপর দ্রুত পকেটে পুরে বলল, 'কানিজা।' রানীকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'ওই পোশাকে হাঁটতে পারবে না রানী। তোমার এক সেট কাপড় দাও ওকে। কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই আমি। অন্তত সাতদিনের খোরাক...' কথা বলতে বলতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

রানীর কাঁধে হাত রেখে কানিজা বলল। 'ঠিকই বলেছে ও। আমার সাথে এসো।' বেডরূমে চলে গেল ওরা দু'জন।

রানা এবং বরকতউল্লাহ চাইল পরস্পরের দিকে। বরকতউল্লাহ কি যেন বলতে গেল কিন্তু রানার চোখের নিরুৎসুক দৃষ্টি দেখে ক্ষান্ত হলো। রানা আবার সিগারেট ধরাল। টেবিলে রাখা টাকার দিকে হাতের ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনার ভাগের টাকাটা তুলে নিন। আর, কেউ যখন নেই, একটা কথা শুনে রাখুন। আপনি যদি আবার কোন ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করেন তাহলে কিসের আঘাতে কখন মারা গেছেন টেরও পাবেন না। বোঝা গেছে?'

গুম হয়ে রইল বরকতউল্লাহ। কাঁপা হাতে বেঞ্চের ওপর থেকে ওর ভাগের নোটগুলো তুলে নিয়ে পকেটে রাখল।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মি. বরকতউল্লাহ। আমি রানীর প্রেমে পড়িনি, কাজেই আপনার ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পরাজিত, করুণ ভাবটা মুছে ফেলুন মুখ থেকে। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে খুশিমনে একসাথে কাজ করতে হবে আমাদের।'

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল বরকতউল্লাহ। জবাব দিল না। মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। দশ মিনিট পর বেশ বড়সড় তিনটে রাকস্যাক নিয়ে ফিরে এল শাকুর। 'খাবার যা ছিল সব সাথে নিয়েছি...শুকনো খাবার কিছু, মোমবাতি, সাবান, দেশলাই এবং সবার জন্যে একটা করে কম্বল...দরকার পড়বে এসব।' রাকস্যাক মেঝেতে ফেলল সে। 'বহুত দূর যেতে হবে আমাদের।'

কানিজা ও রানী ফিরে এল। সালোয়ার-কামিজ পরেছে রানী। একটু আঁটো। চমৎকার মানিয়েছে ওকে।

'কোন্‌দিকে রওনা হচ্ছি আমরা?' রানীর হাতে ওর টাকার ভাগ দিয়ে শাকুরকে প্রশ্ন করল রানা।

'পাহাড়ে। আমার একটা কুঁড়েঘর আছে ওখানে,' বলল শাকুর। 'দেড় বছর আগে তৈরি করেছিলাম। কেউ জানে না ওটার খবর। প্রথমে ওখানেই যাব আমরা। এখান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে। ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করেছি ওটা। ওখানে পৌঁছলে, নিরাপদে পরিকল্পনা করতে পারব আমরা। ম্যাপ আছে আমার কাছে, দেখাতে পারব কোন্ পথটা বেছে নিতে হবে আমাদের।' বড় বড় দুটো কাগজের ঠোঙা রাখল সে বেঞ্চির ওপর। 'এই দুটোয় শুকনো মরিচের গুঁড়ো আছে। ওদের সাথে ট্রেনিং পাওয়া কুকুর থাকবে। আমি জানতাম এখান থেকে একদিন পালাতে হবে আমাকে। জানতাম, আমার বাঙালী পার করার খবর

পেয়ে যেকোন দিন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে পুলিস আমার ওপর। সেই কথা ভেবে এগুলো জোগাড় করে রেখেছিলাম। আমরা লাইনবন্দী হয়ে একজনের পিছনে একজন হাঁটব। সবার আগে আমি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি সবার পিছনে। মরিচের গুঁড়ো আপনি নেবেন। সাবধানে পিছনে ছড়াতে ছড়াতে হাঁটবেন। যা আছে তাতে মাইল তিনেক ছড়ানো যাবে। তাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, বেরুতে পারি এবার আমরা।'

দুই মিনিট পর লাইনবন্দী হয়ে পাঁচজন রওনা হলো ওরা শক্ত ঘাসের ওপর দিয়ে। একটা ঠোঙার নিচে ছোট একটা ফুটো করে নিয়ে মরিচের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে হাঁটছে রানা সবার পিছনে। ফার্ম থেকে বেশ খানিক দূর যাওয়ার পর শুরু হলো জঙ্গল। ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে। ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে পাথুরে মাটির ওপর পা ফেলে ফেলে পাহাড়ে ওঠা এমনিতেই কষ্টকর, তার ওপর এখন রাত। রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে রানী। আগে আগে পথ দেখাচ্ছে শাকুর। কানিজা এ রকম ওঠায় অভ্যস্ত, সুন্দর উঠে যাচ্ছে সে। খানিক পর পরই রানীকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যেতে হচ্ছে রানাকে সামনে।

পিছন দিকে না তাকিয়ে চুপচাপ শাকুরকে অনুসরণ করছে বরকতউল্লাহ। দুঃখ, রাগ, ঘৃণা সবই পুষে রেখেছে নিজের মধ্যে। একটা সাধারণ গৃহস্থকে বিনা দ্বিধায় ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে দেয়ায় রানাকে ক্ষমা করতে পারবে না সে জীবনে কোনদিন। এমন বিদঘুটে কাণ্ড কেউ করে? পাঁচ হাজার দিলেই খুশিতে নাচত ওরা, ভাবছে সে।

পায়ে হাঁটা সরু একটা বনপথে পৌছল ওরা। চলার গতি আরও একটু দ্রুত করল শাকুর। বিশ মিনিট একনাগাড়ে ওপর দিকে ওঠার পর রানী কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল, 'এই থামলাম। আর উঠতে পারব না আমি।'

গোটা দলটা দাঁড়াল।

'হায়! হায়!' বলল শাকুর, 'এইটুকুতেই কাহিল হয়ে গেলে, রানী! আরও আছে ছিয়াত্তর মাইল। আটত্রিশ মাইল খাড়াই, আটত্রিশ মাইল উৎরাই। চল, চল—দিল্লী হনোজ দুরস্ত।'

'এই দেখুন!' নিচের দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা।

চাঁদের আলোয় ফার্মহাউসে যাওয়ার সরু গলিটা সাদা একটা ফিতের মত দেখা যাচ্ছে। অনেক নিচে। ওই সরু গলিটার শেষ মাথায় ফার্মহাউস। লাইন বেঁধে গলিতে ঢুকছে কতকগুলো গাড়ি, দূর থেকে খেলনার মত দেখাচ্ছে। রানা গুনল, আটটা।

'পৌছে গেছে ওরা!' কথাটা বলেই রানীর বাহু ধরে টেনে দাঁড় করাল ওকে রানা। 'আর সামান্য কষ্ট করুন। আধ মাইল গেলেই পৌছে যাব এ পাহাড়ের মাথায়! নামতে দেখবেন, কষ্ট হবে না মোটেও।'

আবার রওনা হলো ওরা। ঘর্মাক্ত কলেবরে পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট্ট দলটা উঠতে লাগল ওপর দিকে। সব কষ্টেরই শেষ আছে। উপত্যকায় পৌছল ওরা। ওখান থেকে অনেক নিচের ফার্মহাউসটাকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। বাড়িটার সবক'টা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। পিঁপড়ের মত ছোট

ছোট মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটার চারপাশে।

'মরিচ শেষ,' রানা জানাল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' উত্তর দিল শাকুর। 'আর আমাদের নাগাল পেতে হচ্ছে না। কিন্তু এখন থেকে পথ একটু দুর্গম। ভয়ের কিছুই নেই···কুঁড়েঘরে পৌঁছব আমরা আর বিশ মিনিটের মধ্যেই।'

সরু বনপথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ চিনে এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল সে। সবাই অনুসরণ করল তাকে। রানার সার্বক্ষণিক সাহায্যে উঠে যাচ্ছে রানী তরতর করে। রানীর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরেও বরকতউল্লাহ পিছন ফিরে তাকায়নি একবারও। সুটকেস নিয়ে তার নিজেরই কাহিল অবস্থা। পঁচিশ মিনিট একনাগাড়ে ওঠার পর কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে পৌঁছল ওরা। ঝোপ-ঝাড় আর বড় বড় গাছের ডালপালায় কুঁড়েঘরটা এমন কায়দা করে ঢাকা যে একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগে কারও চোখ পড়েনি।

'এই আমার কুঁড়েঘর।' তালা খুলল শাকুর। 'আহামরি কিছু নয়। তবে নিরাপদ।'

রাকস্যাকের ভিতর থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে ভিতরে ঢুকল কানিজা। ছোট্ট ঘর। বহুদিন বন্ধ থাকায় ভাপসা একটা গন্ধ এল নাকে। ভিতরে একটা টেবিল, খানকয়েক টুল। দেয়াল ঘেঁষে ওয়ার্ক-বেঞ্চের মত দুটো বেঞ্চ। মোমবাতি জ্বালাতে শুরু করল শাকুর। একটা বেঞ্চের দিকে এগোল রানী। পা উঠছে না তার। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। শাকুর বলে উঠল, 'ওখানে শুয়ে পোড়ো না যেন এখুনি! সাপ থাকতে পারে।'

রানীকে ভয়ে পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে সরে আসতে দেখে হো-হো করে হাসল রানা।

'দাঁড়ান, দেখছি আমি।' টর্চটা নিয়ে সারাটা ঘর দেখল রানা, মেঝে পরীক্ষা করল, বেঞ্চ সরিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'না, সাপ-টাপ নেই। বসে পড়ুন যার যেখানে খুশি।'

একটা বেঞ্চে বসে পড়ল রানী, তারপর শুয়ে পড়ল টান টান হয়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে বরকতউল্লাহ। হাতে এখনও সুটকেস। ঘরের চারপাশে চেয়ে সাপ খুঁজছে।

কম্বলগুলো বের করল রানা। শাকুর কাঠ খড় সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল একটা মাটির চুলোয়। কানিজা রাকস্যাক থেকে বের করল কফি, পাউডার দুধের টিন, কয়েকটা মগ, আর একটা ছোট্ট সসপ্যান।

পনেরো মিনিট পর টেবিলের চারদিকে বসে গরম, ধূমায়িত কড়া কফির মগে চুমুক দিল ওরা।

চুলোয় গনগনে আগুন। লালচে আলো পড়েছে সবার মুখে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সবাইকে সাধল রানা। শাকুর খান নিল একটা, কিন্তু বরকতউল্লাহ ইতস্তত করল, কি ভেবে নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

গরম কফি খেয়ে ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেল। পকেট থেকে একটা ম্যাপ

বের করে টেবিলে মেলে দিল শাকুর। 'এই পথে যেতে হবে আমাদেরকে।' নখ দিয়ে রেখা টানল সে ম্যাপের ওপর। 'রোড দিয়ে গাড়ি করে যেতে পারলে মাত্র এক বেলার রাস্তা। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ী পথে যেতে হবে আমাদের।' ম্যাপে আঙুল রেখে দেখাতে লাগল সে পথটা। রানীর মনে হলো এ পথের শেষ হবে না কোনদিন। 'ঠিক এই জায়গাটায় আমরা বর্ডার ক্রস করব,' বলে চলল শাকুর। 'বর্ডারটা কি রকম বলি শুনুন। প্রথমে ওয়াচ টাওয়ারের কথা বলি। প্রতি দু'শো গজে একটা করে ওয়াচ টাওয়ার। প্রত্যেকটা ওয়াচ টাওয়ারে আছে কমপক্ষে তিনজন লোক, একটা মেশিনগান, সিগন্যাল রকেট, সার্চলাইট আর রেডিও টেলিফোন। আশেপাশের গাছ, ঝোপ ইত্যাদি কেটে সাফ করা আছে পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত, যাতে ওয়াচ টাওয়ারের লোকেরা পরিষ্কার দেখতে পায় সামনেটা। প্রথম বাধা কাঁটাতারের বেড়া। অ্যালার্ম সিগন্যাল রয়েছে সেই তারের সাথে জোড়া। এরপর একফালি চওড়া জমি, মাটির নিচে অ্যান্টিপার্সোনেল মাইন পোঁতা। এরপর দ্বিতীয় বেড়া, ইলেকট্রিফায়েড। শুনে মনে হয় এই সাংঘাতিক বাধা ডিঙোবার চেষ্টা করা বাতুলতা...আসলেও তাই, যদি ঠিক রাস্তাটা জানা না থাকে। ব্যাপারটা হচ্ছে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মত। যদিও যথেষ্ট বিপদ রয়েছে, তবু এমন একটা জায়গা আছে, যেখান দিয়ে পার হয়ে যেতে পারব আমরা, ইন্‌শাল্লাহ। একটা পরিত্যক্ত কয়লা খনির ভেতর দিয়ে পৌঁছে যাব একেবারে বর্ডারের কাছাকাছি। বেশ কিছুদিন আগে আমি সাতজনের একটা দলকে পার করে দিয়েছি ওই পথে আফগানিস্তানে। তবে ওদের পেছনে পুলিস ছিল না, ওয়াচ টাওয়ারকেও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়নি। আমাদের বেলায় ওরা ঠিক কতখানি সতর্ক থাকবে, কতখানি তৎপর থাকবে তার ওপর নির্ভর করবে আমাদের সাফল্য। নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না, আশাবাদী মন নিয়ে কাজে নামাই ভাল, কি বলেন, মি. মাসুদ রানা?'

ম্যাপটা দেখা শেষ করে মুখ তুলে শাকুরের দিকে তাকাল রানা। হাসল। 'একশোবার। আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

'অন্তত তিন-চার দিন এখানেই থাকব আমরা,' বলল শাকুর। 'ইতিমধ্যে গোটা সীমান্তকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এদিকের সৈন্যদের সম্পর্কে খুব ভাল জানা আছে আমার–সব অল্পবয়সী। বড়জোর একটা সপ্তাহ সতর্ক থাকবে তারা। তারপর বিরক্ত হয়ে ঢিল দেবে। ঠিক সেই সময় আমরা পার হয়ে যাব সীমান্ত।'

'তিন-চার দিন এখানে থাকা কি নিরাপদ?'

'আমি তো তাই মনে করি। দেড় বছর আগে তৈরি করেছি এটা। কাকপক্ষীও জানে না এর খবর। আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক, আমাদেরকে পালাতে হবে এদেশ ছেড়ে। এখান থেকে চমৎকার নজর রাখা যাবে ওদের গতিবিধির ওপর, অথচ কিছুতেই টের পাবে না ওরা এতটা কাছে রয়েছি আমরা।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল। 'নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া যাক। আমরা তিনজন পুরুষ পাহারা দেব। প্রত্যেকে চারঘণ্টা করে। প্রথমে আমি।'

'ঠিক আছে,' সমর্থন করল শাকুর। 'তারপর আমি। আমার পর মি. বরকতউল্লাহ।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এগিয়ে গেল বরকতউল্লাহ কানিজার পেতে দেয়া

বিছানার দিকে।
শেষ রাতে বেশ শীত পড়ে, তাই চুলোটা চালু রাখার জন্যে আরও কয়েকটা কাঠ পুরে দিল শাকুর।
নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রানা বাইরে।

একটা পুলিস কারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তারিক আখতার। সিকান্দার বিল্লাহ সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
'মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ওরা, স্যার। কুকুরগুলো গন্ধ পাচ্ছে না, অনুসরণও করতে পারছে না। খুব বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়ই ওরা, কিন্তু ঠিক কোনদিকে যে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।'
সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তারিক আখতারের।
'কাজটা তোমার।' গলায় তীব্র জ্বালা তার। 'লোকের কমতি নেই তোমার। গাড়িটা যখন রেখে গেছে, হাঁটা পথে যাবে ওরা। রাস্তা ব্যবহার করবে না। সব কথা তোমাকে শিখিয়ে দেয়ার দরকার করে না।' তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সিকান্দার বিল্লার দিকে। 'খুঁজে বের করো ওদের। পেশাওয়ার যাচ্ছি আমি, জরুরী কাজ আছে।' গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ি ব্যাক করার হুকুম দিল সে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, 'কাল সকালে তিনটে হেলিকপ্টার আসবে কম্বিং অপারেশন চালাতে। চষে ফেলতে হবে পাহাড়গুলো। কোনরকম ত্রুটি যেন না হয়, দেখো।'
গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই মুচকি হাসি ফুটে উঠল সিকান্দার বিল্লার ঠোঁটে। গত আটটা বছর মানুষ শিকার করেছে সে একের পর এক। পৃথিবীর কোথাও গিয়ে লুকিয়ে নিস্তার পায়নি কেউ ওর হাত থেকে। রানাও পাবে না। বহু বছর ধরে মাসুদ রানার নাম শুনে আসছে সে, একবার দু'বার দেখাও হয়েছে—কিন্তু সে দূর থেকে দেখা। লোকটা ছিল কিংবদন্তির মত। এবার মুখোমুখি হবে সে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক কালের সেই নায়কের সাথে। মনে মনে দারুণ খুশি সে এইজন্যে। রানার বিরুদ্ধে সে—ভাবতেই নিজেকে অনেক বড় মনে হচ্ছে ওর। লোকটা বুদ্ধিমান, সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর বিশ্বাস, বুদ্ধির চেয়ে অনেক বড় হচ্ছে প্রবল শক্তি। বুদ্ধি দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে মাসুদ রানা বিপুল বিক্রম এক প্রচণ্ড শক্তিকে? একটা গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্র কাজ করছে ওর বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে কতদূর যাবে ও এই পাহাড়ী অঞ্চলে?
ব্রিগেডিয়ারের উতলা হওয়ার কারণ বোঝে সে। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে তারিক আখতার। সেই জন্যেই সর্বক্ষণ ভয় পাচ্ছে, পাছে রানা হাত ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। ও জানে, ভয়টা অমূলক। কিছুতেই পালাতে পারবে না এবার রানা। কিংবদন্তির দুর্ধর্ষ নায়কের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে সে এবার।
দিল মোহাম্মদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ।
'আপনি মোটা মানুষ অযথা হাঁসফাঁস করছেন। বকা দেয়ার লোক নেই, কাজেই সেঁটে ঘুম দিন গিয়ে একটা। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখা করবেন

আমার সাথে।' খুশি মনে শুতে যাচ্ছিল দিল মোহাম্মদ, ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। 'আর শুনুন, ক্যাপ্টেন জায়িদকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।'

ক্যাপ্টেন জায়িদ তরুণ। অয়্যারলেসে খবর পেয়ে এসেছে কোহাট থেকে। বয়স বড়জোর তেইশ কি চব্বিশ। সিকান্দার বিল্লার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ভাগ্যবান মনে করছে নিজেকে। প্রায় দৌড়ে এসে হাজির হলো।

'আমার সাথে এসো।' জায়িদকে নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল সিকান্দার বিল্লাহ। মেঝের ওপর বড়সড় একটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ বিছাল। কম্পাস বের করে সূচটা বিঁধাল ফার্ম হাউসের গায়ে, তারপর পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের একটা বৃত্ত আঁকল ম্যাপের ওপর।

'দুটো বিকল্পের কথা বিবেচনা করতে হবে আমাদেরকে,' প্রফেসারী ভঙ্গিতে শুরু করল সিকান্দার বিল্লাহ মুগ্ধ ভক্ত পেয়ে। 'হয় ওরা প্রথম সুযোগেই সীমান্তের দিকে রওনা হবে, নয়তো আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকবে–যতদিন না ওদেরকে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আমার ধারণা, অপেক্ষা করবে ওরা। এই সার্কেলের মধ্যেই কোথাও লুকাবে ওরা। হেলিকপ্টার নিয়ে আগামীকাল এই এলাকাটা সার্চ করা হবে। তোমার কাজ হচ্ছে পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলা। একটা খরগোশও যেন তোমার বেড়া ডিঙিয়ে বেরোতে না পারে। বুঝেছ?' চেয়ারে উঠে বসল সে ম্যাপটা ছেড়ে। 'ভাল করে দেখে নাও ম্যাপটা। কাজটা থরো হওয়া চাই–যত সৈন্য লাগে লাগাও। বুঝতে পেরেছ কথা?'

'ইয়েস, স্যার!' হুমড়ি খেয়ে পড়ল জায়িদ ম্যাপের ওপর, আঙুল দিয়ে মাপ নিল ব্যাসের, স্কেল দেখে বুঝে নিল কয় মাইল বেড় দিতে হবে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চাইল সিকান্দার বিল্লার মুখের দিকে। 'একটা মশা, মাছি বা পিঁপড়েও বেরোতে পারবে না, স্যার। এলাকাটা ভাল মত চেনা আছে আমার। কাল সকাল আটটার মধ্যেই পজিশন নেবে আমার লোক।'

মাথা নাড়ল সিকান্দার বিল্লাহ।

'আটটা অনেক দেরি হয়ে যায়। ছ'টার মধ্যে পজিশন নিতে হবে তোমাদের। পারবে না?'

'পারব, স্যার।'

স্যালিউট ঠুকে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন জায়িদ।

ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি খেলে গেল সিকান্দার বিল্লার ঠোঁটে।

দুই

কোটের সবকটা বোতাম এঁটে নিল বরকতউল্লাহ, কিন্তু শরীরের কাঁপুনি থামল না। বেশ জোর শীত পড়েছে ভোর রাতে এই পাহাড়ী অঞ্চলে। বুড়ো হাড়ে শীতটা একটু বেশিই লাগছে। ঠাণ্ডা একটা পাথরের ওপর বসে চেয়ে রয়েছে সে নিচের কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকার দিকে। চারটে থেকে বসে আছে, এখন বাজে সাড়ে ছ'টা। বারবার পুব আকাশের দিকে চোখ যাচ্ছে ওর, কখন সূর্য উঠবে, কখন চারপাশ

গরম হয়ে উঠবে সেই আশায়। কষ্ট হচ্ছে বলে মনে মনে রানাকে গাল দিচ্ছে সে.। কায়দা করে ওকে ভোর রাতে শীতের মধ্যে পাহারায় ফেলেছে ব্যাটা। লোকটাকে কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না ওর। যেমন সুঠাম দেখতে, তেমনি তেজ–বয়সও কম! ভয় ডর বলতে কিছুই নেই। তার ওপর করিৎকর্মা। এইসব বেপরোয়া লোকের প্রতি মেয়েরা খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়, জানে সে। রানীর মধ্যেও পরিবর্তন এসে গেছে, টের পাচ্ছে সে, ও স্বীকার করুক আর নাই করুক। ত্রাণকর্তা, দেবতা বলে ধরে নিয়েছে রানী লোকটাকে। রানী এবং রানা নাম দুটো পাশাপাশি ভাবতে গিয়ে অদ্ভুত একটা মিল পেল বরকতউল্লাহ। রানা মানে রাজা। অর্থাৎ, ওরা দু'জন রাজা ও রানী–শুধু যে নামের মিল তা নয়, পাশাপাশি দাঁড়ালে দু'জনকে মানায়ও বেশ। কথাটা মাথায় আসতেই খিঁচড়ে গেল ওর মনটা। কেড়ে নিচ্ছে লোকটা রানীকে ওর কাছ থেকে। করার কিছুই নেই ওর।

চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল সে। গুনে দেখল, আর মাত্র পাঁচটা আছে। একটু ইতস্তত করল কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ধরাল একটা।

ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার কুঁড়েঘরটার দিকে চাইল। নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। ঘুমাচ্ছে সবাই। পুব আকাশের দিকে চাইল একবার, আবার দৃষ্টি চলে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকার দিকে। ঘন কুয়াশার চাদর পরেছে গাছগুলো, অস্পষ্ট, অবাস্তব ঠেকছে চোখে। ভয়ের মৃদু দোলা অনুভব করল সে বুকের মধ্যে। নিশ্চয়ই আর্মি পাঠাবে ওরা। তন্নতন্ন করে খুঁজবে পাহাড়গুলোর প্রতিটা ইঞ্চি। ধরা ওদের পড়তেই হবে, দু'দিন আগে হোক বা পরে।

ধরা পড়বার মুহূর্তটা চোখের সামনে দেখতে পেল সে পরিষ্কার। কুঁচকে উঠল গালদুটো। ডান হাতটা আপনিই চলে এল পিস্তলের বাঁটে। পরমুহূর্তে মনে পড়ল গুলিগুলো কেড়ে নিয়েছে মাসুদ রানা। সৈন্যরা ঘিরে ধরলে যে আত্মহত্যা করবে সে উপায়ও নেই ওর এখন।

লম্বা করে টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল বরকতউল্লাহ। ঠাণ্ডা পাথরের ওপর যতটা সম্ভব আরাম করে বসার চেষ্টা করল নড়েচড়ে। পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল বহু দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনে।

ফর্সা হয়ে আসা আকাশে আবছা বিভীষিকার মত দেখতে পেল সে হেলিকপ্টারটা। বেশ অনেকটা দূরে। গাছের ওপর দিয়ে উড়ে এইদিকেই আসছে ওটা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ। বুকের ভিতর লাফালাফি শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। বাঁদিক থেকে গর্জন ভেসে এল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে আরেকটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল সে। রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল কুঁড়েঘরটার দিকে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছার আগেই দড়াম করে খুলে গেল কুঁড়েঘরের দরজা, বাইরে বেরিয়ে এল রানা, পিছনে শাকুর।

'ভেতরে ঢুকে পড়ুন,' বরকতউল্লাহকে খোলা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ধমকে উঠল রানী। 'জলদি!'

একলাফে ঘরের ভিতর চলে গেল বরকতউল্লাহ।

কাছেই একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা ও শাকুর। দেখতে পেল

সোজা এগিয়ে আসছে একটা আর্মি হেলিকপ্টার।

‘চেষ্টার ক্রটি রাখবে বলে মনে হয় না। কি বলেন?’ বলল রানা।

‘কুঁড়েঘরটা খুঁজে পাবে না ওরা,’ শান্ত কণ্ঠে বলল শাকুর। ‘গাছ-পালা দিয়ে এমন ভাবে ছাওয়া যে পাঁচহাত ওপর দিয়ে উড়ে গেলেও টের পাওয়ার উপায় নেই। যতক্ষণ এই খোঁজাখুঁজি চলে ততক্ষণ আমাদের চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হবে। নড়াচড়া করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করাই ভাল।’

হেলিকপ্টারের আওয়াজ বেড়ে গেল কয়েকগুণ। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ওটা! বেশ অনেকটা উঁচু দিয়ে উড়ছে। ক্রমে কমে এল কর্কশ আওয়াজটা।

শাকুর খানের চোখের দিকে চাইল রানা। ভয়ের লেশমাত্র নেই সেখানে।

‘আদাজল খেয়ে লেগেছে,’ বলল শাকুর। ‘অপারেশনের স্কেল দেখে বোঝা যাচ্ছে ওদের কাছে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ লোক আপনি। চলুন কফি খাওয়া যাক।’

গাছের আড়ালে আড়ালে ফিরে এল ওরা কুঁড়েঘরে। পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে রানী ও কানিজা, কোণে চুলোর পাশে কম্পিত হাত সেঁকছে বরকতউল্লাহ।

‘আমাদের ধরা অত সহজ নয়,’ হাসিমুখে বলল শাকুর। ‘কফি কি হয়ে গেছে?’

‘এক্ষুণি চড়াচ্ছি।’ স্বামীর আশ্বাস পেয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে চুলোর দিকে চলে গেল কানিজা। রানার দিকে এগিয়ে এল রানী।

‘আপনার কি মনে হয় পালাতে পারব আমরা?’ নিচু অন্তরঙ্গ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানী।

‘একশোবার!’ অভয় দেয়ার জন্যে হাসল রানা। ‘রাতে চলব দিনে লুকিয়ে থাকব। চারদিনের জায়গায় বড় জোর আট দিন লাগবে, এর বেশি কিছু নয়।’ চোখে চোখ রাখল রানা। ‘আমি যতক্ষণ আছি, কোন চিন্তা নেই আপনার।’

খানিক ইতস্তত করল রানী, চোখ নামাল, আবার চাইল রানার চোখে।

‘তা জানি…কিন্তু সত্যি করে বলুন তো কতক্ষণ পারবেন টিকে থাকতে? সত্যিই কি আপনি মনে করেন এদের হাত গলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব?’

‘নিশ্চয়ই,’ রানীর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা। ‘কঠিন হবে, কৌশল খাটাতে হবে অনেক–কিন্তু সম্ভব। দেখবেন, শেষ পর্যন্ত ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা।’

কয়েক সেকেন্ড রানার কঠোর আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে চেয়ে থেকে কানিজাকে সাহায্য করতে গেল রানী। বরকতউল্লার দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা ওর মনের অবস্থা। মুচকি হেসে দরজার কাছে চলে এল সে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে লক্ষ রাখছে ওখানে শাকুর।

‘মোট তিনটে হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে,’ বলল শাকুর।

‘রাতে পথ চলতে হবে আমাদের। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ল্যান্ডফোর্সও ব্যবহার করবে ওরা।’

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ চিন্তা করল শাকুর খান। তারপর বলল, ‘আমরা যে ঠিক কোনদিকে গিয়েছি সেটা বোঝার উপায় নেই ওদের। কাজেই কি করবে? ফার্মহাউসটাকে ঘিরে বিরাট এক বৃত্ত তৈরি করবে সৈন্য দিয়ে, চারপাশ থেকে

চাপতে চাপতে ছোট করে আনবে বৃত্তটা। ভাবছি...' কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে শাকুরকে।

রানা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল একটা এগিয়ে আসা হেলিকপ্টারের শব্দে। গাছের মাথা ছুঁয়ে আসছে এবার ওটা। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সরাসরি এইদিকেই আসছে।

'আগুনটা নিভিয়ে ফেলা দরকার,' বলল রানা। 'তেমন ধোঁয়া হচ্ছে না, কিন্তু এত নিচ দিয়ে আসছে যখন, টের পেয়ে যেতে পারে ধোঁয়ার আভাস।'

কপি নামিয়ে গোটা কয়েক চাপাতি গরম করে ফেলল কানিজা, আগুন নিভিয়ে ফেলা হলো সাবধানে। যে যেখানে পারল বসে পড়ল দু'টো করে চাপাতি আর এক খাবলা করে হালুয়া নিয়ে। ঘরের বাতাস পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেছে যেন বিপদের আভাস পেয়ে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা, এগিয়ে আসছে হেলিকপ্টার, সরে যাচ্ছে দূরে! কর্কশ শব্দটা অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমে।

হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ওটা! দমকা হাওয়ায় এক গোছা চুল সামনে চলে এল রানীর। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সামলে নিল।

ভয়ে তামাটে হয়ে গেছে বরকতউল্লার মুখটা। ঘামে ভিজে চকচক করছে গলা দিয়ে নামছিল না কিছুই, তবু খাওয়ার চেষ্টা করছিল সে, এবার বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রাখল রুটি। কাঁপা হাতে তুলে নিল কফির মগ।

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে রানীর বাঁ হাতটায় চাপ দিল রানা।

'ঘরটা দেখে ফেলল নাকি?' জিজ্ঞেস করল কানিজা ওর স্বামীকে।

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল শাকুর খান। 'যে স্পীডে পেরিয়ে গেল তাতে কিছু দেখতে পাওয়ার কথা না।' বিরাট এক কামড় দিল সে প্যাঁচানো রুটিতে, তারপর হাউ হাউ করে বলল, 'যে প্যাটার্নে খুঁজছে ওরা, মনে হয় আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে আর আসবে না এদিকে।'

ঠক্ করে কফির মগটা নামিয়ে রাখল বরকতউল্লাহ।

'আসবে না বললেই হলো?' চেঁচিয়ে উঠল সে। ভয়ের চোটে কণ্ঠস্বর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ওর। 'ওরা বলেছে যে আর আসবে না? এক্ষুণি পালানো দরকার এখান থেকে। বুঝতে পারছেন না, এই লোকটার পাল্লায় পড়ে ফাঁদে আটকে গেছি আমরা?'

বরকতউল্লার কথার জবাব দিল না কেউ। হালুয়া রুটি শেষ করে কফিতে চুমুক দিল রানা।

'হালুয়াটা দারুণ বানিয়েছেন তো!' পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল সে। 'গাজরের না?'

'হ্যাঁ।' লজ্জিত হাসি হেসে কানিজা বলল, 'আরেকটু দিই?'

'না। কফিতে চুমুক দিয়ে ফেলেছি।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। 'নেক্সট্ টাইম।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ।

'আমার কথা কানে যাচ্ছে না কারও? আমি বলছি...ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা।'

'আমার তা মনে হয় না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'হেলিকপ্টারের অদ্ভুত একটা সাইকোলজিকাল এফেক্ট আছে। দেখলেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতে চায়।' ঘরের সবাই চেয়ে রয়েছে বরকতউল্লার দিকে। ভয়ে কাঁপছে লোকটা। রানা বলল, 'চলুন না, আপনি আর আমি খানিকটা ঘুরে ফিরে দেখে আসি বাইরেটা। কয়েকশো ফুট নিচে নামলেই চারদিকের হালহকিকত পরিষ্কার বুঝে নিতে পারব।' কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলুন। নিজের চোখে দেখলেই ভয় দূর হয়ে যাবে। আর সবাই এখানেই থাকুন, কেউ বেরোবেন না বাইরে।'

রানাকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আর সবার দিকে চাইল বরকতউল্লাহ। শাকুর এখান ওখান থেকে কফির মগ কুড়োচ্ছে, কানিজা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে, ভ্রু কুঁচকে কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানী ওর দিকে। খানিক ইতস্তত করে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে রানার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল সে।

ভোরের পবিত্র রোদে বেরিয়ে এসেই টের পেল ওরা–ফিরে আসছে হেলিকপ্টারটা। এক লাফে কেবিনে ফিরে যেতে গিয়েও থামল বরকতউল্লাহ, রানাকে গাছের ছায়ায় এগিয়ে যেতে দেখে কাঁপতে কাঁপতে চলল ওর পিছন পিছন। মাইল দেড়েক দূর দিয়ে চলে গেল হেলিকপ্টার উত্তর দিকে।

'কুঁড়েঘরটা দেখে থাকলে আর খোঁজাখুঁজি করত না ওরা,' বলল রানা। 'চলে আসুন।'

নামতে শুরু করল রানা। আরও দুটো হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছে ওরা অনেকটা দূরে। একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে। মিনিট দশেক নামার পর পৌঁছে গেল ওরা নিচের উপত্যকায়। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ফার্মহাউসটা, বহু নিচে।

রানা পর্যন্ত বেশ একটু ঘাবড়ে গেল নিচের কর্মতৎপরতার নমুনা দেখে। বিশ-পঁচিশটা আর্মি ট্রাক এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ফার্মহাউসের সামনে। একটা গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা।

'ট্রুপস্ ডেকেছে!' বলল বরকতউল্লাহ। নিচে সশস্ত্র সৈন্যদের চলাফেরা দেখে জিভ শুকিয়ে গেছে ওর। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। টপটপ ঘাম ঝরতে শুরু করেছে ওর চিবুক বেয়ে। ফিসফিস করে বলল, 'আমি আগেই বলেছিলাম! ফাঁদে পড়ে গেছি। ওই কুঁড়েঘরে বসে থাকা এখন আত্মহত্যার সামিল। ঘিরে ফেলেছে ওরা!'

একটা সিগারেট এগিয়ে দিল রানা লোকটার দিকে। কেমন যেন মায়া লাগল ওর বরকতউল্লার তীব্র আতঙ্ক দেখে। শান্ত গলায় বলল, 'কি করা যায় বলুন তো? নিন, ধরুন সিগারেটটা। এই অবস্থায় আপনার পরামর্শ কি? ভাল করে ভেবে বলুন।'

একটু ইতস্তত করে বাড়িয়ে ধরা সিগারেটটা নিল বরকতউল্লাহ, কিন্তু কাঁপুনির ঠেলায় আগুন ধরাতে পারল না। রানা আগুন ধরিয়ে দিতে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'পালাতে হবে! এখান থেকে এক্ষুণি পালানো দরকার আমাদের!' অনেক কষ্টে কম্পিত কণ্ঠস্বরটা নিচু রাখল সে।

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু তাহলে ওই যে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা

দেখে ফেলবে আমাদের। দিনের বেলায় সামান্য একটু নড়াচড়াও এড়াবে না ওদের চোখ।'

'তাহলে সন্ধে লাগার সাথে সাথেই পালাতে হবে আমাদের। পালাতেই হবে! ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয়।'

দু'জনেই শুনতে পেল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। খপ করে বরকতউল্লার হাত ধরে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিল রানা, নিজেও শুয়ে পড়ল। হেলিকপ্টারের পাখার ঝোড়ো হাওয়া লেগে সরসর করে কেঁপে উঠল মাথার ওপর গাছের পাতাগুলো। শুকনো পাতা আর ধুলোর ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি হলো। চুপচাপ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল দু'জন। দ্রুতবেগে চলে গেল ওটা মাথার উপর দিয়ে। কাঁপা গলায় কথা বলে উঠল বরকতউল্লাহ।

'আমাকে কাপুরুষ মনে করেছেন, তাই না? সত্যিই আমি কাপুরুষ। স্বীকার করি। এই ধরনের ভয়ঙ্কর অবস্থার সাথে কোন পরিচয় ছিল না কোনদিন, তাই যতটা নই তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে সবার কাছে। কিন্তু তাতেও আমার দুঃখ নেই।' প্রায় আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে বরকতউল্লাহ। 'এরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে জানলে কিছুতেই এসবের মধ্যে ঢুকতাম না কোনদিন। প্রথমে কি সহজ মনে হয়েছিল! তাছাড়া টাকাও দরকার ছিল আমার। একজন কাপুরুষের পক্ষে...'

'কাপুরুষ শব্দটা খারাপ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'তাছাড়া আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না। অভিজ্ঞতার অভাব–ব্যস, আর কোন দোষ নেই আপনার মধ্যে। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম আমি আপনার চেয়ে কম ভয় পাইনি। এখনও যতটা সাহসী ভাব দেখাই, তার নব্বই ভাগই অভিনয়। ভেতর ভেতর আমি যে আপনার চেয়ে কম ভয় পাই, তা আসলে নয়।'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চাইল বরকতউল্লাহ। বুঝতে পারল, টিটকারির কোন লক্ষণই নেই রানার মুখে। বলল, 'আপনাকে মানায়। আমার এই লাইনে আসা উচিত হয়নি। কাজটা সহজ ছিল, ছাত্ররা নানান তথ্য দিত আমাকে, কোনটা জ্ঞাতসারে, কোনটা অজ্ঞাতে। কিছু তথ্য সরাসরি টাকার বিনিময়ে কিনতাম। অনেক টাকা দিত আমাকে জটিলেশ্বর। সব জমিয়েছি আমি তেহরানের ব্যাঙ্কে।' কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ও টাকা খরচ করার সুযোগ হবে না আমার কোনদিন। আটকে গেছি ফাঁদে।'

'আমার তা মনে হয় না,' গলায় খুশি খুশি একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা। 'ওই যে পুতুলগুলো দেখছেন, গটমট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিচে, ওদের আমি খুব ভাল করেই চিনি। কচি খোকা ওরা–আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে বয়স। এককালে আমি ওদের মেজর ছিলাম। ওদের চোখে ঠিক ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যাব–একটু সাবধান হতে হবে, এই যা।'

'আমি অন্তর থেকে অনুভব করতে পারছি, আপনাদের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু আমি এর থেকে বেরোতে পারব না,' বলল বরকতউল্লাহ। 'মারা পড়ব আমি। যদি তাই হয়, তাহলে আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে আপনার।'

'আপনিও পালাতে পারবেন,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা।

'আমার সব টাকা যেন আমার মৃত্যুর পর রানী পায় সে ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। মাস ছয়েক আগেই। যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, কথাটা দয়া করে বলবেন আপনি ওকে। সব ব্যবস্থা করাই আছে। তেহরানের ব্যাঙ্কে গিয়ে শুধু নিজের পরিচয় প্রমাণ করলেই হবে। সব টাকা ওর। অনেক টাকা—পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

অবাক হয়ে বরকতউল্লার মুখের দিকে চাইল রানা।

'আপনি নিজেই বলুন না?'

'না না। হয়তো মুখের ওপর মানা করে দেবে রানী। প্রত্যাখ্যান করবে।' করুণ হয়ে এল বরকতউল্লার মুখটা। 'আমাকে ভালবাসে না ও। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একতরফা। কানাকড়িরও মূল্য নেই আমার ওর কাছে। হঠাৎ এই কথা বললে সঙ্কোচ বোধ করবে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর টাকাটা কাজে লাগবে ওর, খুশি হবে…আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া বা আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোন প্রয়োজন থাকবে না তখন।'

উঠে বসেছে রানা। কাঁধ ঝাঁকাল।

'এতখানি হতাশ হবেন না। আপনি টিকে যাবেন, ওসব চিন্তা দূর করে দিন মাথা থেকে।'

মন দিয়ে নিচের কর্মতৎপরতা লক্ষ করল ওরা কিছুক্ষণ। বারোটা সৈন্যভর্তি ট্রাক রওনা হয়ে গেল উভয় দিকে। এক দল ছড়িয়ে পড়ছে ফার্মহাউসের চারপাশে।

'ঘিরে ফেলেছে।' বলল বরকতউল্লাহ। 'চারপাশ থেকে এগিয়ে আসবে এক দল, আর এক দল মাঝখান থেকে ছড়াবে চারপাশে। কোন আশা নেই! পালানো দরকার এক্ষুণি!'

'কোন্‌দিকে যাবেন?' সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোন্‌দিক যাব মানে? কিছুই করব না আমরা, এমনি বসে বসে ধরা দেব?' চটে উঠল বরকতউল্লাহ! 'কিভাবে এড়াবেন ওদের?'

'সেটা ভেবে করতে হবে।' রানা লক্ষ করল প্রায় বারো মাইল দূরে নামছে একটা হেলিকপ্টার। এক সারি গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বড়সড় একটা মাঠের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে শর্টকাটে কি করে ওখানে পৌঁছানো যায় বুঝে নিল চারপাশে চোখ বুলিয়ে। মনে মনে এঁকে ফেলল একটা মোটামুটি ছক। উঠে দাঁড়াল সে।

'চলুন, ঘরে ফেরা যাক।'

পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল ওরা।

খুশিমনে সিগারেট টানছে সিকান্দার বিল্লাহ। সকাল সাতটা। সকালের রোদে বেশ আরাম লাগছে। সারারাত জেগে রয়েছে। কিন্তু রাত জাগার অভ্যাস আছে ওর। শিকারের সময় ঘুম আসে না। এবারের শিকারটা বেশ জমে উঠেছে। থেকে থেকে অদ্ভুত এক পুলকের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে ওর শরীরের মধ্য দিয়ে।

ভোর ছ'টায় পজিশন নিয়েছে ক্যাপ্টেন জায়িদের লোক। ছোকরা কাজের আছে। বয়সটা কম বলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে নিখুঁত ভাবে। আর

কেউ হলে বেলা ন'টার আগে কাজ শুরু করতে পারত না। এখন নিশ্চিন্তে ধরে নেয়া যায় ঘেরের মধ্যেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রয়েছে শিকার। ফার্মহাউসের চারপাশে বিশ মাইল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। ভোর ছ'টার আগে বিশ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। আটকা পড়েছে সন্দেহ নেই, এবার খুঁজে বের করার শুধু অপেক্ষা।

চারটে ডিম পোচ, পরিজ, বাটার টোস্ট আর তিন কাপ চা দিয়ে নাস্তা সেরে দিল মোহাম্মদকে ধমকধামক আর জায়িদকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে খুশি মনে এগোচ্ছে সে একটা হেলিকপ্টারের দিকে। ওটা নেমেছে রি-ফুয়েলিং এর জন্যে। এক পাক ঘুরে আসবে ওটায় চড়ে! জায়গাটা উপর থেকে দেখে নিলে কাজের সুবিধা হবে। তাছাড়া বলাও যায় না, কপালগুণে মিলেও যেতে পারে শিকার।

বেঁটেখাট, মোটাসোটা, কোঁকড়া চুল পাইলট, ইফতিখার খাওয়ার। কম বয়স–বাইশ কি তেইশ। সিকান্দার বিল্লাহকে খুশি করার জন্যে উন্মুখ। কাছে এগিয়ে আসতেই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড দুটো পেট্রল ট্যাঙ্কারকে পাশ কাটিয়ে হেলিকপ্টারের পাশে এসে দাঁড়াল সিকান্দার বিল্লাহ।

'কি? কোন খবর আছে?'

'না, স্যার!' হাতের ম্যাপটা মেলে ধরল ইফতিখার খাওয়ার। 'এই সেকশনটা কাভার করছি, এবার এই দিকটায় যাব।' বেঁটে মোটা একটা আঙুল দিয়ে বৃত্ত আঁকল সে ম্যাপের একটা অংশে। 'এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই।'

'যতদূর মনে হয় পাহাড়েই উঠেছে ওরা। সন্দেহজনক কিছুই পড়েনি তোমার চোখে?'

'না, স্যার···গাছপালা অতিরিক্ত···ভালমত দেখা যায় না ওপর থেকে।'

সামান্য একটা দ্বিধার আভাস পেল সিকান্দার বিল্লাহ পাইলটের কথায়।

'কিছুই পড়েনি চোখে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'তেমন কিছুই না, স্যার। এই পাহাড়ে সামান্য ধোঁয়া মত কি যেন দেখলাম একবার।' মোটা আঙুল ঠেকাল পাইলট ম্যাপের এক জায়গায়। 'দু'বার চক্কর দিয়ে বুঝতে পারলাম, চোখের ভুল।'

নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল সিকান্দার বিল্লার ভাঁজ ভাঁজ মুখে।

'তোমার চোখের ভুলটাই আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। চলো।'

পাইলটের পাশের সীটে উঠে বসল সিকান্দার বিল্লাহ, খাপ খুলে বের করল একটা শক্তিশালী বিনকিউলার। চামড়ার ফিতেটা পরে নিল গলায়।

'ঠিক কোন জায়গায় ধোঁয়া দেখেছিলে মনে আছে তো?' ইফতিখার খাওয়ার পাইলটের সীটে উঠে বসতেই জিজ্ঞেস করল বিল্লাহ।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মাথা ঝাঁকাল পাইলট।

'ইয়েস, স্যার। পরিষ্কার মনে আছে।'

সাঁ করে আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার নিচে একরাশ ধূলির ঝড় তুলে। এগোল দূরের পাহাড়ের দিকে, যেখানে কল্পনায় ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল ইফতিখার খাওয়ার।

তিন

'আমি ভাবছি, একটা হেলিকপ্টার দখলের চেষ্টা করলে কেমন হয়,' বলল রানা। একটা টুলে বসে সিগারেট ফুঁকছে সে, বাকি চারজন চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। 'প্রায় বারো মাইল দক্ষিণ-পুবে একটা মাঠে নামছে ওগুলো তেল ভরার জন্যে। আমরা যদি নিচে নেমে যাই, ওর একটা দখল করে নেয়া খুব কঠিন হবে না। চালাতে পারি আমি। অতি সহজে বর্ডার ক্রস করতে পারব তাহলে আমরা। যদি তার আগেই এয়ারফোর্সের জেট ধাওয়া করে, বর্ডারের কাছাকাছি নেমে পড়তে পারব অনায়াসে···কি মনে করেন?'

'চমৎকার!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল শাকুর খান। 'ফাসক্লাস আইডিয়া। ঢাল বেয়ে নামতে আমাদের বড়জোর দেড় থেকে দু'ঘণ্টা লাগবে। গুড! চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'অসম্ভব! নিচে গিজগিজ করছে হাজার হাজার সোলজার···নিজ চোখে দেখেছি আমি,' বলল বরকতউল্লাহ। মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'সারাটা জঙ্গল জ্যান্ত হয়ে উঠেছে···প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল।'

পকেট থেকে ছ'টা গুলি বের করে বেঞ্চের ওপর রাখল রানা। ঠেলে দিল বরকতউল্লার দিকে।

'বুঝলাম, জঙ্গল ভর্তি গিজগিজে সোলজার। কিন্তু সবাই একসাথে দেখতে পাচ্ছে না আমাদের। আমাদের সামনে পড়বে বড় জোর চার কি পাঁচজন। না-ও পড়তে পারে। যদি সামনে পড়ে যায়, গুলি ছুঁড়ে পথ করে নেব।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল বরকতউল্লাহ রানার মুখের দিকে। বলে কি লোকটা! রানী ওকে লক্ষ করছে টের পেয়ে গুলিগুলো ভরতে শুরু করল ম্যাগাজিনে। হাত কাঁপছে।

কানিজা বলল, 'গার্ড থাকবে হেলিকপ্টারের কাছে। দখল করে নেয়া সম্ভব বলে মনে করেন?'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?' বলল রানা। 'আমাদের সাথে দুটো পিস্তল আছে। কম না! যদি দেখি হেলিকপ্টার দখল করা সম্ভব নয়···'

'শুনতে পাচ্ছেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানী।

কান খাড়া করতেই সবাই শুনতে পেল এগিয়ে আসছে একটা হেলিকপ্টারের গুঞ্জনধ্বনি। যে যেমন ছিল তেমনি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কান পেতে শুনছে সবাই শব্দটা। রোটর ব্লেডের ফ্যাড়ফেড়ে কর্কশ শব্দটা যতই বাড়ছে, ততই দ্রুত হচ্ছে ওদের হৃৎপিণ্ডের গতি। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক অশুভ ছায়া এগিয়ে আসছে। দমকা হাওয়া এসে ঢুকল কুঁড়েঘরের খোলা দরজা দিয়ে, টেবিলের ওপর পাতা ম্যাপটা উড়ে গিয়ে দেয়ালে সেঁটে ফড়ফড় করছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে হেলিকপ্টারটা। ওদের মনে হলো ঠিক মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, কোন কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে হুড়মুড় করে পড়বে ওদের মাথার

ওপর। প্রত্যেকটা লোক আড়ষ্ট হয়ে গেছে–বরকতউল্লাহর চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানীর মুখ। কানিজা, শাকুর ও রানা যেন পাথরের মূর্তি। কুঁড়েঘরের বাইরে ঘূর্ণিঝড় উঠেছে ধুলো আর ছোট কাঁকরের। পরিষ্কার টের পেল ওরা–দুলছে গাছের ডাল, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে বাতাসের ঝাপ্টায়।

জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে সিকান্দার বিল্লাহ নিচের দিকে। পলকের জন্যে দেখতে পেল সে কুঁড়েঘরটা।

'আরেকটু নামাও,' বলল সে।

'বিপদ ঘটতে পারে, স্যার,' বলল ইফতিখার খাওয়ার। 'গাছগুলো...'

'খানিকটা ডান দিকে।'

সামান্য একটু ডান দিকে সরল হেলিকপ্টার।

এবার পাতার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল সিকান্দার বিল্লাহ ছোট্ট কুঁড়েঘরটা। ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'পাওয়া গেছে!'

অয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে ফার্মহাউসের অপেক্ষমাণ দিল মোহাম্মদকে কুটিরের অবস্থানটা জানাল সিকান্দার বিল্লাহ–ক্যাপ্টেন জায়িদকে জানাল কিভাবে কি করতে হবে। কথা শেষ করে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল সে পাইলটকে। বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেল হেলিকপ্টার, ধীরে ধীরে চক্কর দিচ্ছে কুঁড়েঘরটার মাথার ওপর।

'ওইখানেই লুকিয়ে রয়েছে ব্যাটারা। তোমার চোখ তো দারুণ হে, ছোকরা! ভাগ্যিস ধোঁয়া দেখেছিল কল্পনায়!'

হেলিকপ্টারটা উপরে উঠে যেতেই কথা বলল রানা, 'দেখে ফেলেছে। কোন সন্দেহ নেই। এইবার সরে পড়তে হবে আমাদের।'

'আমি বলেছিলাম!' অপ্রকৃতিস্থের মত চেঁচিয়ে উঠল বরকতউল্লাহ। 'আমি আগেই বলেছিলাম! তখন শুনল না কেউ আমার কথা...ধরা পড়ে গেছি এবার। খোদা!'

ওর দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'মিছেই চ্যাঁচাচ্ছেন। ধরা পড়িনি আমরা এখনও। ধরা অত সহজ নয়। চলুন।'

দুই মিনিটেই তৈরি হয়ে গেল সবাই রওনা হওয়ার জন্যে।

'আমরা ওই ময়দানটার দিকেই নামতে শুরু করব এখন,' বলল রানা। 'এখানে ওদের এসে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে–কাজেই ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমি যাব প্রথম, আমার পরেই শাকুর, তারপর রানী আর কানিজা, বরকতউল্লাহ সাহেব সবার পিছনে। সবাই রেডি? চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

'বিসমিল্লাহির রাহমানুর রহিম!' বলল কানিজা।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় দ্বিতীয় উপত্যকায় নামতে শুরু করল ওরা। ধীরে ধীরে নামছে রানা। মাথার ওপর হেলিকপ্টারের গর্জন। চক্রাকারে ঘুরছে কুঁড়েঘরের ওপর। ঝোপঝাড় ভর্তি সরু পথ বেয়ে নিচে নেমে থামল রানা।

'এইখানে দাঁড়ান আপনারা, গাছের নিচে,' কথাটা বলেই সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রানা সামনে। নিচের দিকে চেয়েই ছোটখাট একটা লাফ দিল ওর কলজেটা। শাকুরের ফার্মহাউসটা দেখা যাচ্ছে। মাঠের ওপর দিয়ে বারো-চোদ্দটা ট্রাক ছুটে আসছে পাহাড়ের দিকে। যতদূর সম্ভব এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল ট্রাকগুলো। ঝপাঝপ নামছে ওগুলোর ভিতর থেকে সশস্ত্র সৈন্য। দ্রুত উঠতে শুরু করল ওরা পাহাড় বেয়ে। আন্দাজে বুঝে নিল রানা, সৈন্যের সংখ্যা দুশোর কম হবে না।

ইশারায় ডাকল রানা শাকুরকে।

'ওই দেখুন, আসছে। ওদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। কাজটা করতে হবে নিঃশব্দে। কি বুঝছেন? রাজি?'

গম্ভীর শাকুর। উত্তেজনার প্রকাশ শুধু চঞ্চল দুটো চোখে। মাথা ঝাঁকাল।

'এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই,' বলল সে।

'যা করবার করতে হবে আমাদের দু'জনকেই। বরকতউল্লাহ বেকার, ওকে দিয়ে কিছু হবে না।'

আবার মাথা ঝাঁকাল শাকুর।

'চলুন, তাহলে রওনা হওয়া যাক।' বাকি তিনজনের দিকে ফিরল রানা। 'আমি আর শাকুর যাচ্ছি আগে। তিন মিনিট পর আপনারাও নামতে শুরু করবেন পিছু পিছু। যদি গোলমাল দেখেন, দাঁড়িয়ে পড়বেন। অলরাইট?'

'ঠিক আছে,' বলল রানী।

বরকতউল্লার দিকে চাইল রানা।

'গুলি করে বসবেন না। গুলির শব্দ পেলেই বুঝে যাবে ওরা—আমরা ঠিক কোনখানটায় আছি।'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করল বরকতউল্লাহ, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। চোখের কোলে কালি, ফ্যাকাসে মুখ, ঘামছে দরদর। মাথা ঝাঁকাল শুধু।

শাকুরের কাঁধে দুটো টোকা দিয়ে নামতে শুরু করল রানা। ঠিক সেই সময়ে অনেক উঁচু থেকে বিনকিউলার দিয়ে সিকান্দার বিল্লাহ দেখতে পেল রানাকে।

'ওই যে! পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল বিল্লাহ! 'নিচে নামাও!' কথাটা বলেই মাইক্রোফোনটা টেনে নিল সে মুখের কাছে। দিল মোহাম্মদকে জানাল ব্যাপারটা! বলল, 'আরও লোক পাঠান এদিকে! নামছে ওরা। আমি আছি মাথার ওপর।'

অনেক নিচে নেমে এসেছে হেলিকপ্টার। গাছের ডালপালা দুলছে ঝোড়ো হাওয়ায়, সরে যাচ্ছে মাথার ওপর থেকে। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা দু'পাশের দুই জানালা দিয়ে সরাসরি ওর দিকে চেয়ে রয়েছে সিকান্দার বিল্লাহ ও পাইলট। এক সেকেন্ডও দ্বিধা করল না রানা। শোলডার হোলস্টার থেকে ঝট করে বেরিয়ে এসেছে ওর ওয়ালথার পি.পি.কে। দুই সেকেন্ডের মধ্যে চারটে গুলি করল সে ওপর দিকে। থারটি-টু ক্যালিবারের বুলেট ফুটল তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে, হেলিকপ্টারের কর্কশ শব্দ ছাপিয়ে, ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলল শব্দগুলো এ-পাহাড় ও-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। গুলির শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বহু নিচে সৈন্যরা।

মাথার উপর থেকে সরে গেল হেলিকপ্টার। ডান কাঁধে গুলি খেয়েছে

ইফতিখার খাওয়ার, দাঁতে দাঁত চেপে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের দিকে ছুটল সে। কলকল করে গরম রক্ত নেমে আসছে ওর হাত বেয়ে। এবার আর কল্পনায় নয়, সত্যিই ধোঁয়া দেখছে সে চোখে।

গোটা তিনেক জঘন্য গালি বেরিয়ে এল সিকান্দার বিল্লার মুখ থেকে।

'জখমটা কি রকম? খুব খারাপ?' কটমট করে চাইল সে পাইলটের মুখের দিকে।

'ডান হাতটা···অবশ হয়ে গেছে, স্যার···' ব্যথায় কুঁচকে গেছে ওর মুখটা। 'ল্যান্ড করতে পারব মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে মানে?' ধমকে উঠল বিল্লাহ। 'পারতেই হবে। মন শক্ত করে নাও! বেঁকে যাচ্ছ কেন!'

কাৎ হয়ে যাচ্ছিল হেলিকপ্টারটা, আবার সোজা করে নিল ইফতিখার খাওয়ার।

'গুলি না করে উপায় ছিল না,' বিমর্ষ বদনে বলল রানা। পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিল হোলস্টারে। 'আপাতত বাঁচা গেছে গঙ্গা ফড়িংটার হাত থেকে। না তাড়ালে যেখানেই যেতাম না কেন, মাথার ওপর বসে থাকত ওটা, নড়ত না। এখন ওরা পরিষ্কার জেনে গেছে আমরা ঠিক কোথায় আছি, কোন্ পথে নামছি। কাজেই ফিরে যেতে হবে আমাদের। ওরা আশা করবে নামতেই থাকব আমরা। আসলে পাহাড়ের মাথায় উঠে অন্য পাশ দিয়ে নামব আমরা এবার।'

মিনিট তিনেক উপরে ওঠার পর দেখা পেল ওরা বাকি তিনজনের। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

'ফিরতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'আমার পিছন পিছন আসুন আপনারা।'

এগিয়ে গেল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে অনুসরণ করল ওকে ভীত সন্ত্রস্ত বরকতউল্লাহ, রানী ও কানিজা। সবশেষে আসছে শাকুর। কুঁড়েঘরটা ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে ওরা যত দ্রুত সম্ভব।

এমনি সময় আরেকটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল ওরা। এগিয়ে আসছে।

সিকান্দার বিল্লাহ ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের দিকে ফিরতে ফিরতেই নির্দেশ দিয়েছিল দিল মোহাম্মদকে যেন আরেকটা কপ্টার পাঠিয়ে দেয় ওখানে। হুকুম পেয়ে ছুটে আসছে সেটা।

পাহাড়ের গায়ে গজ বিশেক জায়গা ফাঁকা, তারপর আবার গাছপালার ছাউনি। ছোট্ট দলটা যখন মাঝখানে পৌঁছেছে ঠিক তখনি বাজপাখির মত সাঁ করে নেমে এল হেলিকপ্টারটা। পাইলটের পাশে বসা একজন সোলজার। রানাদের দেখা মাত্রই চালু করে দিল অটোমেটিক রাইফেল।

কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্-কট্।

আশেপাশে পাথরের গা থেকে চল্টা উঠিয়ে নিয়ে বিঙ্ শব্দ তুলে যত্রতত্র ছিটকে চলে গেল গুলিগুলো। ঝট্ করে শুয়ে পড়ল সবাই। মাটিতে ঝাঁপ দিয়েই চিৎ হলো রানা। অনেকটা নেমে এসেছে হেলিকপ্টারটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

চিৎকার করে পাইলটকে কি যেন বলছে সোলজার। খুব সম্ভব গুলি করার সুবিধার জন্যে একটু পাশ ফিরতে বলছে। সময় নেই। পাইলটের মাথায় লক্ষ্য স্থির করে অতি সাবধানে. ধীরে ধীরে চাপ দিল সে ট্রিগারে। হেয়ার ট্রিগার–দুই সেকেন্ডেই ছুটে গেল গুলি। মুহূর্তে মৃত্যু ঘটল পাইলটের। বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ঢুঁশ খেল মাথাটা। নিয়ন্ত্রণহীন যন্ত্রদানব এক বস্তা সিমেন্টের মত আছড়ে পড়ল নিচে পাহাড়ের গায়ে। ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে আরও নিচে। দাউ দাউ জ্বলছে আগুন।

'উঠে পড়ুন! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

আছড়ে পাছড়ে উঠতে শুরু করল ওরা আবার। মিনিট দশেক কারও মুখে কথা নেই।

হেলিকপ্টারটা যেখানে ক্র্যাশ করেছিল সেখান থেকে ঘন সাদা ধোঁয়া উঠছে উপরে। সামান্য একটু বাতাস থাকায় ধোঁয়াটা উঠছে ওদের থেকে একটু দূর দিয়ে। হঠাৎ থেমে গেল রানা। চাইল শাকুরের দিকে।

'দাবানল শুরু হলো নাকি?'

নিচের দিকে চেয়েই মাথা ঝাঁকাল শাকুর।

'হ্যাঁ। শুনুন...'

আবছা ভাবে কানে এল রানার লেলিহান শিখার গর্জন। জ্বলন্ত গাছগুলো থেকে মড়মড় শব্দ আসছে। বাড়ছে ক্রমে। ধোঁয়াটাও ঘন হয়ে উঠছে আরও। খেয়াল করলে আগুনের আঁচও অনুভব করা যায়।

'ভাগ্যিস বাতাসটা ওইদিকে বইছে!' বলল রানা। 'আগুনটা ওপরে উঠে এলে বিপদ হত। ওপাশে নেমে গেলে আর ভয়ের কিছুই নেই, কিন্তু ততক্ষণ বাতাসের গতি না আবার উল্টে যায়।' বরকতউল্লার দিকে ফিরল সে। 'আপনার পিস্তলটা শাকুরকে দিন।'

ভীত-সন্ত্রস্ত বরকতউল্লাহ খানিক ইতস্তত করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বের করে দিল পিস্তলটা।

'আগে আগে যাব আমরা দু'জন,' বলল রানা। 'চলুন, পা বাড়ান।'

পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছার আগেই ঘন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশটা। নিচে নামতে নামতে রানা ভাবল, ছাতার মত রক্ষা করবে ধোঁয়াটা ওদের, গাছের ছায়া খুঁজতে হবে না আর, হেলিকপ্টার থেকে দেখার উপায় নেই বলে সবচেয়ে সোজা পথে নেমে যেতে পারবে ওরা এখন।

যতই নিচে নামছে ততই কাঠ ফাটার কড়কড় মড়মড় শব্দ বাড়ছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাগছে আগুন। সেটা থেকে আরেকটায়। হুহু হুহু একটা ভয়ঙ্কর শব্দ। প্রচণ্ড উত্তাপের আঁচ লাগছে মাঝে মাঝে।

বাকি তিনজনকে বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে রানা ও শাকুর সরু পাহাড়ী পথ বেয়ে, কখনও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কখনও ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচের উপত্যকার দিকে।

মিনিট বিশেক নামার পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা। এতই হঠাৎ যে শাকুর ধাক্কা খেল ওর পিঠে।

'কান পেতে শুনুন।'

দাবানলের তীব্র শব্দ ছাপিয়ে হালকাভাবে শুনতে পেল ওরা কুকুরের ডাক। দু'জন চাইল দু'জনের চোখের দিকে।

'ঠিকই শুনেছেন,' বলল শাকুর। 'ট্রেনিং পাওয়া কুকুর!' শাকুরের ঘর্মাক্ত মুখটা উদ্বিগ্ন। 'সোজা এগোলে ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়ব।'

'কিন্তু নামতেই হবে আমাদের,' বলল রানা। 'প্ল্যান করে ফেলা যাক। আমি নেমে যাব, তিন মিনিট পর নামবেন আপনি। ওদের তিনজনকে বলবেন, যেন আরও তিন মিনিট অপেক্ষা করে তারপর নামে।'

রানার নেতৃত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে শাকুর খান। কোন প্রশ্ন না তুলেই মাথা ঝাঁকাল। নামতে শুরু করল রানা। খুবই সাবধানে নামছে সে এবার, সতর্ক দৃষ্টিতে সামনেটা জরিপ করে নিয়ে। আড়াল পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর: বড় বড় পাথরের চাঁই, গাছ, হঠাৎ হঠাৎ বুক সমান উঁচু ঘাসের গুচ্ছ। কিন্তু এর ফলে সামনেটা বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। পিস্তল হাতে সন্তর্পণে নেমে চলেছে। ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে কুকুরের ডাক।

একটা ঘন ঝোপের পাশে দাঁড়াল রানা। কয়েক হাত নিচেই একটা বারো ফুট চওড়া রাস্তা, তার পরেই জঙ্গল। এদিক ওদিক চেয়ে একটু ইতস্তত করে রাস্তায় নামতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ইঞ্জিনের শব্দে থেমে গেল। এগিয়ে আসছে শব্দটা। কয়েক হাত পিছিয়ে দাঁড়াল একটা গাছের আড়ালে।

একটা হাফ-ট্রাক। চারজন ছোকরা সোলজার বসে আছে অটোমেটিক রাইফেল হাতে। গোঁ গোঁ শব্দ তুলে চলে গেল হাফ-ট্রাকটা। স্টীলের হেলমেটগুলো ঝিক করে উঠল রোদ লেগে। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে হাফ-ট্রাকটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর ঢালু পাড় বেয়ে পিছলে নেমে এল রাস্তায়। এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে দু'মিনিট। আরেকটা হাফ-ট্রাকের ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল সে, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওপারে চেয়ে দেখল নেমে আসছে শাকুর খান।

হাফ-ট্রাকের আওয়াজ টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শাকুর। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখল দু'জন: বুনো শুয়োরের মত একরোখা ভঙ্গিতে চলে গেল আরেকটা হাফ-ট্রাক। হাতের ইশারায় যেখানে আছে সেখানেই থাকতে বলল রানা শাকুরকে। আবার রাস্তা পেরিয়ে উঠে এল ওপরে।

'আপনি এখানেই থাকুন। ওরা পৌঁছলে সাবধানে পার করে দেবেন রাস্তাটা। আমি এগোচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল শাকুর।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে দ্রুত নেমে যাচ্ছে রানা।

শাকুর অপেক্ষা করছে বাকি তিনজনের জন্যে।

কুকুরের আওয়াজটা বাড়ছে ক্রমে।

কোনমতে নামাল ইফতিখার হেলিকপ্টারটাকে। জোরে ঝাঁকুনি খেল ওটা নামতে

গিয়ে। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল সে একপাশে। দরজা খুলে লাফিয়ে নিচে নামল সিকান্দার বিল্লাহ।

ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড পাহারা দিচ্ছে তিনজন সৈনিক। ছুটে এল ওরা। চোখমুখ উত্তেজিত।

'ওকে বের করে আন্!' হুকুম করল বিল্লাহ। কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখাল সে পিছনে পাইলটের দিকে। 'জখম হয়েছে।'

এ ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় না করে ছুটল সে অপেক্ষমাণ জীপের দিকে।

ভিতর ভিতর হোঁচট খেল সে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারকে দেখে। জীপের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে তারিক আখতার। লক্ষ করছে একটা হেলিকপ্টারকে। নীল আকাশ থেকে কড়কড় করে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ। ভ্রু কুঁচকে উঠল ব্রিগেডিয়ারের। চাইল বিল্লার মুখের দিকে।

'কি করছে ব্যাটারা?' কড়া গলায় জানতে চাইল তারিক আখতার। 'ওদের ওপর গুলি ছুঁড়ছে?'

আকাশের দিকে চাইল সিকান্দার বিল্লাহ। হালকা ভাবে কানে এল একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ। চোখের সামনে দেখতে পেল ওরা বাঁকা হয়ে গেল হেলিকপ্টারটা, তারপর সাঁ করে নেমে এল নিচে। পাহাড়ের গায়ে গোত্তা খেয়ে ডিগবাজি দিল, তারপর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল ওটা। দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল জঙ্গলটা।

'রানা!' চাপা গলায় বলল তারিক আখতার। 'গর্দভ কোথাকার! তোমাকে বলে দিয়েছিলাম না, সরাসরি আক্রমণ করতে যেয়ো না মাসুদ রানাকে?' ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রাগে বিকৃত হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের মুখটা। 'শুরু হলো দাবানল! বাতাস বইছে উল্টোদিকে—কচুও হবে না ওদের! কি করছ তুমি, বিল্লাহ? এতক্ষণেও ধরতে পারলে না ওদের?'

ঘর্মাক্ত মুখটা মুছল বিল্লাহ।

'পালাতে পারবে না, স্যার। একটু সময় লাগবে এই যা। ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদের।'

'এতক্ষণেও ধরতে পারোনি কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'আগুনটার দিকে চেয়ে দেখো একবার, কিরকম ছড়াচ্ছে চারদিকে। ওপরে উঠবে কি করে এখন জোয়ানরা?'

'ওরাও তো আর নামতে পারছে না, স্যার,' বলল বিল্লাহ। 'অন্তত এদিক দিয়ে নয়। পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে নামতে হবে ওদের। পাঁচশো জোয়ান অপেক্ষা করছে ওদিকে ওদের জন্যে। সেই সাথে আছে গোটাবিশেক ব্লাড হাউন্ড। ধরা ওদের পড়তেই হবে, বস্।'

সিগারেট বের করে ধরাল সিকান্দার বিল্লাহ।

'ওদের মেরে যেন ফেলা না হয়,' বলল ব্রিগেডিয়ার জীপের গায়ে হেলান দিয়ে। 'জ্যান্ত চাই আমি ওদের।'

'মাসুদ রানার মত একটা লোককে জ্যান্ত ধরব কি করে, স্যার?' অবাক হয়ে চাইল বিল্লাহ তারিক আখতারের মুখের দিকে। 'ওটা অসম্ভব ব্যাপার।'

'জ্যান্ত চাই!' গর্জে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'ওদের প্রত্যেককে। যেন মারা না যায় সেটা দেখতে হবে তোমার। এটা চীফের হুকুম। জানা গেছে জরুরী তথ্য আছে ওদের কাছে। এ তথ্য পাকিস্তানের দরকার।' ব্র্যাগানযা হোটেলে ফেলে আসা রানার সুটকেসটা পরীক্ষা করেই টের পেয়েছে ওরা, গোপন কোন তথ্য এনেছিল রানা সুটকেসে করে–লাইনিং কেটে বের করে নেয়া হয়েছে সেটা।

'আগে বলেননি কেন?' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল বিল্লাহ ব্রিগেডিয়ারের মুখের দিকে। কথা না বাড়িয়ে দৌড় দিল সে একটা গাছের নিচে দাঁড়ানো রেডিও ট্রাকের দিকে।

শূন্য দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল তারিক আখতার। হু হু করে বাড়ছে কমলা রঙের শিখাগুলো, ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। কাঁচা কাঠ ফাটার মড়মড় শব্দ আসছে। বিশাল ছাতার মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমে ছেয়ে ফেলছে আকাশটা। এতদূর থেকেও আগুনের আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট।

নরক হয়ে উঠছে জঙ্গলটা।

উত্তর-পশ্চিম দিকেও ধোঁয়া ভেসে এসেছে বাতাসে। হালকা কুয়াশার মত দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মাথায়। আবছা হয়ে গেছে রোদ।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে রানা পিস্তল হাতে। চোখে সদা সতর্ক দৃষ্টি।

কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুটা বাঁয়ে। বহুদূর থেকে কাঠ ফাটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। ঢাল বেয়ে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল কাছেই। আরও কয়েক পা এগিয়ে দেখল রানা জঙ্গল শেষ হয়ে এসেছে–সামনে ধোঁয়াটে রোদ দেখা যাচ্ছে ফাঁকা জায়গায়। চারপাশ দেখে নিয়ে আরও কয়েক পা এগোল সে। জঙ্গলের শেষ সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

'এটা আবার কি রকম কথা হলো, স্যার?' পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে উঠল একজন। 'ধরতে হবে, কিন্তু মারতে পারবে না। যদি গুলি করে?'

কণ্ঠস্বর লক্ষ করে এগোল রানা চিলের ছায়ার মত নিঃশব্দে।

'গুলি করলে গুলি খাবে,' উত্তর এল। 'অর্ডার ইজ অর্ডার। নো শূটিং।'

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। এবার দেখতে পাচ্ছে ওদের পরিষ্কার। একটা ঝোপের আড়ালে তেরপল ঢাকা আর্মি ট্রাক দাঁড়িয়ে। তিনজন জোয়ান রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটেনশন হয়ে–নির্দেশ দিচ্ছে একজন ছোকরা নায়েব সুবাদার। চারজনই সশস্ত্র।

চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে পিছিয়ে গেল রানা। দূর থেকেই দেখতে পেল সে শাকুর খানকে। ঠোঁটে আঙুল রেখে প্রথমে চুপ করার ইঙ্গিত করে হাতছানিতে ডাকল কাছে। পিস্তল হাতে পাশে এসে দাঁড়াল শাকুর।

হাঁফাচ্ছে।

'চারজন সোলজার আর একটা ট্রাক পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'ট্রাকটা দখল করে নিতে পারলে ওদের ইউনিফরম পরে বর্ডারে চলে যেতে পারব মনে হয়। কি বলেন?'

মাথা ঝাঁকাল শাকুর খান। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল পিস্তলের।

'পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা পাঞ্জাবী ভাষায়।

'পারি।' হাসল শাকুর। 'কিন্তু একটু অন্য রকম টান রয়েছে, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

'ঠিক আছে। চলবে এতে। আপনি ওদের সামনে যাবেন, আমি কাভার করব পেছন থেকে। অবস্থা বেগতিক দেখলে আপনি বাঁ দিকের দু'জনকে মারবেন, আমি মারব ডানদিকের দু'জনকে। তবে গুলির দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। ছেলে ছোকরা একেবারে। ধমক দিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল শাকুর খান। পিছন পিছন জঙ্গলের শেষ সীমানা পর্যন্ত এল রানা, দাঁড়াল একটা গাছের আড়ালে।

অনুমতির জন্যে রানার চোখের দিকে চাইল শাকুর। চোখ টিপল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল এগোবার জন্যে।

এক লাফে চার হাত নিচে রাস্তায় নামল শাকুর খান।

'খবরদার! কেউ নড়বে না একচুল!'

মনে হলো ইলেকট্রিক শক খেয়েছে চারজন। স্থির হয়ে গেল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে শাকুরের দিকে চাইল নায়েব সুবাদার। চেহারায় যেটুকু বা রক্তের আভাস ছিল, শাকুরের অগ্নিমূর্তি আর হাতের পিস্তলটা দেখে উবে গেল বেমালুম। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

'হাতিয়ার ফেল!' গর্জে উঠল শাকুর।

কি করবে সে ব্যাপারে নায়েব সুবাদারকে একটু ইতস্তত করতে দেখে নড়ে উঠল রানা। চট্ করে চোখ তুলেই দেখতে পেল লোকটা, আরেকজন দুশমন এবং আরেকটা পিস্তল চেয়ে আছে ওর দিকে। বিনা বাক্যব্যয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিল চায়নিজ স্টেনটা। বাকি সবাই অনুসরণ করল নেতাকে।

'মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও!'

ঘুরে দাঁড়াল সবাই।

নেমে এল রানা। অস্ত্রগুলো ট্রাকে তুলে সার্চ করল সবাইকে। আর কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না কারও কাছে। কাপড় খুলে ফেলার হুকুম দিল সে ওদের। ত্রস্ত হাতে ইউনিফরম খুলতে শুরু করল ওরা।

বরকতউল্লাহ্, রানী আর কানিজা এসে পৌঁছল। চাওয়ার আগেই রাকস্যাক থেকে একগাছি শক্ত রশি বের করে ছুঁড়ে দিল কানিজা রানার দিকে। ঘ্যাচ ঘ্যাচ কেটে চার টুকরো করে ফেলল রানা সেটা। শাকুর খান অনর্গল গাল দিয়ে চলেছে ওদের চোদ্দগুষ্টি তুলে—সেই ফাঁকে একে একে সব ক'টার হাত-পা বেঁধে ফেলল রানা শক্ত করে। তারপর দু'জন মিলে ঝপাঝপ তুলে ফেলল ওদের ট্রাকের

পিছনে।

'যদি কারও গলা দিয়ে একটা টুঁ শব্দ বেরোয়,' শাসাল রানা, বরকতউল্লার হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিল, 'এই সাহেব ভয়ঙ্কর লোক! একেবারে জবাই করে ফেলবে! সাবধান!'

সাত মিনিটের মধ্যেই রওনা হলো ওরা। শাকুর এবং রানার পরনে পাকিস্তান আর্মির ইউনিফরম। বরকতউল্লাহ এবং কানিজার হাতেও অটোমেটিক রাইফেল। ওরা তিনজন ট্রাকের মেঝেতে বসে আছে, নায়েব সুবাদারের ইউনিফরম পরে রানা বসে আছে ড্রাইভারের পাশের সীটে, আর্মি পোশাক পরা শাকুর চালাচ্ছে ট্রাক। চায়নিজ স্টেনটা রাখা রয়েছে রানার উরুর ওপর।

'কোন্‌দিকে চলেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার আগে। একটু আগে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নেব।'

'ভেরি গুড। আরেকটু আস্তে চালান। তাড়াহুড়ো নেই আমাদের।'

মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাওয়া গেল। গতি একটু কমিয়ে দিল শাকুর।

বাঁয়ে ঘুরেই দেখা গেল ধুলো উড়িয়ে একটা জীপ আসছে দ্রুতবেগে।

'একটা জীপ আসছে! লুকিয়ে পড়ুন!' ড্রাইভিং কেবিনের পিছনের চৌকোণ ফাঁকা জায়গা দিয়ে আদেশ করল রানা।

ঝটপট শুয়ে পড়ল ওরা। একটা ত্রিপল টেনে ঢেকে ফেলল সবক'টা শরীর।

জীপের ড্রাইভারের পাশে একজন লম্বা চওড়া লেফটেন্যান্ট বসে আছে, পিছনে দু'জন জোয়ান। হাত তুলে থামতে বলল অফিসার ট্রাকটাকে। দাঁড়িয়ে পড়েছে জীপ। ব্রেক চেপে থেমে দাঁড়াল শাকুর।

চোখ পাকিয়ে কটমট করে চাইল লেফটেন্যান্ট শাকুরের দিকে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' পাঞ্জাবীতে জিজ্ঞেস করল সে।

কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে রানার দিকে চাইল শাকুর। রানা এপাশে ঝুঁকে এসে একটা স্যালিউট করল।

'অর্ডার, স্যার,' বলল রানা। 'ডিভিশনাল কমান্ডারের অর্ডারে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি।'

জীপ থেকে নেমে এল লেফটেন্যান্ট।

রানা লক্ষ করল পিস্তলের সেফটি ক্যাচ সরিয়ে দিল শাকুর খুট করে। হাতটা নিচু করে রেখেছে, মুখে কোন ভাবান্তর নেই।

'কে তোমার ডিভিশনাল কমান্ডার?' খেঁকিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট।

'কর্নেল সালেম,' বলল রানা।

নামটা শুনেই দু'পা পিছিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

'তাহলে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বুড়বাক্ কাহিঁকে,' ধমকে উঠল সে। 'যাও, আগে বাড়ো!'

গিয়ার দিল শাকুর। জীপটাকে পাশ কাটিয়ে রওনা হয়ে গেল ট্রাক।

'কর্নেল সালেমটা কে?' বেশ কিছুদূর এসে জিজ্ঞেস করল শাকুর হাসিমুখে।

'জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো নামটা বলতেই!'

'খুব হারামী অফিসার। নামটা জানা ছিল, কাজে লাগিয়ে দিলাম।' পিছনের ফোকরে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার বেরোতে পারেন আপনারা।'

ট্রাক চালনায় মন দিল শাকুর খান। মিনিট পাঁচেক পর বলল, 'আর একটু পরেই বড় রাস্তায় পড়ব আমরা। ওখান থেকে নব্বই মাইল মত হবে বর্ডার।'

বড় রাস্তায় এসে প্রচুর আর্মি ট্রাক, জীপ দেখতে পেল ওরা। গোঁ-গোঁ করে ছুটে যাচ্ছে উল্টোদিকে। জ্বলন্ত পাহাড়ের দিকে চলেছে সবক'টা–একমাত্র ওদের ট্রাকটা যাচ্ছে পশ্চিমে। মোটা এক বয়স্ক সুবাদার মেজর চলন্ত জীপ থেকে মাথা বের করে চিৎকার করে কি যেন বলল, হাত নেড়ে রানাও যেন কিছু বলছে এমনি মুখ ভঙ্গি করল–কারও কথা কেউ বুঝল না, এগিয়ে গেল যার যার পথে।

একটা হেলিকপ্টার নেমে এল অনেক নিচে। এই ট্রাকটার উল্টো গতি দেখে পরীক্ষা করতে এসেছে। জানালা দিয়ে মাথা বের করল রানা, হাত নাড়ল। স্টীলের হেলমেট দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত নেড়ে দিয়ে সরে চলে গেল পাইলট হেলিকপ্টার নিয়ে।

কোহাট ছাড়িয়ে যেতেই আর্মি তৎপরতা কমে গেল অনেক। মাইল পঞ্চাশেক এগিয়ে হাঙ্গু-র কাছে একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেল রানা, দুটো হাফট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটজন সোলজার নিয়ে একজন সুবাদার।

'এই রে···আবার গোলমাল!' বলল শাকুর খান।

'তৈরি থাকুন,' বলল রানা। 'গোলমালটা সহজে না-ও মিটতে পারে।'

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে নিল ওরা ট্রাক থেমে দাঁড়াবার আগেই। এগিয়ে এল সুবাদার। স্যালিউট করে কর্নেল সালেমের নাম উচ্চারণ করল রানা। বলল, ওদেরকে থল্-এ গিয়ে পজিশন নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। দেরি করার উপায় নেই।

কাজ হলো। মাথা ঝাঁকিয়ে পিছনে সরে গেল সুবাদার, হাতের ইশারা করল হাফট্রাকের ড্রাইভিং সীটে বসা সোলজারকে; পিছনে সরে রাস্তা করে দিল হাফট্রাক।

রোড ব্লক থেকে বেরিয়ে সোজা ছুটল ওরা পশ্চিমে। ফুল স্পীড দিল শাকুর।

'মনে হচ্ছে পার পেয়ে গেলাম এ যাত্রা,' বলল শাকুর। 'সালেম লোকটা হারামী হতে পারে, কিন্তু বড় উপকারী হারামী।' হেসে উঠল সে নিজের রসিকতায়।

কিন্তু ওর জানা নেই, এই সুবাদারের ওপর সিকান্দার বিল্লাহর কড়া হুকুম রয়েছে, প্রত্যেকটা গাড়িঘোড়ার গতিবিধির রিপোর্ট করতে হবে সরাসরি তার কাছে।

ফার্মহাউসের বাইরের ঘরে অয়্যারলেস সেটের সামনে বসে রয়েছে স্বয়ং সিকান্দার বিল্লাহ। উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। থমথম করছে প্রকাণ্ড মুখটা।

চারদিক থেকে রিপোর্ট আসছে। 'এখনও কোন হদিশ নেই।' 'ধোঁয়ার জ্বালায়

কঠিন হয়ে পড়েছে অপারেশন চালানো।' 'আগুন দেখে ভয় পাচ্ছে কুকুরগুলো।' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ একটা চিকন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ডিভিশন সেভেন। একটা ট্রাক কর্নেল সালেমের অর্ডারে থল্-এর দিকে গেল পজিশন নিতে। ওভার।'

মুহূর্তে সোজা হয়ে বসল বিল্লাহ। একটা সুইচ টিপে মাইক্রোফোনটা হাতে দিল।

'ডিভিশন সেভেন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বিল্লাহর, 'মেসেজটা রিপিট করো। কর্নেল সালেম ছুটিতে। অপারেশন চালাচ্ছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মালেক।'

তিন সেকেন্ড পর আবার ভেসে এল চিকন কণ্ঠস্বর, 'রিপিট। একটা ট্রাক কর্নেল সালেমের অর্ডারে থল্-এর দিকে গেল পজিশন নিতে। ওভার।'

প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ টেনে নিল সিকান্দার বিল্লাহ।

'লোকেশনটা দাও।'

'স্কয়ার টেন···সিক্সটিন।'

গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে টের পেয়ে বিল্লাহর পিছনে এসে দাঁড়াল ব্রিগেডিয়ার।

আরেকটা সুইচ টিপল বিল্লাহ সরাসরি পাহারারত একটা হেলিকপ্টারের সাথে যোগাযোগের জন্যে।

'অপারেশনের এলাকা থেকে একটা ট্রাক অন্যদিকে চলে যাচ্ছে,' বলল বিল্লাহ। 'তুমি দেখেছ ওটাকে?'

'ইয়েস, স্যার,' উত্তর এল পাইলটের। 'দেখেছি। পশ্চিমে যাচ্ছিল ওটা। চেক করে ছেড়ে দিয়েছি।'

একটু ইতস্তত করে বিল্লাহ বলল,'স্ট্যান্ড বাই।' বলেই আরেকটা সুইচ টিপল। আরেকটা রোড ব্লকের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল দশ মিনিট আগে পার হয়ে গেছে একটা ট্রাক। পিছনে কি ছিল দেখা হয়নি, সামনে ছিল দু'জন পাঞ্জাবী সোলজার। কর্নেল সালেমের হুকুমে থল্-এর দিকে যাচ্ছে ওরা।

অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে আবার হেলিকপ্টারের সাথে যোগাযোগ করল বিল্লাহ।

'ওই ট্রাকটার পিছনে ধাওয়া করো!' চিৎকার করে বলল সে। 'স্কয়ার টেন···সিক্সটিন অথবা সেভেনটিন। খবরদার, হারিয়ে না যায়। ওটাকে দেখামাত্র রিপোর্ট করবে। বেশি কাছে যেয়ো না ওটার।'

'তার মানে তোমার বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেছে ওরা!' আগুন ঝরছে ব্রিগেডিয়ারের চোখ থেকে। 'খুব চালাকি করতে গিয়েছিলে··· খুব দেখিয়েছ! দারুণ এফিশিয়েন্সি! তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমি, বিল্লাহ···'

চার

শাকুরের নির্দেশে থল্-এ পৌঁছবার আগেই মেইন রোড ছেড়ে বাঁ দিকের একটা সরু গলিপথে ঢুকে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরও যখন মাথার ওপর থেকে নড়ল না

হেলিকপ্টারটা, তখন কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ট্রাকের গতি সামান্য একটু কমিয়ে বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, ওটা আমাদের ওপরই নজর রাখছে।'

গত আধঘণ্টা ধরে রানাই চালাচ্ছে ট্রাকটা। শাকুর মন দিয়ে ম্যাপ দেখছে, মাইল মিটার দেখে হিসেব রাখছে দূরত্বের। হেলিকপ্টারটাকে অনেকখানি উচ্চতা বজায় রেখে মাথার ওপর অধিষ্ঠিত দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। এত করেও ফাঁকি দেয়া গেল না ব্যাটাদের চোখ। এখন বিনা কষ্টে ট্রাকে চেপে বর্ডার পেরোবার আর আশা নেই, সেই আগের প্ল্যানে ফিরে যেতে হচ্ছে আবার। অর্থাৎ, কষ্ট আছে কপালে।

'বর্ডারের ষোলো মাইলের মধ্যে চলে এসেছি আমরা,' বলল সে। 'এটুকু রাস্তা কষ্ট করে পায়ে হাঁটতে হবে। আগামী নয় ঘণ্টার মধ্যে বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করা যাবে না। কাজেই কাছাকাছি কোথাও ট্রাকটা ছেড়ে দিয়ে আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথেই এগোব। কি বলেন?'

'আমি রাজি,' বলল রানা। 'কোথায় থামতে হবে বলবেন।'

হেলিকপ্টারটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে রানাকেও। কোন সন্দেহ নেই, হেলিকপ্টার থেকে ওদের অবস্থান জানিয়ে অনর্গল রিপোর্ট যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। কোহাট থেকে আর্মি মুভ করতে শুরু করেছে অনেক আগেই, সমস্ত রোড ব্লক ছেড়ে সবার প্রতি ওদের পিছনে ধাওয়া করারও হুকুম হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, হয়তো প্যারাট্রুপারও নামতে পারে। এখন যত শীঘ্রি সম্ভব ট্রাকটা ছেড়ে লুকিয়ে পড়া দরকার।

'প্রায় এসে গেছি,' ম্যাপ দেখে বলল শাকুর। 'আরেকটু আগে যান···হ্যাঁ, এইখানে থামান।'

গলিটা সরু। দু'পাশ থেকে দুটো গাছ যেখানটায় কোলাকুলি করছে, তার নিচে থেমে দাঁড়াল রানা।

নেমে পড়ল ওরা পাঁচজন। গায়ে এঁটে থাকা ইউনিফরমটা খুলে নিজের পোশাক পরে নিল রানা। চায়নিজ স্টেনটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে। শাকুর ও বরকতউল্লাহ নিল দুটো রাইফেল। কানিজা নিল বরকতউল্লার পিস্তলটা। পুরুষ তিনজনের পিঠে একটা করে রাকস্যাক।

'খুব জলদি হাঁটতে হবে আমাদের,' বলল শাকুর। 'ঘণ্টা দেড়েক কষ্ট করতে হবে, তারপর প্রচুর সময় পাওয়া যাবে আরাম করার। কাজেই পা চালান সবাই, ওরা কিন্তু আসছে পিছু পিছু।'

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এগোল ওরা। সুটকেসটা ট্রাকে ফেলে আসতে হয়েছে বলে বার বার দুঃখ করছে বরকতউল্লাহ, শেষ পর্যন্ত থামল ধমক খেয়ে। আধ ঘণ্টায় রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা সরে এল ওরা। তারপর চলল উত্তর-পূর্ব দিকে। ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী পড়ল পথে। বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়।

'সাথে করে কুকুর আনতে পারে ওরা। এইবার সুযোগ পাওয়া গেছে একটা। সরাসরি নদী পেরোব না আমরা। আধ মাইল ভাটিতে গিয়ে তারপর ওপারে উঠব।'

হাঁটু পানিতে নেমে স্রোতের অনুকূলে হাঁটতে শুরু করল ওরা। রানার কাঁধ ধরে হাঁটছে রানী, ক্লান্তিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়বার দশা হয়েছে ওর, তবু পা চালিয়ে যাচ্ছে কোনমতে। দূর থেকে ভেসে আসছে হেলিকপ্টারের আওয়াজ। ট্র্যাকের ওপর চক্রাকারে ঘুরছে ওটা, খুঁজছে ওদের। বুঝে গেছে ট্র্যাক ছেড়ে নেমে পড়েছে ওরা।

দশ মিনিট এইভাবে হাঁটার পর বহুদূর থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল ওরা। শব্দটা কানে যেতেই সড়াৎ করে পা পিছলে পানিতে পড়ল বরকতউল্লাহ। চুপচুপে ভেজা কোট-প্যান্ট নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে দ্রুত পা ফেলে ছাড়িয়ে গেল সে রানাকে। উৎকণ্ঠায় শিরা ফুলে গেছে কপালের, মুখ চুন।

আরও দশ মিনিট পানি ভেঙে চলার পর নদীটা পার হলো ওরা। একটা গাছের ডাল ধরে তীরে উঠে হাত বাড়িয়ে কানিজাকে টেনে তুলল শাকুর, তারপর তুলল বরকতউল্লাহ ও রানীকে।

তীরে উঠে আবার কুকুরের গর্জন শুনতে পেল ওরা। এবার খানিকটা কাছে, কিন্তু এখনও বেশ দূরে আছে ওগুলো। দ্রুত পা চালাল ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

বিশ মিনিট এক নাগাড়ে হাঁটার পর শাকুর বলল, 'এসে গেছি প্রায়। আর কিছুদূর গিয়েই বিশ্রাম নেয়া যাবে।'

একটা সরু জংলা পথ ধরে আধ মাইল এগিয়ে হঠাৎ বাঁ দিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। মাইল খানেক কাঁটা ঝোপের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে এগোবার পর থামল শাকুর।

'কাছাকাছিই কোথাও একটা এয়ার শ্যাফ্ট আছে। খনিতে বাতাস ঢোকার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল সেই ব্রিটিশ আমলে। খুঁজে বের করতে হবে ওটা। ওই পথেই ঢুকব আমরা খনির ভেতর। আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।' জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল রানী। মনে হচ্ছে পা দুটো পাথর হয়ে গেছে ওর। পরিশ্রান্ত বরকতউল্লাহ ধুঁকছে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। কানিজা বসল রানীর পাশে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে রানা। বহু দূর থেকে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত গুনগুন শব্দ আসছে হেলিকপ্টারের, কিন্তু কুকুরের গর্জন অনেক কাছে চলে এসেছে। এক একটা ডাক শুনলে লাফ দিয়ে কলজেটা বেরিয়ে যেতে চায় বুক থেকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল শাকুর।

'পেয়েছি। চলে আসুন।'

হাত ধরে টেনে তুলতে হলো রানীকে। কাঁটা ঝোপ বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে এগোল ওরা। একটা বহুদিনের অব্যবহৃত পায়ে চলা পথ পাওয়া গেল। সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে আবার রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলল শাকুর। দু'মিনিট পরই প্রকাণ্ড ইঁদারার মত একটা গর্ত পাওয়া গেল।

'এইটা,' বলল শাকুর। 'বেশি গভীর না। ঢালু হয়ে নেমে গেছে কয়লা খনিতে। সাবধানে নেমে আসুন আমার পিছু পিছু। ভেতরটা পিছলা।'

একে একে নামল সবাই। টানেলের মধ্যে বিশ কদম এগোতেই আঁধার হয়ে

এল। একটা মোমবাতি জ্বালল রানা। পাথুরে গুহার গা থেকে টিপ টিপ পানি পড়ে পিছল হয়ে রয়েছে মেঝেটা।

আরেকটা মোমবাতি জ্বালল শাকুর। বলল, 'এখানে আর কি আঁধার দেখেছেন, খনিতে চলুন, তারপর দেখবেন আঁধার কাকে বলে। চলুন, এগোনো যাক। যার যার মাথা সামলে চলবেন, গুঁতো মেরে পাথর ফাটাবেন না আবার। লম্বা পথ চলতে হবে আমাদের।'

সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পা বাড়াল শাকুর।

কয়েক মিনিট এইভাবে চলার পর বড়সড় একটা গুহায় এসে পৌঁছল ওরা। রাইফেল আর রাকস্যাক নামিয়ে রেখে বসে পড়ল শাকুর আল্লার নাম নিয়ে।

'ব্যস, এবার আরাম করুন সবাই। বেশি ভেতরে গেলে বাতাস কমে আসবে। তার চেয়ে এখানেই দু'দিন জিরিয়ে নিই তারপর ধীরে সুস্থে পেরোব আমরা বর্ডার। আজই বর্ডার ক্রসের চেষ্টা করা ঠিক হবে বলে মনে করি না। আপনি কি বলেন?' রানার দিকে চাইল শাকুর।

'আপনি যা বলেন,' মৃদু হাসল রানা। 'কিভাবে কোথা দিয়ে পার হবেন জানা থাকলে মতামত দিতে পারতাম। যাই হোক, এই গুহা থেকে বেরোচ্ছি কি করে?'

'কয়লা খনির একটা মুখ গিয়ে উঠেছে একেবারে আফগান বর্ডারের কাছে।' ফুঁ দিয়ে নিজের মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল শাকুর। 'একটাই যথেষ্ট। আপনারটা জ্বলুক।'

বসে পড়ল সবাই। শুয়ে পড়ল বরকতউল্লাহ। চোখ দুটো একেবারে বসে গেছে বেচারার।

'এবার কিছু খেয়ে নিলে মন্দ হত না,' বলল রানা।

কাজে লেগে গেল কানিজা।

ওরা পাঁচজন যখন খাওয়ায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় তর্ক উঠল ফার্মহাউসে। রানারা ঠিক কোথায় ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে জানতে পেরে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে তারিক আখতার। সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে, আর্মি রওনা হয়ে গিয়েছে–সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছে সিকান্দার বিল্লাহ, তবু সন্তুষ্ট হতে পারছে না সে। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসে টেবিলের ওপর থেকে ম্যাপ উড়ে যাওয়ার উপক্রম।

'বর্ডারের আট মাইলের মধ্যে রয়েছে ওরা!' বলল সে।

'তাতে কি?' বলল বিল্লাহ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে। 'প্যারাট্রুপার নামাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সমস্ত বর্ডার পোস্ট সতর্ক। অত চিন্তা করছেন কেন?'

'চিন্তা করছি তোমাদের এফিশিয়েন্সি দেখে।' ঝাঁঝিয়ে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'পারলে ওদের ঠেকাতে? বেরিয়ে গেল না আঙুলের ফাঁক গলে?'

'এর জন্যে দায়ী আমি, না আপনি, স্যার?' সরাসরি ব্রিগেডিয়ারের চোখে চোখ রাখল স্পষ্টবাদী বিল্লাহ। 'জ্যান্ত ধরতে হবে! আপনার ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্যে মারতে দেননি আপনি ওদের। নিজ হাতে মারবেন বলে। আপনার এই দুর্বলতার সুযোগে পালিয়ে যেতে পারছে ওরা। নইলে অনেক আগেই ট্রাকটা উড়িয়ে দিতাম আমি ওপর থেকে গ্রেনেড ফেলে। আপনারই আদেশে ঘটেছে

এসব, স্যার, আমাকে দোষ দেবেন না। আপনিই হুকুম দিয়েছেন জ্যান্ত ধরতে হবে। তার মানে, গার্ডরা যদি দেখতে পায় সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা, বড়জোর দৌড়ে ধরার চেষ্টা করতে পারে, গুলি করতে পারবে না।'

এই সরাসরি আক্রমণের উত্তর দিল না তারিক আখতার, পাঁচ মিনিট উত্তেজিত পদক্ষেপে ধুপধাপ পায়চারি করার পর থামল বিল্লার সামনে এসে।

'ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা অস্বীকার করব না, বিল্লাহ। কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে ওদের কাছে। সাথে করে এনেছিল রানা, ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিকান্দার বিল্লাহ।

'সেক্ষেত্রে ওদের ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না, স্যার। অস্ত্র আছে এখন ওদের হাতে। বাধা দিলেই গুলি করবে। আপনার আদেশ অনুযায়ী ওদের গুলির কোন জবাব নেই। আমাদের লোকদের শুধু মরবার অধিকার দিয়েছেন আপনি, মারবার অধিকার নয়। জবাবদিহি যদি করতে হয়, আপনার করতে হবে, স্যার। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, মাসুদ রানাকে জ্যান্ত ধরা এক কথায় অসম্ভব। এখনও বলছি, আপনার এ আদেশ বলবৎ থাকলে ঠেকানো যাবে না ওদের, বর্ডার পেরিয়ে চলে যাবে ওরা।'

'কোন অবস্থাতেই বর্ডার পেরোতে দেয়া চলবে না,' বলল ব্রিগেডিয়ার।

'সেক্ষেত্রে আপনার হুকুমটা একটু পরিবর্তন করতে হবে, স্যার। যদি বলেন, সবাইকে জানিয়ে দিই আমি কথাটা।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে মন স্থির করল ব্রিগেডিয়ার।

'ঠিক আছে,' বলল সে শেষ পর্যন্ত। 'আগের অর্ডার ক্যান্সেল করে দাও। বলে দাও কিছুতেই যেন ওরা বর্ডার পেরোতে না পারে।'

নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল সিকান্দার বিল্লার মুখে।

'এতক্ষণে…এতক্ষণে কথা দিতে পারি, স্যার! পালাতে পারবে না ওরা। পঞ্চাশ জন স্নাইপার বর্ডারে পাঠিয়ে দিয়েছে দিল মোহাম্মদ। টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো লংরেঞ্জ রাইফেল নিয়ে বসে গেছে ওরা জায়গা মত। আর কোন চিন্তা নেই।' মাইক্রোফোনটা টেনে নিল মুখের সামনে। একটার পর একটা সুইচ টিপে চলেছে সে। 'জ্যান্ত বা মরা,' বলে চলল বিল্লাহ। 'আগের অর্ডার ক্যান্সেল। রিপিট: যে কোন অবস্থায় ঠেকাতে হবে ওদের। জ্যান্ত বা মরা।'

একটা সিগারেট ধরাল ব্রিগেডিয়ার। বলল, 'আমি চললাম ওখানে। দিল মোহাম্মদ গাধা একটা—ওর ওপর ভরসা করি না। নিজের চোখে দেখতে চাই আমি কতদূর কি হচ্ছে।'

'যেতে পারেন, স্যার,' বলল বিল্লাহ। 'তবে কষ্টটা বৃথা যাবে, আপনি পৌঁছবার আগেই ধরা পড়ে যাবে ওরা।'

বিল্লাহকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রিগেডিয়ার। সোজা গিয়ে উঠল একটা অয়্যারলেস ফিট করা জীপে। বিনা বাক্যব্যয়ে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

'দেড় ঘণ্টায় পৌঁছতে পারবে থল্-এ?' প্রশ্ন করল সে ড্রাইভারকে।

'আড়াই ঘণ্টা, স্যার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ড্রাইভার। 'রাস্তাঘাট ভাল না।

পাহাড়ী রাস্তা, বিপদ হতে পারে যে কোন সময়ে।'

'দেড় ঘণ্টা!' ধমকে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'এক মিনিট দেরি হলে চাকরি যাবে।'

'সেটা ভালই হবে, স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'আপনার প্রাণ যাওয়ার চেয়ে আমার চাকরিটা যাওয়া অনেক ভাল। এতবড় একজন অফিসারের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারব না আমি।'

সোজা সাপ্টা উত্তর শুনে কয়েক সেকেন্ড থ হয়ে গেল তারিক আখতার, তারপর হাসল।

'ঠিক আছে, বাবা। যত তাড়াতাড়ি পারো চালাও।'

লেফটেন্যান্ট আসলাম গোলা এক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, সোজা এসে দাঁড়াল জীপে বসা ক্যাপ্টেন জায়িদ আর স্পেশাল পুলিস সুপার দিল মোহাম্মদের সামনে। খটাশ করে বুট ঠুকে স্যালিউট করল।

অল্পবয়সী এই লেফটেন্যান্ট অল্পদিনেই দুর্দান্ত সাহসী আর একগুঁয়ে বলে নাম কিনে ফেলেছে। এর চলনে বলনে স্পষ্ট বোঝা যায়, অনেক ওপরে উঠবে এ একদিন, রিটায়ার করবে একজন জেনারেল হিসেবে। পাতলা-সাতলা, চটপটে, কর্মতৎপর।

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল দিল মোহাম্মদ।

মোটাসোটা দিল্ল মোহাম্মদের মুখ শুকনো। অক্ষমতার জন্যে যে ওকে সাসপেন্ড করা হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই আর। মাসুদ রানাকে ধরতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওর। প্রতি পাঁচ মিনিট ওর কাছে মনে হচ্ছে পাঁচ বছর।

'ওরা এই জঙ্গলেই কোথাও লুকিয়েছে,' ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে উত্তর দিল আসলাম গোলা। 'পালাবার উপায় নেই। পুরো এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য দিয়ে নদীর এপারওপার ঘিরে ফেলেছি, স্যার, জঙ্গলটা। এবার আপনি হুকুম করলেই চাপতে শুরু করব আমরা চারপাশ থেকে। এক ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়বে।'

'এই জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'ট্রাক থেকে গন্ধ শুঁকে নদী পর্যন্ত টেনে এনেছে আমাদের কুকুরগুলো। কিন্তু তারপর তারা আর কোন গন্ধ পাচ্ছে না। নদীর ওপারেও কোন গন্ধ নেই। সম্ভাবনার সংখ্যা মাত্র দুটো। হয় ওরা নদীপথে পালিয়েছে, নয়তো কুকুরগুলোকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে সরাসরি পার না হয়ে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে কিছুদূর ডাইনে বা বাঁয়ে গিয়ে তারপর উঠেছে পারে।'

'নদী পথেই হয়তো কোন বোট সংগ্রহ করে...' লেফটেন্যান্টকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল দিল মোহাম্মদ।

'সেটা সম্ভব নয়। এ নদীতে নৌকো চলে না। তাছাড়া নদী সীল করে দিয়েছি অনেক আগেই। ওই পথে পালাতে গেলে ধরা পড়ে যেত এতক্ষণে আমাদের লোকের হাতে। কাজেই আমার বিশ্বাস, ওরা নদীর এপার বা ওপারে এই জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।'

'ঠিক আছে,' আদেশ করল ক্যাপ্টেন জায়িদ। 'অপারেশন শুরু করো।'

খটাশ করে বুট ঠুকে স্যালিউট করল লেফটেন্যান্ট, তারপর ঘুরে এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। একটা হাত তুলে ইশারা করতেই হুইসেল বেজে উঠল জঙ্গলের মধ্যে, সেই শব্দ শুনে দূর থেকে আরেকজন বাজাল হুইসেল–এইভাবে পুরোটা জঙ্গল ঘিরে যত নায়েব সুবাদার আছে সবাই বাঁশি বাজিয়ে সিগন্যাল দিয়ে অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে অ্যাডভান্স শুরু করল।

উৎসাহের সাথে অপারেশনের শুরুটা দেখছিল দিল মোহাম্মদ, এমনি সময় মেসেজ এল কুশলগড়ের ফার্মহাউস থেকে। এয়ারফোন কানে লাগিয়েই মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। সিকান্দার বিল্লাহ জানাচ্ছে, ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেছে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার বেশ কিছুক্ষণ আগে।

'অযথা সময় নষ্ট করছেন,' বলল সে। 'ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদের। একঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়বে।'

'আমিও এই কথাই বলেছিলাম ওঁকে,' বলল বিল্লাহ। 'কিন্তু আপনার ওপর কোন রকম ভরসা রাখতে উনি নারাজ। অবশ্য এজন্যে তাঁকে তেমন দোষ দেয়া যায় না। যায় কি? উনি পৌঁছবার আগেই যদি ধরে ফেলতে পারেন, সেটা আপনার জন্যে খুবই মঙ্গলজনক হবে।'

সাবধানবাণী শুনে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল দিল মোহাম্মদের। জীপ থেকে নেমে ছোট একটা টিলার উপর উঠল সে। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখল, এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা সতর্ক পায়ে, রাইফেল প্রস্তুত। জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন সারাটা জঙ্গল।

ওয়াকি-টকির মাধ্যমে নদীর ওপারের সংবাদ পাচ্ছে লেফটেন্যান্ট আসলাম গোলা। ওরাও এগিয়ে আসছে। খুব ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে, কাঁটা ঝোপ টেনে ধরছে ইউনিফরম, সময় লাগছে অনেক, কিন্তু কাজটা যে সুচারুভাবে হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটা ঝোপ-ঝাড় পরীক্ষা করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা গাছ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে–ফাঁক নেই কোথাও। পলাতক লোকগুলোর কাছে অস্ত্র আছে জানতে পেরে সময় যতই যাচ্ছে ততই নার্ভাস হয়ে পড়ছে তরুণ সোলজাররা।

পিছন থেকে নায়েব সুবাদারের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। ধমক মারছে ওরা নিশ্চিন্তে–কারণ, ওরা জানে প্রথম গুলির ধাক্কাটা যাবে সাধারণ জোয়ানদের ওপর দিয়েই।

এপাশের দল সারাটা জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এদিকে নেই, এব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ওপারের খবরের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে আসলাম গোলা। ওরাও প্রায় নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে–অল্পক্ষণেই এপার থেকে দেখা যাবে ওদের নড়াচড়া। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওদের এগিয়ে আসার শব্দ, রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ে গুঁতো মেরে দেখার শব্দ। এখন যে কোন মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবে একজন, কিংবা গুলির আওয়াজ হবে–হয় ধরা পড়বে, নয় মারা পড়বে পলাতকেরা।

উত্তেজনার চাপ সহ্য করতে না পেরে অধৈর্য হয়ে নদীর ধারে আসলাম গোলার পাশে চলে এসেছে দিল মোহাম্মদ। ক্যাপ্টেন জায়িদ অয়্যারলেসে

যোগাযোগ রাখছে সিকান্দার বিল্লাহর সাথে।
'এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল দিল মোহাম্মদ। 'পা ভিজে যাবে, তাই?'
'এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা ওপাশ থেকে,' দিল মোহাম্মদের দিকে না চেয়ে উত্তর দিল লেফটেন্যান্ট। ওর ভিতরের উত্তেজনা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে চেহারায়। টপ টপ ঘাম পড়ছে চিবুক বেয়ে। চোখের দৃষ্টি নদীর ওপারের জঙ্গলে স্থির।
'এসে পড়বে?' কয়েক পর্দা চড়ে গেল দিল মোহাম্মদের কণ্ঠস্বর। 'তাহলে ওরা কোথায়?'
আসলাম গোলা কোন উত্তর দেয়ার আগেই সার বেঁধে একদল সৈনিক বেরিয়ে এল জঙ্গলের মধ্যে থেকে, সার বেঁধে দাঁড়াল নদীর পারে।
'কোথায় গেল ওরা?' রাগে অন্ধ হয়ে গেল দিল মোহাম্মদ। আসলাম গোলার চোখে মুখে হতাশা দেখে ইচ্ছে হলো চটাশ করে একটা চড় লাগিয়ে দেয়, কিংবা টেনে ছিঁড়ে ফেলে গর্দভ ছোকরার কান। তা না করে হাত মুঠো পাকিয়ে ঝাঁকাল সে ওর নাকের কাছে। 'গাধা কোথাকার! ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আসছে। কোর্ট মার্শাল হবে তোমার, তা জানো?'
অ্যাটেনশন হয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল আসলাম গোলা। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে ওর মন। বড় আশা করেছিল সে সফল হবেই।
আরেক দফা গালাগালি করতে যাচ্ছিল দিল মোহাম্মদ, এমনি সময় পিছন থেকে ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে উঠল কেউ, 'খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে, দিল মোহাম্মদ? কি হয়েছে?'
মুখটা হাঁ হয়েই রইল দিল মোহাম্মদের, আওয়াজ বেরোল না। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। পিছন ফিরে দেখল কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। পাথরের মত মুখে সবুজ চোখ-দুটো চকচক করছে কাঁচের মত।
'এই গর্দভের জন্যে সোয়া ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল। এর ধারণা হয়েছিল জঙ্গলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ওরা। পাঁচশো লোক নিয়ে ঘেরাও করা হলো জঙ্গল, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা গেল, ফক্কা···কেউ নেই।'
হাতের ইশারায় দিল মোহাম্মদকে উড়িয়ে দিয়ে লেফটেন্যান্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রিগেডিয়ার।
'ওরা এই জঙ্গলের মধ্যেই আছে, এ ধারণা হলো কি করে তোমার?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।
হতাশা ও অপমানে কাঁপছিল আসলাম গোলা। সামলে নিল।
'ট্রাক থেকে এই নদী পর্যন্ত গন্ধ শুঁকে নিয়ে এসেছে আমাদের কুকুরগুলো। এইখানে এসে হারিয়ে গেছে ওরা। নদীর ওপর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে উঠে পড়েছে তীরে। কি করে পালাল বুঝতে পারছি না, স্যার–কিন্তু এখনও আমি বলব এই জঙ্গলেরই কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা।'
আপাদমস্তক পরীক্ষা করল ব্রিগেডিয়ার আসলামকে। মাথা ঝাঁকাল। ছোকরাকে পছন্দ হয়েছে তার।

'নৌকা যোগাড় করেনি তো?'

'এই নদীতে নৌকা চলে না, স্যার। তাছাড়া নদীর এমাথা ওমাথায় লোক রয়েছে আমার পাহারায়।'

'তাহলে?' সিগারেট ধরাল ব্রিগেডিয়ার। 'যাবে কোথায়? তুমি শিওর যে ওরা জঙ্গলেই ঢুকেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'হাওয়া হয়ে যেতে পারে না পাঁচ-পাঁচটা লোক। ভূত-প্রেত হলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু ওরা তোমারই মত রক্তমাংসের মানুষ। নদীতে নেই, ঝোপ-ঝাড়ে নেই, গাছে নেই—তাহলে কোথায় ওরা? নিশ্চয়ই মাটির নিচে। কোন গর্ত-টর্ত আছে এই জঙ্গলে? খানা-খন্দ, বা কোন গুহা, বা সুড়ঙ্গ…?'

'আমার জানা নেই, স্যার।'

একজন ছোকরা নায়েব সুবাদার শুনছিল সব কথা, দু'পা এগিয়ে খটাশ করে বুট ঠুকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

'আমার জানা আছে, স্যার।'

'কি নাম তোমার?' ছোকরার দিকে ফিরল ব্রিগেডিয়ার।

'নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল।'

'বলো, নাসিম, কি জানো তুমি?'

'পরিত্যক্ত একটা কয়লার খনি রয়েছে কাছেই। ব্রিটিশ আমলেই শেষ হয়ে গেছে কয়লা। সেই খনিতে হাওয়া যাওয়ার জন্যে একটা এয়ারশ্যাফ্ট আছে আশেপাশেই কোথাও। ছেলেবেলায় ওর ভেতর নেমে খেলতাম আমরা,' তারিক আখতারের মাথার ওপর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছে ছোকরা। এত বড় অফিসারের সাথে কথা বলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

'ওই এয়ারশ্যাফটের কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার।

'মনে হয় পারব, স্যার। অনেক বছর আগের কথা…কিন্তু খুঁজলে পেয়ে যাব মনে হয়।'

দিল মোহাম্মদের দিকে ফিরল তারিক আখতার।

'কি ঘটছে জানাও বিল্লাহকে। আমাদের সাথে আসার দরকার নেই তোমার।' মাথা নেড়ে লেফটেন্যান্ট আসলামকে এগোবার ইঙ্গিত করল সে। নাসিম কোসালকে বলল, 'এগোও। পথ দেখাও।'

রওনা হয়ে গেল নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল। পিছন পিছন চলেছে তারিক আখতার ও লেফটেন্যান্ট আসলাম গোলা।

জীপে ফিরে এল দিল মোহাম্মদ। ওর মনে হচ্ছে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে মাথাটা।

পাঁচ

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে রানা। সামনে বসে বালির ওপর নখ দিয়ে খনির একটা নকশা আঁকছে শাকুর খান। বরকতউল্লাহ, রানী ও কানিজা ঘুমে বিভোর। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। মোমবাতির স্থির আলোয় বিদঘুটে সব ছায়া পড়েছে গুহার মধ্যে। সামনে ঝুঁকে এল শাকুর।

'এই গোলক ধাঁধার মধ্যে একবার হারিয়ে গেলে মহা বিপদ হতে পারে,' বলল সে। 'ডানদিকের এই টানেল ধরে কিছুদূর এগোলেই দেখবেন পানি–গুহার কয়েক মাইল শুধু পানি আর পানি। বাঁ দিকের টানেল ধরে এগোব আমরা। এটার মুখ বেরিয়েছে গিয়ে একেবারে বর্ডারের মাইন ফিল্ডে। অ্যালার্ম সিগন্যালের বেড়াটা পেরিয়ে তারপর। অর্থাৎ আমাদের সামনে থাকছে শুধু গজ বিশেক অ্যান্টি পার্সোনেল মাইন ফিল্ড, আর ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়াটা। মাটির ফুট তিনেক নিচে পোঁতা আছে মাইনগুলো। ভাইব্রেশন ফিউজ সিসটেম। বেশ অনেকটা ভাইব্রেশন দরকার হয় ওগুলো ফাটাতে। গতবার ওরা যে পার হলো, প্রথম জন রওনা হলো রাত আটটায়, গভীর অন্ধকার, চার ঘণ্টা লাগল শুধু একজনের এই বিশগজ পেরোতেই। অতি সাবধানে একটুও মাটি না কাঁপিয়ে এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে এগিয়েছে সে বুকে হেঁটে। পথে নিশ্চয়ই কয়েকটা মাইনের উপর দিয়ে পার হয়েছে লোকটা, কিন্তু এত ধীরে, এত হালকা ভাবে চাপ দিয়ে এগিয়েছে যে টেরও পায়নি বোমাগুলো।' সোজা রানার চোখের ওপর চোখ রাখল শাকুর। 'আমরা পাঁচজন। আমাদের জন্যে কাজটা পাঁচগুণ কঠিন, পাঁচগুণ বিপজ্জনক। সবাই এক রাতে পার হওয়া অসম্ভব। প্রথম রাতে যাবে দু'জন, পরের রাতে যাবে দু'জন, সবশেষে একজন। আমি আর কানিজা যাচ্ছি একসাথে। রানীকে নিয়ে আপনি যাবেন, না বরকতউল্লাহ, সেটা আপনারা স্থির করবেন। আমার মনে হয় আপনার সাথে যাওয়াই ভাল হবে রানীর জন্যে–নইলে ভয় পেয়ে দিশে হারিয়ে ফেলতে পারে। বরকতউল্লাহ সামলাতে পারবে না ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'মাইন ফিল্ডের পরেই একটা কাঁটাতারের বেড়া আছে। দেখলে মনে হয় সাধারণ বেড়া, আসলে ইলেকট্রিফায়েড। কিন্তু একটা জায়গা আছে যেখান দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে তারের নিচ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায়। সাবধানে বালি সরালে পার হয়ে যাওয়ার মত ফাঁক তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কোন ভাবে একটা তার ছুঁয়ে ফেলেন–ব্যস...' দৃশ্যটা কল্পনা করে চোখ মুখ বিকৃত করল শাকুর।

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'যেখান দিয়ে পার হচ্ছি, ওয়াচ-টাওয়ার থেকে কতদূর সেটা?'

'ডান পাশেরটা কাছে–ষাট গজ মত দূর, বাঁ পাশেরটা দেড়শো গজ মত হবে। দু'দিকের ঘুরন্ত সার্চলাইটের আলো একসাথে মেশে না। মাঝের সরু ছায়া ধরে এগোতে হবে আমাদের। পার হতে পারাটা রীতিমত কপালের ব্যাপার।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা পরীক্ষা করল রানা। তারপর ধীরে ধীরে মুছে ফেলল নকশাটা।

'শুধু পার হলেই হচ্ছে না,' বলল শাকুর, 'যতক্ষণ রেঞ্জের মধ্যে থাকছি, দেখা মাত্র গুলি করতে পারে ওরা টাওয়ার থেকে। পেরিয়ে গিয়েই যে গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, বা দৌড় দিলাম, সেটা চলছে না–আরও দুশো গজ হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার পর উঠে দাঁড়াবার মত আড়াল পাওয়া যাবে।'

'শুধু কপালের ব্যাপার নয়, কঠিনও,' বলল রানা।

'তা ঠিক,' বলল শাকুর। 'কিন্তু সম্ভব। আমি দেখেছি ওদের পার হয়ে যেতে।'

'মুশকিল হচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে কোন একজন যদি সামান্য একটা ভুল করে, ব্যস, শেষ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত আশা ভরসা। টের পেয়ে যাবে ওরা। কেউ পার হতে পারবে না বর্ডার।' চিন্তিত মুখে কথাগুলো বলে শাকুরের চোখের দিকে চাইল রানা। 'আগে যাচ্ছে কে কে? আমার কাছে একটা টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট আছে। ওটা নির্বিঘ্নে পার করা অত্যন্ত জরুরী, এদের হাতে পড়লে যুদ্ধ...'

'যত জরুরীই হোক,' বলল শাকুর, 'আমি আর কানিজা যাচ্ছি প্রথম। আমরা আপনাদের এনেছি এখানে, আমরা যাব সবচেয়ে আগে।'

'খোদা না খাস্তা, আপনারা যদি একটা মাইন ফাটিয়ে বসেন, তাহলে? তাহলে ডকুমেন্টসহ ফেঁসে যাচ্ছি আমি। সেক্ষেত্রে...'

'যাই হোক, যত জরুরী ডকুমেন্টই থাকুক, যুদ্ধ বেধে ধ্বংস হয়ে যাক পৃথিবীটা–আমার কাছে আমার স্ত্রীর মূল্য এসবের চেয়ে অনেক বেশি। আমরাই আগে যাচ্ছি। আমি জানি ঠিক কোনখান দিয়ে পার হতে হবে। আমাদের যদি আগে যেতে না দেন, কেউই পার হতে পারবে না।'

ব্যাপারটাকে ঝগড়ার পর্যায়ে টানল না রানা। মৃদু হেসে বলল, 'টস্ করে দেখলে কেমন হয়?'

'আমার স্ত্রীর জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে পারব না, দুঃখিত,' শান্ত গলায় বলল শাকুর। 'হয় আমরা আগে যাচ্ছি, নয়তো কেউই যাচ্ছে না।'

রানা বুঝল, এ ব্যাপারে কিছুতেই মত পরিবর্তন করবে না শাকুর। এ-ও বুঝল, ওকে দোষ দেয়া যায় না। ও নিজে যদি বিবাহিত হত, ঠিক একই কথা বলত।

'ঠিক আছে,' বলল সে, 'আপনারাই যান তাহলে আগে।'

'হ্যাঁ। কাল রাতে যাব আমি আর কানিজা, পরশু রাতে যান আপনি আর রানী। তারপর বরকতউল্লাহ।'

জেগেই ছিল বরকতউল্লাহ, চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুনছিল এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা, ঝট্ করে উঠে বসল। রাইফেল তাক করল ওদের দু'জনের দিকে।

'খবরদার! সব শুনেছি আমি! একা পার হব না আমি। শুনছেন? কিছুতেই একা যাব না!'

বিরক্ত দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করল রানা ওকে।

'কি শুরু করেছেন! রাইফেল রেখে শুয়ে পড়ুন।'

'না! আপনি যাবেন প্রথম। আমি আপনার সাথে যাব,' বলল বরকতউল্লাহ। 'আমাকে ফেলে সবাই পালাবেন, সেটি হচ্ছে না! একা পার হতে পারব না আমি। আপনার সাথে আমি যাব, রানী পরে আসবে। এই চাষাভুষো...'

'চুপ করুন!' ধমক দিল রানা চাপা কণ্ঠে। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

রানার কণ্ঠস্বর শুনে কলজে হিম হয়ে গেল বরকতউল্লার। কান খাড়া হয়ে গেছে তিনজনেরই। গুহাপথে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ।

স্টেনটা তুলে নিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা। দ্রুতপায়ে এগোল এয়ারশ্যাফটের মুখের দিকে। কাছাকাছি এসেই পরিষ্কার শুনতে পেল সে কথাবার্তা।

তারিক আখতার ও লেফটেন্যান্ট আসলামকে নিয়ে গর্তের মুখে পৌঁছে গেছে নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল।

'এই সেই এয়ারশ্যাফট, স্যার,' বলল কোসাল।

'কোথায় গেছে এই সুড়ঙ্গ?' জিজ্ঞেস করল তারিক আখতার।

'খনিতে। বেশ কিছুদূর এগোবার পর দু'ভাগ হয়ে গেছে গুহাটা। ভেতরে বাতাস খুব খারাপ। কোথায় গেছে জানি না, স্যার।'

'নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে গুহাগুলো—মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে বাইরে। কোথায়?'

'কোথায় শেষ হয়েছে জানি না, স্যার। আমি যখন ছোট ছিলাম...'

'তোমার ছোটবেলার কাহিনী পরে শোনা যাবে,' কড়া গলায় বলল লেফটেন্যান্ট আসলাম গোলা। 'আমি নিচে নেমে দেখে আসছি।'

'দাঁড়াও,' বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। 'ওরা যদি এর ভেতর নেমে থাকে, তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। ওদের মধ্যে একজন আছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক। না...এক্ষুণি নিচে নামা উচিত হবে না। আগে টিয়ার গ্যাস মারতে হবে, তারপর মাস্ক পরে নামা যেতে পারে।'

'টিয়ার গ্যাসও নেই, মাস্কও নেই,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল আসলাম গোলা। বেল্টে ঝোলানো তিনটে গ্রেনেডের ওপর হাত বুলাল সে। একটা খুলে হাতে নিল। 'আমি নামছি। বারণ করবেন না, স্যার। আমি এই অপারেশনের চার্জে আছি, নিজ দায়িত্বে নামছি এর ভেতর।'

এই পর্যন্ত শুনেই নিঃশব্দ পায়ে দৌড় দিল রানা খনির দিকে।

'জলদি! নিচে নামছে ওরা!' বলল ও চাপা গলায়। রানী আর কানিজা উঠে বসেছে ততক্ষণে। 'রওনা হয়ে যান! ফ্রন্টিয়ারের দিকে!'

কথাটা বলেই পিছনে ঘুরে দৌড় দিল রানা এয়ারশ্যাফটের মুখের দিকে। দুটো রাকস্যাক আর রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে শাকুর খান, রানী আর কানিজাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সাথে সাথেই।

এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল বরকতউল্লাহ। কেউ ওকে ডাকল না পর্যন্ত! সবাই ধরে নিয়েছে প্রাণভয়ে ভীত, দুর্বল বরকতউল্লাকে কিছুই বলার দরকার নেই. মেয়েদেরকে যেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেও পিছু পিছু মুরগীর বাচ্চার মত

সেইদিকে ছুটবে। বিপদ-আপদের মধ্যে ডাকার প্রশ্ন তো ওঠেই না, নিরাপত্তার দিকেও ডাকার প্রয়োজন নেই—কুত্তার মত পিছু নিতে বাধ্য। হঠাৎ জেদ চেপে গেল ওর মাথায়। ওকে কি মানুষ মনে করে না কেউ? হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর আত্মসম্মান বোধ। যেমন করে হোক প্রমাণ করতেই হবে যে সে-ও পুরুষ মানুষ। নইলে নিজের কাছেই মান থাকবে না নিজের। ঘুরে রওনা হলো সে রানার পিছু পিছু।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে থামল রানা, হাত নেড়ে ইশারা করল ওকে চলে যাওয়ার জন্যে।

'আমি একাই সামলাতে পারব,' বলল রানা। 'আপনি ওদের সাথে যান।'

'না! আমার সাহায্য দরকার পড়তে পারে আপনার।' এগিয়ে আসছে সে। আবছা ভাবে রানাকে দেখতে পাচ্ছে সে সামনে।

'কোন দরকার পড়বে না,' বলল রানা। 'গোলমাল না করে কেটে পড়ুন এখান থেকে।' কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না রানা, ছুটল এয়ারশ্যাফটের আবছা আলোকিত মুখের দিকে।

খানিক ইতস্তত করল বরকতউল্লাহ। আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু এখন ওর অবস্থা হয়েছে দাঁতের ব্যথায় অস্থির হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরার মত। সম্মান ফিরে পাওয়ার এই সুযোগ হারাতে পারে না সে এখন আর। প্রমাণ করতেই হবে ওকে যে ও-ও মাসুদ রানার মতই একজন সত্যিকার পুরুষ মানুষ। রানা চলে গেছে এয়ারশ্যাফটের মুখের কাছে, পায়ে পায়ে সে-ও এগোল সেইদিকে। ভয়ে ভয়ে চিকন ঘাম বেরিয়ে এসেছে ওর কপালে, নাকের ওপর। রাইফেলটা এত শক্ত করে ধরেছে যে ঝিঁঝি ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে হাত দুটোয়।

হুড়মুড় করে নেমে এল আসলাম গোলা, পা পিছলে পড়ে গেল কাৎ হয়ে, পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।

দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে রানা অন্ধকারে মিশে। রানাকে দেখতে পেল না আসলাম, কিন্তু আবছা ভাবে বরকতউল্লাহর কাঠামোটা দেখতে পেল সে। সাবধানে এগিয়ে আসছে। আসলাম গোলা উঠে দাঁড়াতেই থমকে দাঁড়াল বরকতউল্লাহ, রাইফেলটা কাঁধে তুলেই টিপে দিল ট্রিগার। টানেলের মধ্যে রাইফেলের আওয়াজটা মনে হলো বজ্রপাতের গর্জন। গুলি খেয়ে পড়ে গেল আসলাম, কিন্তু এরই মধ্যে পিন খসিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে সে গ্রেনেডটা। সোজা গিয়ে বরকতউল্লাহর বুকে লাগল ওটা ঢিলের মত, তারপর খটাং করে পড়ল পিছল পাথরের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ল বরকতউল্লাহ ওটার ওপর। কিসের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে টেরও পেল না সে। গোলাগুলির সময় শুয়ে পড়ার নিয়ম, তাই শুয়েছে সে আত্মরক্ষার তাগিদে। ফাটল গ্রেনেড। আঠাল, গরম কি যেন ছিটকে এসে লাগল রানার চোখে মুখে। ছাতের একাংশ ধসে পড়ল। ঝুরঝুর করে একরাশ বালি আর কাঁকর খসে পড়ল ওপর থেকে রানার মাথায়।

শক ওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল রানা অসমান মেঝেতে। মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটে গেছে ওর। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। দশ সেকেন্ডে সামলে

নিয়ে উঠে বসল সে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল আসলাম গোলার কাছে। কুলকুল করে রক্ত বেরোচ্ছে আসলামের বুক থেকে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, অজ্ঞান। ওর বেল্ট থেকে বাকি দুটো গ্রেনেড খসিয়ে নিল রানা, দৌড়ে চলে এল বরকতউল্লার কাছে। লাইটার জ্বেলেই চোখ মুখ কুঁচকে গেল রানার। ভর্তা হয়ে গেছে বরকতউল্লাহ—চাওয়া যাচ্ছে না দলিত মথিত মাংসপিণ্ডটার দিকে।

বমি এসে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিয়ে ছুটল রানা খনিগুহার দিকে। গুহায় পৌঁছেই দেখতে পেল, হন্তদন্ত হয়ে এদিকে ছুটে আসছে শাকুর খান।

'বরকতউল্লাহ মারা গেছে,' বলল রানা। 'আপনি রওনা হয়ে যান, আমি আসছি।'

'আপনি ঠিক আছেন তো? কোন জখম...'

'ঠিক আছি। রওনা হয়ে যান!'

শাকুর খান চলে যেতেই একটা গ্রেনেড থেকে পিন খসিয়ে ছুঁড়ে দিল রানা এয়ারশ্যাফটের টানেলের মধ্যে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সেই সাথে ছাত ধসে পড়ার শব্দ এল কানে। দ্বিতীয় গ্রেনেডের পিন খসিয়ে সেটাও ছুঁড়ে দিল রানা একই দিকে। বিস্ফোরণের শব্দ একই সমান হলো, কিন্তু এবার পাথর খসে পড়ার শব্দে পরিষ্কার বোঝা গেল বেশ অনেকখানি ছাত ধসে পড়ল। বুজে গেছে এয়ারশ্যাফটের টানেল। একটা মোমবাতি জ্বেলে টানেলটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ঢোকার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কয়েক কদম এগিয়ে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলো। ঝরঝর করে পাথর ঝরছে এখনও, ধুলোয় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

খনিগুহা ধরে কিছুদূর গিয়েই শাকুর খানের দেখা পাওয়া গেল। অপেক্ষা করছে রানার জন্যে।

'কি ব্যাপার? কি হচ্ছে এসব?' জিজ্ঞেস করল শাকুর। 'এত আওয়াজ কিসের?' মোমবাতির আলোয় রানার সারা মুখে ধুলো আর রক্তের ছিটেফোঁটা দেখে শিউরে উঠল সে।

'গুহাটা বুজিয়ে দিলাম,' বলল রানা। 'বেশ অনেক সময় লাগবে ওদের পাথর সরিয়ে পথ পরিষ্কার করতে। ততক্ষণ আমরা...' থেমে গেল রানা প্রচণ্ড শব্দে। ধুলোর ঝড় ছুটে এল ওপাশ থেকে এপাশে। কেশে উঠল শাকুর খান।

'মনে হচ্ছে ধসে গেল পুরোটা গুহা,' বলল রানা। 'ওরা হয়তো ভাববে চাপা পড়ে মারা গেছি আমরা।' এগিয়ে গেল রানা নিভে যাওয়া মোমবাতিটা আবার জ্বেলে নিয়ে। 'চলুন, এগোনো যাক। মেয়েরা ভয় পাচ্ছে হয়তো।'

প্রথম গ্রেনেডের বিস্ফোরণ শুনে গর্তমুখ থেকে কয়েক পা সরে গেল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। একরাশ ধুলো আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল শক ওয়েভের পর পরই। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

'গর্দভ! কি আরম্ভ করেছে হারামজাদা?'

নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল ভাবছিল গর্তের মধ্যে নামবে কি নামবে না, পিছন থেকে কলার চেপে ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল ওকে ব্রিগেডিয়ার নিরাপদ দূরত্বে। খানিক বাদেই আরও দুটো গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হলো পর পর। একটু

ভিতর দিকে। হুড়মুড় করে ছাত খসে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকেও। নায়েব সুবাদারের দিকে ফিরল ব্রিগেডিয়ার।

'লোক ডেকে আনো! জলদি!'

ছুটল নাসিম কোসাল। এমনি সময় মেঘ গর্জনের মত গুরু গম্ভীর আওয়াজ হলো গুহার ভিতর। চিমনীর ধোঁয়ার মত ধুলো বেরোচ্ছে এয়ারশ্যাফটের গর্ত-মুখ দিয়ে। গাল দুটো কুঁচকে উঠল ব্রিগেডিয়ারের। গ্রেনেড মেরে গুহাটা ধসিয়ে দিয়েছে বুদ্ধুটা, ভাবল সে।

কিন্তু তার মানে কি পলাতক পাঁচজনের কবর হয়ে গেল? নাকি অন্য কোনদিক থেকে বেরোবার রাস্তা আছে? নিশ্চয়ই আছে। খনি যখন, এর শুরু তো নিশ্চয়ই হয়েছে কোথাও? খবরটা কোথায় জানা যাবে? এখানে এই এয়ারশ্যাফটের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি সিকান্দার বিল্লাহকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার ঝোপ-ঝাড়ের তোয়াক্কা না করেই। অর্ধেক পথ এসে দেখতে পেল জনা দশেক আতঙ্কিত সোলজার সাথে নিয়ে ফিরে আসছে নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল।

'গর্তটা পাহারা দাও,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'ভেতরে নামবে না। দাঁড়িয়ে থাকো ওটা ঘিরে।' বলেই ছুটতে শুরু করল আবার অয়্যারলেস ফিট করা জীপের দিকে।

দশ মিনিটের মধ্যে এখানকার সব ঘটনা জানা হয়ে গেল সিকান্দার বিল্লার। সংক্ষেপে সব জানিয়ে হুকুম করল ব্রিগেডিয়ার, 'এই খনি সম্পর্কে কার কাছে তথ্য পাওয়া যাবে খুঁজে বের করো। নিশ্চয়ই কোথাও এই খনির ম্যাপ রয়েছে। বের করো সেটা। এর কয়টা মুখ আছে, কোথায় বেরিয়েছে সেগুলো জানা দরকার আমার। দুই ডজন টিয়ার গ্যাস বম্ব আর গ্যাস মাস্ক পাঠাও এখানে। হেলিকপ্টারে করে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে ভুলো না।'

'ইয়েস, স্যার,' বলল বিল্লাহ। 'সবই করছি, কিন্তু একটু সময় লাগবে, স্যার।'

'যত তাড়াতাড়ি পারো, বিল্লাহ। হাতে সময় নেই।' কানেকশন কেটে দিল ব্রিগেডিয়ার। কটমট করে চাইল দিল মোহাম্মদের পাংশু মুখের দিকে।

মোমবাতি হাতে আগে আগে চলেছে শাকুর খান, তার পিছনে কানিজা। রানার হাতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে রানী। রানীর মনে হচ্ছে হাজার বছর ধরে হাঁটছে সে–বিরামহীন। রানার সাহায্য ছাড়া আর এক পা-ও বাড়ানো সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। বাতাসে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে রানা ওকে।

বরকতউল্লাহ মারা গেছে–ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে রানীর কাছে। এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল লোকটা, এখন নেই, লোকমুখে জানা গেল মারা গেছে, বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর ভয়ে স্বাভাবিক বোধ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে ওর।

একটানা ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর থেমে দাঁড়াল শাকুর।

'মাইল তিনেক আছে আরও,' বলল সে। 'খানিক বিশ্রাম করে নেয়া যাক।'

বসে পড়ল ওরা। এত ভিতরে চলে আসায় বাতাসটা কেমন যেন ভারী বোধ হচ্ছে ওদের কাছে। দম আটকে আসতে চায়, হঠাৎ হঠাৎ ছটফট করে ওঠে মনটা মুক্ত বাতাসের জন্যে।

'আজই পেরোতে হবে বর্ডার,' বলল শাকুর খান। ঘড়ি দেখল। 'আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা শেষ মাথায়। সন্ধেটা একটু ঘন হয়ে এলেই রওনা হয়ে যাব আমি আর কানিজা। সতর্ক থাকবে সীমান্ত প্রহরী, কিন্তু অপেক্ষা করার উপায় নেই আমাদের। রাস্তা পরিষ্কার করে পিছু ধাওয়া করতে খুব বেশি দেরি হবে না ওদের।'

'আর কোন রাস্তা নেই বেরোবার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তা আছে, কিন্তু বেরোবার উপায় নেই,' বলল শাকুর। 'আর খানিক আগে গিয়েই দেখতে পাবেন ডান দিকে চলে গেছে একটা গুহা। মৃত্যুফাঁদ ওটা। গুহাটা সীমান্তের নিচ দিয়ে আফগানিস্তানের পাঁচশো গজ ভেতরে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু টানেলের ভেতর পানি। এ পানি ডিঙিয়ে ওপাশে যাওয়ার উপায় নেই। চেষ্টা করেছি আমরা আগে। ওই পানির মধ্যে দিয়ে তিনচার মাইল সাঁতার কেটে যাওয়া অসম্ভব। পচা, তেলতেলে পানি। নিঃশ্বাস নিতে পারবেন না। অসম্ভব।'

'গুহাটা সোজা বর্ডার পেরিয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে উঠেছে? সেক্ষেত্রে···' উৎসাহী হয়ে উঠছিল রানা, শাকুরকে প্রবল বেগে মাথা নাড়াতে দেখে থেমে গেল।

'কোন লাভ নেই,' ঘোষণা করল শাকুর। 'এই পানির মধ্যে দিয়ে সাঁতরে ওপারে ওঠা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্তত প্রাণ নিয়ে নয়। পানিটা ভয়ঙ্কর। তাছাড়া বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে। ওদিক দিয়ে পার হওয়ার কথা চিন্তা করা সময় নষ্ট করারই নামান্তর।'

'ঠিক জানেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই!' হাসল শাকুর খান। 'আমরা চেষ্টা করে দেখিনি মনে করেছেন? ওইদিক দিয়ে পার হওয়া সম্ভব হলে মাইনফিল্ডের মধ্যে দিয়ে জান হাতে করে পার হতে চাইবে কোন্ বোকা? গত বছর ঝুঁকি নিয়েছিল একজন, কিছুতেই মাইনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে বেছে নিয়েছিল ওই পথ। দু'দিন পর ফিরে এল লাশটা।' চোখমুখ বিকৃত করল শাকুর। 'তেল চুপচুপে, ফুলে ঢোল, ক্ষতবিক্ষত। জল-ছুঁচো খেয়ে নিয়েছে শরীরের অর্ধেক। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলুন, এগোনো যাক।'

ধীরে ধীরে এগোল আবার ওরা। অনুভব করতে পারছে, খুব সামান্য করে হলেও উপর দিকে উঠছে ওরা এবার। রানার গায়ে ভর দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে এগোচ্ছে রানী। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় থেমে দাঁড়াল।

'আমাকে এইখানেই ফেলে চলে যান আপনারা,' বলল সে। 'আর এক পা-ও এগোতে পারছি না আমি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আবার দশ মিনিট বিশ্রাম নেয়া যাক।'

বসে পড়ল ওরা। একটু আড়ালে বসে কানিজার পা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে

শাকুর খান।

'আর উঠতে পারব না আমি,' বলল রানী। 'আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন আপনি, মি. মাসুদ রানা। আর না। আমার যা হওয়ার হোক। চলে যান আপনারা।'

মৃদু হেসে সিগারেট ধরাল রানা।

'আমরা যে পথে খনিতে ঢুকলাম,' গলা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল রানা শাকুরকে, 'এরকম আরও এয়ারশ্যাফট আছে নিশ্চয়ই?'

'থাকাই স্বাভাবিক,' উত্তর দিল শাকুর। 'কোনটা বুজে গেছে, কোনটা হয়তো খোলা আছে।'

'ডাইনে বাঁয়ে যে সব সুড়ঙ্গ পড়ল সেগুলো?'

'হতে পারে। ঠিক জানি না। ডাইনে যে বড় গুহাটা ছেড়ে এলাম, ওটা সেই ডোবা পথ। অন্যগুলোর কথা জানি না। খনিটা শুনেছি গোলক ধাঁধার মত। একই রকম দেখতে অসংখ্য গুহাপথ–মাকড়সার জালের মত একটার সাথে আরেকটা জোড়া। হাতে পুরো খনির ম্যাপ না নিয়ে এদিক ওদিক যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। একবার পথ হারিয়ে গেলে কিছুই চিনতে পারবেন না আর, ঘুরে ঘুরে বেঘোরে প্রাণ হারাবেন।'

চুপচাপ সিগারেট টেনে চলল রানা। মিনিট দশেক পর মাথা ঝাঁকাল রানীর দিকে চেয়ে।

'চলুন, আর খানিকটা এগোনো যাক।'

'পারব না। সত্যিই আর পারছি না আমি। আপনারা যান।'

'পা দুটো এদিকে আনুন দেখি,' বলল রানা। 'খানিক ম্যাসেজ করে দিলেই দেখবেন সাড়া ফিরে এসেছে।'

'না!' লজ্জা পেয়ে পা সরিয়ে নিচ্ছিল রানী, খপ্ করে ধরে ফেলল রানা।

'এটা লজ্জার সময় নয়। জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেলছি আমরা। লজ্জা, সঙ্কোচ, এসব অন্য এক ভদ্র দুনিয়ার ভদ্র সমাজের জিনিস। বাঁচার তাগিদে লড়ছি আমরা–সাধারণ আর দশটা জানোয়ারের মত। দলের একজনকে ফেলে রেখে এগোতে পারি না আমরা।'

রানীর একটা পা জোর করে ভাঁজ করে দু'হাতে কাফ মাসল ম্যাসেজ শুরু করল রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রইল রানী। রানার হাত দুটো উরুতে উঠে আসতেই শিউরে উঠল সে। ফুঁপিয়ে উঠে চেপে ধরল হাতটা।

'ন-না!'

রানীর চোখে চোখ রাখল রানা।

'ভাল মত ম্যাসেজ না হলে হাঁটতে পারবেন না, আমার কোলে উঠে যেতে হবে তখন। সেটা কি কম লজ্জার ব্যাপার হবে? সহজ কথা বুঝতে পারছেন না কেন? আপনাকে ফেলে রেখে যাব না আমরা। কোলে ওঠার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?'

মুচকি একটা হাসির আভাস খেলে গেল রানীর ঠোঁটে। চোখ বুজে বসে রইল সে দেয়ালে হেলান দিয়ে। দুই পা ম্যাসেজ করে দিল রানা আচ্ছা করে। দেখল বোজা চোখ থেকে গাল গড়িয়ে নামছে দু'ফোঁটা অশ্রু। কৃতজ্ঞতার? নাকি···

ফিরে এসেছে তারিক আখতার এয়ারশ্যাফটের কাছে। ধুলো বা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না আর। গর্তমুখটাকে গোল করে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে জনা দশেক সতর্ক সৈনিক। সব কটা রাইফেল গর্তমুখের দিকে তাক করে ধরা। ব্রিগেডিয়ার কাছে এসে দাঁড়াতেই খটাশ করে বুট ঠুকে স্যালিউট করল নায়েব সুবাদার নাসিম কোসাল।

সাথে করে টর্চ নিয়ে এসেছে ব্রিগেডিয়ার। জোরাল আলো ফেলল গর্তের ভিতর। ভেজা পাথর ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না ওপর থেকে। নাসিম কোসালের দিকে ফিরল সে। বাড়িয়ে ধরল টর্চটা।

'এই নাও। নিচে নেমে দেখে এসো কি অবস্থা।'

নাসিম কোসালের মুখ দেখে মনে হলো মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে ওকে। কিন্তু অর্ডার ইজ অর্ডার। বিনা দ্বিধায় নিল সে টর্চটা। কাঁপতে কাঁপতে নেমে গেল গর্তের ভিতর।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল ব্রিগেডিয়ার। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে সবাই, এই বুঝি শোনা যাবে গুলির গর্জন। গর্তমুখের কাছে খড়মড় আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে এল তারিক আখতার। ফিরে এসেছে নাসিম কোসাল। দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত, মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে।

'লেফটেন্যান্ট আসলাম মারা গেছেন, স্যার!' বলল সে।

'মরুক!' হুঙ্কার ছাড়ল ব্রিগেডিয়ার। 'ভেতরে কি দেখলে?'

'ছাত ধসে বন্ধ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।'

'ভেতরের বাতাস কি রকম?'

'ঠিকই আছে, স্যার।'

একটু ইতস্তত করে নেমে পড়ল ব্রিগেডিয়ার নিচে।

'আর কেউ নেই?'

'আরেকটা লোক দেখলাম ভেতরে। গ্রেনেড খেয়ে মারা গেছে, স্যার।'

টর্চটা ছিনিয়ে নিয়ে এগোল তারিক আখতার। বরকতউল্লার মরা মুখের ওপর আলো ফেলেই চিনতে পারল। আরও কয়েক পা এগিয়ে বুজে যাওয়া সুড়ঙ্গটা পরীক্ষা করে দেখল সে ভাল মত। বালি আর পাথর ধসে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে পথটা। কতটা পথ এভাবে বন্ধ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ওপাশ থেকে এখনও একটা দুটো পাথর খসে পড়ার শব্দ আসছে।

মাসুদ রানা কি চাপা পড়ে মরল? অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সম্ভাবনার ওপর ভরসা করা যায় না কিছুতেই। পুরো খনির নকশা সংগ্রহ করতেই হবে। এখান থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ করে দিতে হবে আগে। তারপর বের করতে হবে ওদের টিয়ার গ্যাস মেরে।

ফিরে এল ব্রিগেডিয়ার। গর্তের পাশে শুয়ে পড়ে তিনচারজন সৈনিক হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল তাকে উপরে। তারপর তোলা হলো নায়েব সুবাদারকে।

'এখানেই থাকো তোমরা। অ্যাম্বুলেন্স আসছে, লাশ তুলে দেবে ওটায়।'

দ্রুত পদক্ষেপে এগোল ব্রিগেডিয়ার জীপের দিকে। বিকেল ঢলে পড়ছে

সন্ধ্যার কোলে। পাহাড়ী জঙ্গলের মাথায় কমলা রোদের প্রলেপ।

এদিকে ফার্মহাউসে দাঁড়ানো একটা আর্মি ট্রাকের রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলছে সিকান্দার বিল্লাহ, কোহাট সেট্‌লমেন্ট অফিসের চীফ সার্ভেয়ারের সাথে। বহু জায়গায় খোঁজ খবর করে শেষ পর্যন্ত বাসায় পাওয়া গেছে লোকটাকে। প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, ঠেসে ধরায় স্বীকার করল তার অফিসে ওই পরিত্যক্ত কয়লা খনির একটা ম্যাপ থাকা সম্ভব, কিন্তু এখন ছুটি হয়ে গেছে অফিস, আগামী কাল সকাল ছাড়া কিছুই করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কারণ অফিসের চাবি···

ধমক খেয়ে থেমে গেল চীফ সার্ভেয়ার।

'এক্ষুণি দরকার আমার ওটা!' গর্জে উঠল বিল্লাহ। 'বুঝতে পেরেছেন? এক্ষুণি!'

'সেটা কি করে সম্ভব···' তোতলাতে শুরু করল সার্ভেয়ার। 'অফিসের চাবি···'

'ওসব কোন কথা শুনতে চাই না আমি,' বলল বিল্লাহ। 'কোহাটের পথে রওনা হচ্ছি আমি এখন। ম্যাপটা যদি তৈরি না পাই, দুঃখ আছে আপনার কপালে। এটা রাষ্ট্রীয় জরুরী ব্যাপার। ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের হুকুম, ম্যাপ চাই, ব্যস। আসছি আমি।' খটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

খনিমুখের কাছে এসে ঘড়ি দেখল শাকুর খান। নিভিয়ে ফেলল মোমবাতি।

'সাড়ে সাতটা,' বলল সে। 'বাইরেটা আঁধার হয়ে গেছে। দশ মিনিট জিরিয়ে নিয়েই রওনা হয়ে যাব আমরা দুজন।'

বসে পড়ল ওরা। গোটা কয়েক তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে। গর্তটার চারপাশ দেড় হাত লম্বা ঝোপে ছাওয়া। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের উত্তপ্ত চোখেমুখে। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে রানা। পাঁচ মিনিট পর উঠে গিয়ে বাইরেটা পরীক্ষা করে এল শাকুর।

'মাইন ফিল্ডটা পেরিয়ে যেতে ঘণ্টা চারেক লাগবে আমাদের। সময় আছে অনেক। ইচ্ছে করলে আপনারাও আসতে পারেন চার ঘণ্টা পর আমাদের পিছু পিছু,' বলল সে। 'কিভাবে পার হতে হবে বলেছি আপনাকে। খুব ধীরে। খু-উ-ব ধীরে ধীরে এগোতে হবে। দশ মিনিটে এক গজ। এর বেশি না। বুঝতে পেরেছেন?'

'হুম,' বলল রানা।

'আমরা কোন দিকে এগোলাম দেখতেই পাবেন। সেইদিকে গেলে পাওয়া যাবে তারের নিচ দিয়ে পার হওয়ার জন্যে নরম মাটি আর বালি। বালি সরিয়ে আমরাই পথ করে রাখব, আপনাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই ছুঁয়ে না ফেলেন তারটা। ওটা ছুঁলেই মারা পড়বেন। বুঝতে পেরেছেন?'

'হুম।'

'ঠিক আছে, তাহলে রওনা হয়ে যাই আমরা,' হাত বাড়াল রানার দিকে। 'আবার কোনদিন দেখা হয় কি না হয়!' রানার হাত ধরে আন্তরিক ভাবে চাপ দিল শাকুর। 'আপনার সাথে পরিচয়ের চব্বিশ ঘণ্টাও পুরো হয়নি এখনও। এরই মধ্যে মানুষ হিসেবে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি

মুগ্ধ এবং ধন্য হয়েছি। চলি, খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ!' বলল রানা। ঝাঁকিয়ে দিল শাকুরের শক্ত সমর্থ হাতটা।

একটু দূরে আলিঙ্গন করছে রানী ও কানিজা। রানীর কপালে চুমো খেল কানিজা।

'ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেবো না তুমি। ও দেখবে তোমাকে। লোকটা আমার স্বামীর মতই সৎ।'

রানীর কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিল শাকুর খান। চাপা গলায় বলল, 'চলি, রানী। দেখা হবে আবার।'

খনি-মুখের দিকে এগিয়ে গেল শাকুর, পিছনে কানিজা।

শিউরে উঠল রানী একবার। চলে এল রানার পাশে। ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সান্ত্বনা দিল রানা। হাসল।

'ভয় কি? দারুণ এক কাহিনী সৃষ্টি করছেন। এই গপ্পো হাজারবার শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দিতে পারবেন আপনার নাতি-নাতনীর। শেষে আপনাকে কাছে আসতে দেখলেই পালাবে ওরা।'

মৃদু হাসি ফুটল রানীর মুখে, কিন্তু মিলিয়ে গেল পরমুহূর্তে।

'দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে আমার ভয়ে।'

'আমি থাকতে আপনার ভয় কি?' উঠে বসল রানা। 'চলুন, দেখা যাক। ওদের এগোতে দেখলে ভয় দূর হয়ে যাবে অনেকখানি। যতটা ভাবছেন, আসলে অতটা কঠিন হবে না ব্যাপারটা। আসুন, নিজের চোখে দেখা যাক।'

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘন ঘাস বিছানো মাইনফিল্ডের ধারে চলে গেছে শাকুর খান। পিছনে ভীতা-চকিতা কানিজা।

প্রতি দু'মিনিট অন্তর অন্তর দু'পাশের দুই ওয়াচ-টাওয়ার থেকে সার্চ লাইটের আলো এসে ঘুরে যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। ঠিকই বলেছিল শাকুর, দু'দিকের আলো একজায়গায় মিশছে না কখনোই, মাঝখানে সরু গলির মত এক চিলতে জায়গা আবছা আঁধার রয়ে যাচ্ছে। পিছন ফিরে হাত নেড়ে রওনা হয়ে গেল শাকুর সেই আঁধার পথ ধরে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে, অতি সাবধানে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এগোল কচ্ছপ গতিতে। ওকে অনুসরণ করল কানিজা।

রানা অনুভব করল ঘামতে শুরু করেছে সে। ওর একটা হাত চেপে ধরল রানী। ওকে কাছে টেনে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল রানা। ভীতা কবুতরীর মত কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ।

এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে শাকুর ও কানিজা। সার্চ লাইটের আলোগুলো কাছাকাছি এলেই স্থির হয়ে পড়ে থাকছে ওরা, সরে গেলেই আবার এগোচ্ছে শম্বুক গতিতে।

ক্রমেই বাড়ছে রানার হৃৎপিণ্ডের গতি। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা গলা চেপে ধরতে চাইছে ওর। বুকের ভিতরে গুড়গুড় করছে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা। দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে পিছন ফিরে রানার কাঁধে মুখ লুকিয়েছে রানী।

ওর ভয় দেখে বিচলিত হয়ে উঠল রানা। ওকে নিয়ে ওই পথ পেরোনো যাবে তো? মাঝপথে যদি আতঙ্কিত হয়ে দিশা হারিয়ে ফেলে? পাশে নিতে হবে

ওকে–ভাবল রানা। সামনে তো নয়ই, পিছনেও এগোতে পারবে না রানী।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা আধঘণ্টা। কপালের দু'পাশে দুটো শিরা টিপ টিপ করছে রানার। একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে দমন করল সে। এখন আগুন জ্বাললে বিপদ হতে পারে। আঁধার আরও খানিকটা গাঢ় হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে শাকুর ও কানিজাকে। অতি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা ছায়া-পথ ধরে। ওদের বুকের তিন ফুট নিচে ওঁৎ পেতে বসে আছে তাজা বোমা।

মিনিটের পর মিনিট যাচ্ছে, যেন পেরিয়ে যাচ্ছে এক এক যুগ।

'চমৎকার এগোচ্ছে,' বলল রানা। 'ভাবছি চার ঘণ্টা অপেক্ষা না করে আমরাও রওনা হয়ে যাব কিনা। যত দেরি হবে ততই বাড়বে ভয়।'

কথাটা বলেই গুহার ভিতর ফিরে যাওয়ার জন্যে পিছন ফিরতে যাচ্ছিল রানা, থমকে দাঁড়াল। কি দিয়ে কি হলো বোঝা গেল না, হয়তো সামনে এগোতে গিয়ে মাটির ওপর কনুইয়ের চাপ একটু বেশি দিয়ে ফেলেছিল শাকুর খান–ঝলসে উঠল চোখ ধাঁধানো আলো।

কড়াৎ করে প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। কয়েক হাত শূন্যে উঠে গেল শাকুরের শরীরটা, পাঁচ গজ দূরে ধপাস করে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। সাথে সাথেই ফাটল আরেকটা মাইন।

আকাশ বাতাস চিরে দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রানী।

চট করে ওর মুখ চেপে ধরল রানা, ঠেসে ধরে রাখল ওকে বুকের ওপর। জিভ শুকিয়ে গেছে রানার, ধুপধাপ অসমান তালে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কানিজা, পাগলের মত ছুটল শাকুরের দিকে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টির মত গুলি শুরু হলো দু'পাশের ওয়াচ-টাওয়ারের মেশিনগান থেকে।

তিন সেকেন্ডে ঝাঁঝরা হয়ে গেল কানিজা, বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর, আছড়ে পড়ল লাশটা মসৃণ ঘাসের ওপর। সাথে সাথেই ফাটল আরেকটা মাইন। সীমান্ত পেরিয়ে গেছে ওরা দু'জনেই।

মেশিনগানের গর্জনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ রাত। সার্চ লাইটের আলো স্থির হয়ে রয়েছে এদিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ধুলোমাটি, ঘাসের কণা শূন্যে উড়িয়ে বিঁধছে এসে বুলেটগুলো। আওয়াজ হচ্ছে ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা।

কলজে কাঁপিয়ে বেজে উঠল সাইরেন।

ছয়

অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে তারিক আখতার। দিল মোহাম্মদকে সহ্য হচ্ছিল না বলে দূর করে দিয়েছে তাকে। অস্থির পায়ে পায়চারি করছে, আর প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর থামছে জীপের পাশে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইছে ক্যাপ্টেন জায়িদের মুখের দিকে। নতুন কোন মেসেজ আছে কিনা জানার জন্যে। গত

একটি ঘণ্টা ধরে চলছে এরকম।
অয়্যারলেসের চার্জে রয়েছে ক্যাপ্টেন জায়িদ। কানে হেডফোন লাগিয়ে চুপচাপ বসে আছে সে। চারদিক থেকে মেসেজ আসছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর আসেনি। ফার্মহাউস থেকে একজন লেফটেন্যান্ট জানিয়েছে সিকান্দার বিল্লাহ রওনা হয়ে গেছে কোহাটের পথে। বোঝা গেছে খনির ম্যাপ সংগ্রহ করতে গেছে সে। অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই এখন।
জীপের পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল ব্রিগেডিয়ার, এমনি সময় বহু দূর থেকে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের শব্দ। পর মুহূর্তে আরেকটা। কান খাড়া করে শুনল সে মেশিনগানের আওয়াজ, ঝট করে ফিরল ক্যাপ্টেন জায়িদের দিকে। ঘাড় কাৎ করে সে-ও শুনছে শব্দগুলো। আরেকটা মাইন ফাটল।
খুটখাট সুইচ টেপার শব্দ। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনল, তারপর হেডফোন খুলে ব্রিগেডিয়ারের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। চোখ মুখ উত্তেজিত।
'দু'জন মারা পড়েছে, স্যার,' বলল সে। 'একজন মেয়ে, একজন পুরুষ। বর্ডার ক্রস করতে গিয়ে মাইন ফেটে মরেছে। ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে এখন।'
তারিক আখতার ভাবল, কে মারা পড়ল! মাসুদ রানা?
'চেহারার বর্ণনা চাও ওদের কাছে,' আদেশ করল ব্রিগেডিয়ার। 'কেমন দেখতে?'
আবার কানে হেডফোন লাগিয়ে রেডিও সেটের সুইচ টেপাটিপি করল ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ, ভ্রু কুঁচকাল, আবার কিছুক্ষণ সুইচ টিপে মাথা নাড়ল।
'কেউ ধরছে না, স্যার,' বলল সে। 'নেমে পড়েছে বোধ হয় ওয়াচ-টাওয়ার থেকে।'
'চেষ্টা করতে থাকো!'
বার কয়েক সুইচ টিপে হঠাৎ বলল ক্যাপ্টেন, 'একটা মেসেজ আসছে, স্যার।' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ শুনে হেডফোন খুলে এগিয়ে দিল। 'আপনার, স্যার। সিকান্দার বিল্লাহ কথা বলতে চান আপনার সাথে।'
'বিল্লাহ?' মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার।
'ইয়েস, স্যার,' জবাব এল। 'খনির ম্যাপটা যোগাড় করেছি। বেরোবার রাস্তা মাত্র দুটো। একটা পানি ভর্তি, অন্য মুখটা বর্ডারের মাইনফিল্ডে বেরিয়েছে।'
'ইতিমধ্যে বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করেছে ওরা একবার। মারা গেছে দু'জন। কোন্ দু'জন বোঝা যাচ্ছে না এখনও। কিন্তু যাই হোক, এই পথে পার হবে না এখন আর বাকি দু'জন। আরেকটা পথ পানি ভর্তি মানে? ওদিক দিয়ে বেরোনো যাবে না?'
'না, স্যার। ওদিক দিয়ে বেরোনো অসম্ভব।'
'এয়ারশ্যাফট থাকতে পারে আরও...'
'মোট চারটে এয়ারশ্যাফট আছে, স্যার। সব ক'টার মুখের কাছে পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়েছে।'
'দ্বিতীয় গুহাটার মুখেও বসিয়ে দাও পাহারা,' বলল ব্রিগেডিয়ার।

'সেটা সম্ভব নয়, স্যার। ওই মুখটা মাটির নিচে দিয়ে বর্ডার পেরিয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে উঠেছে। সীমান্ত থেকে পাঁচশো গজ ভেতরে। কিন্তু ওই পথে কেউ বেরোতে পারবে না, স্যার। এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'ম্যাপটা নিয়ে সোজা চলে এসো এখানে,' হুকুম করল ব্রিগেডিয়ার। হেডফোন আর মাইক্রোফোন এগিয়ে দিল ক্যাপ্টেন জায়িদের দিকে। 'দেখো, কোন্ দু'জন মারা গেছে জানা যায় কিনা।'

বেশ কিছুক্ষণ সুইচ টেপাটিপির পর উত্তর মিলল। ব্রিগেডিয়ারের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'মাইনফিল্ডের মধ্যে পড়ে আছে লাশ দুটো। ওদের কাছে পৌঁছতে বেশ কিছু সময় লাগবে। টেলিস্কোপ দিয়ে যতটা বোঝা যাচ্ছে, লোকটা মোটাসোটা, বেশি লম্বা না, মেয়েলোকটা সালোয়ার কামিজ পরা।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল তারিক আখতারের। রানার বর্ণনার সাথে ঠিক মিলছে না। নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না অবশ্য, কিন্তু খুব সম্ভব এ দু'জন হচ্ছে শাকুর খান ও তার স্ত্রী। অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল সে সিগারেটটা জ্বেলে নিয়ে। যদি মারা না গিয়ে থাকে, তাহলে রানা কি দ্বিতীয় পথটা ব্যবহার করে একেবারে বর্ডার পেরিয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছবার চেষ্টা করবে? বিল্লাহ বলছে ওই পথে বেরোনো অসম্ভব। কিন্তু কতটা অসম্ভব? রানার পক্ষেও? খনির ভিতর ফাঁদে পড়ে প্রাণ দেয়ার লোক তো মাসুদ রানা নয়। তাহলে?

বিল্লার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে এখন। এছাড়া কোন উপায় নেই। ম্যাপটা হাতে পেলে লাইন অভ অ্যাকশন স্থির করা যাবে, তার আগে নয়। আবার জীপের কাছে ফিরে এল সে।

'ওদের জিজ্ঞেস করো কত সময় লাগবে মাইনফিল্ড পরিষ্কার করতে।'

আবার কন্ট্যাক্ট করল ক্যাপ্টেন ওয়াচ-টাওয়ারের সাথে। খানিক বলল, খানিক শুনল, তারপর ফিরল ব্রিগেডিয়ারের দিকে। 'ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে। মাইন ডিটেকটার নেই ওদের কাছে, আনতে পাঠিয়েছে। ওটা এসে গেলেও মাইনগুলো খুঁড়ে তুলতে যথেষ্ট সময় লাগবে।'

মাইনফিল্ড পরিষ্কার করা কতটা ভয়ঙ্কর কাজ জানা আছে ব্রিগেডিয়ারের, কাজেই এত দেরির কথা শুনেও বিস্মিত হয়নি সে। কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা! পাঁচ ঘণ্টা অনেক সময়। রানা যদি বেঁচে থাকে পাঁচ ঘণ্টায় পগার পার হয়ে যাবে! কেউ ঠেকাতে পারবে না ওকে।

একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলল ব্রিগেডিয়ার, খাঁচায় বন্দী বাঘের মত অস্থির পায়ে পায়চারি করে চলল ঝাড়া দুইঘণ্টা। তারপর এসে পৌঁছল সিকান্দার বিল্লাহ।

ধূলি ধূসরিত ট্রাকটা থেমে দাঁড়াতেই প্রায় ছুটে গিয়ে হাজির হলো ব্রিগেডিয়ার।

'ম্যাপটা দেখি?'

সিকান্দার বিল্লার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সে ম্যাপটা, ভাঁজ খুলে চট্ করে মাটিতে বিছিয়ে টর্চ জ্বালল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল বিল্লাহ পাশেই।

'এইটা হচ্ছে বর্ডার,' ম্যাপের ওপর তর্জনী দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা টানল

বিল্লাহ। 'আর এই হচ্ছে খনির দুই মুখ,' আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল সে দুটো জায়গায়। 'এইটা বেরিয়েছে মাইনফিল্ডের ভেতর। আর এইটা বর্ডার পেরিয়ে আরও পাঁচশো গজ ওইদিকে। চীফ সার্ভেয়ার বলছে এপথ একেবারে ব্লক্‌ড্।'

'ব্লক মানে কি? ছাত ধসে তো আর বুজে যায়নি সুড়ঙ্গ...'

'কিন্তু তিন-চার মাইল পানিতে ডুবে আছে, স্যার।'

'রানার পক্ষে তিন মাইল সাঁতার কাটা এমন কি কঠিন কাজ হলো?'

'ওই পানিতে?' হাসল বিল্লাহ। 'কি যে বলেন, স্যার! পচা, তেলতেলে পানি। শুধু তাই নয়, বিরাট বিরাট পানির ছুঁচোয় ভর্তি। জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে ওরা। তাছাড়া ওই সুড়ঙ্গে নাকি বিষাক্ত গ্যাস জমেছে।'

'কি করে জানা গেল সেটা?'

'মাস কয়েক আগে টেস্ট করে দেখা হয়েছে। সার্ভে করতে গিয়ে...'

'সেই বিষাক্ত গ্যাস এখনও বসে আছে ওখানে, তা কে বলল তোমাকে? উড়েও গিয়ে থাকতে পারে? পারে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল্লাহ।

'ওরা আমাকে যা বলেছে, আমি তাই বলছি, স্যার। ওরা বলছে, ওই পথে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেটা এখন বিশ্বাস করা বা না করা আপনার খুশির ওপর নির্ভর করে।'

'রানা না হয়ে অন্য কেউ হলে ঠিকই বিশ্বাস করতাম আমি। কিন্তু কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে ভেল্কিবাজি দেখিয়েছে—কারও কোন কথা বিশ্বাস করতে পারছি না আমি আর। সামান্যতম ফুটো যদি রয়ে যায়, সেই ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে ও।'

'সেক্ষেত্রে কি করতে বলেন, স্যার?' প্রশ্ন করল বিল্লাহ।

উঠে দাঁড়িয়ে মিনিট দুয়েক পায়চারি করে ফিরে এল তারিক আখতার। আবার ঝুঁকে পড়ল ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে। ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল ম্যাপটার দিকে। যেন এক্ষুণি ধমক মারবে ওটাকে।

'দ্বিতীয় মুখটা এইখানে, না?' মোটা একটা আঙুল রাখল তারিক আখতার ম্যাপের ওপর। 'ওইখানে চললাম আমি। আমি পাহারা দেব ওই মুখটা।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল বিল্লাহ ব্রিগেডিয়ারের মুখের দিকে। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার!

'বলেন কি, স্যার! আফগানিস্তান থেকে ওকে ধরে আনবেন কি করে?'

'ধরে আনব না,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'মেরে রেখে আসব। খনি-মুখের কাছে বসে থাকব আমি। যদি ওদিক দিয়ে বেরোয়, একটা গুলি খরচ করে ফিরে আসব আমি এপারে—আফগান গার্ডরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই।'

'আর যদি ধরা পড়েন?' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিল্লাহ। 'কল্পনা করতে পারেন, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আফগানিস্তানে ধরা পড়লে কি ভয়ানক তুফান উঠবে, কি সাংঘাতিক ফলস্ পজিশনে পড়বে পাকিস্তান?'

'উপায় নেই, বিল্লাহ,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে আমার। কোন অবস্থাতেই রানাকে পালিয়ে যেতে দিতে পারি না আমরা। ওর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্র আছে। তাছাড়া...আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা তো

জানোই তুমি।'

'কিন্তু তাই বলে আপনি যাবেন কেন! আমি আছি কি করতে? দশটা সিকান্দার বিল্লাহ ধরা পড়লে কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু একজন ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার–অসম্ভব, স্যার! কিছুতেই আপনার যাওয়া চলবে না।'

'না, আমিই যাব। তোমাকে আমার দরকার এই পারে,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'ওপাশে গোলাগুলির আওয়াজ পেলেই তুমি আমার ফিরে আসার ব্যবস্থা করবে। কারেন্ট অফ করে দিতে হবে। আমার ফিরে আসার জন্যে মাইনফিল্ড পরিষ্কার করে একটা পথ করে রাখতে হবে। এই সব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

'কিন্তু রানা যে ওদিক দিয়েই বেরোবার চেষ্টা করবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে? এমনও তো হতে পারে, এসবের কোন প্রয়োজনই ছিল না, খামোকা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন?'

'সেটা ভেবে দেখেছি আমি,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'ও যদি ওখান দিয়ে না বেরোয় তাহলে খনিতেই পাওয়া যাচ্ছে ওকে। মাইনগুলো তুলে ফেলেই আমরা ট্রুপস্ পাঠাব ভেতরে। যদি খনির ভেতরই ধরা পড়ে যায়, খুব ভাল কথা, কিন্তু ওর পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত সম্ভাব্য পথ বন্ধ রাখা দরকার।' ম্যাপটা ভাঁজ করে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রিগেডিয়ার। 'এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। বর্ডারে চলো, লাশগুলো দেখা যাক আগে।'

সিকান্দার বিল্লার পাশে উঠে বসল তারিক আখতার। সগর্জনে স্টার্ট নিল ট্রাক। পিছনে একরাশ ধুলো উড়িয়ে রওনা হয়ে গেল ওয়াচ-টাওয়ারের দিকে।

কোন সন্দেহ নেই রানার, শুধু শাকুর ও কানিজার লাশ পেয়েই সন্তুষ্ট হবে না ওয়াচ-টাওয়ারের গার্ডেরা, ভাল মত খুঁজে দেখবে ঠিক কোথা থেকে এল ওই দু'জন। খনিমুখটা আবিষ্কার করতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। শুধু আবিষ্কার করেই বসে থাকবে না, ঢুকবে ওরা খনিতে।

এই অবস্থায় রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। যদি একা হত, তবু চেষ্টা করে দেখা যেত কতটা কি করা যায়, কিন্তু রানীকে নিয়ে কিভাবে কি যে করবে বুঝে উঠতে পারল না সে কিছুক্ষণ। একটানা ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা, প্রলাপের মত কি যেন বলছে বিড় বিড় করে, মাঝে মাঝে উন্মাদিনীর মত দেখছে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা শাকুর ও কানিজার নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডের দিকে।

গুলিবর্ষণ থেমে গেছে, সাইরেনটা বেজে চলেছে শুধু উঁচু-নিচু পর্দায়, একটা সার্চলাইট স্থির হয়ে আছে লাশ দুটোর ওপর, দ্বিতীয়টা তন্নতন্ন করে খুঁজছে, আর কাউকে পাওয়া যায় কিনা। হঠাৎ থেমে গেল সাইরেন। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নামল সীমান্তে।

হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল মেয়েটাকে রানা। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানী ওর মুখের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ। ফোঁপাচ্ছে।

রানা বুঝল এক্ষুণি ওকে এই আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে না পারলে মহাবিপদ হবে। ধমক দিল।

'কি আরম্ভ করেছেন! থামুন!'

কিছুই বুঝতে পারল না রানী। ধমক খেয়ে খামচে ধরল রানার কোটের আস্তিন।

ধাক্কা দিল রানা। গুহার দেয়ালে হোঁচট খেয়ে পড়ল মেয়েটা। এগিয়ে গিয়ে চটাশ করে চড় কষাল রানা ওর গালে। থতমত খেয়ে গেল রানী, চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, আরও জোরে চড় মারল রানা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানী মাটিতে। টেনে তুলল ওকে রানা।

'এবার কিছুটা ভাল বোধ করছেন?' বাঁ হাতে ওর পিঠ জড়িয়ে ধরল রানা। 'সামলে নিন। পাগলামির সময় নয় এটা!'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে রুখে দাঁড়াল রানী।

'মারলেন কেন আমাকে! কেন মারলেন!' হাত ঘষছে গালে। হাসল রানা।

'ব্যথা না দিলে ঘোর কাটছিল না আপনার। চার বছরের বাচ্চার মত শুরু করেছিলেন।'

সাঁই করে হাত চালাল রানী। ইচ্ছে করলেই ঠেকিয়ে দিতে পারত রানা চড়টা, কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। ঠাশ করে বেশ জোরে চড় পড়ল রানার গালে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, লক্ষ করছে রানীর হাবভাব।

'মারুন, আরেকটা মারুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'ইচ্ছে হলে আরেকটা লাগিয়ে দিন। কিছু বলব না।'

মুহূর্তে কেটে গেল রানীর ঘোরটা। সার্চলাইটের মৃদু আলোয় দেখতে পেল রানা আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেল ওর চোখ থেকে। সচকিত, সপ্রতিভ হয়ে উঠল সে এক সেকেন্ডে।

'কিছু মনে করবেন না,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল সে। 'হঠাৎ রাগ উঠে গিয়েছিল মাথায়।' এগিয়ে এসে চুমো খেলো সে রানার গালে। 'মাফ করবেন না?'

'একশোবার!' খুশি হয়ে উঠল রানা। আবার শাকুর ও কানিজার কথা যেন ওর মনে পড়ে না যায় সেজন্যে চট করে যোগ করল, 'চলুন, এগোনো যাক?'

'চলুন,' পা বাড়াল রানী। বলল, 'এদিক দিয়ে পার হওয়ার আশা তো শেষ, এবার কি করবেন ভাবছেন?'

এতক্ষণে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। যাক, একটা দুশ্চিন্তা দূর হলো। পুরোপুরি বাস্তবে ফিরে এসেছে মেয়েটা। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইছে।

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এখন আমাদের। কঠিন হবে কাজটা, কিন্তু পারব। ডানদিকের সেই পানি ভর্তি টানেল দিয়েই বেরোতে হবে এখন।' কাছে টেনে আনল সে রানীকে। কোমরে হাত রাখল। 'ঠিক তিনদিনের মধ্যে তেহরানের সেরা হোটেলে আপনাকে ইরানের সেরা ডিনার খাওয়াব। রাজি?'

রানার চোখে চোখ রাখল রানী। মৃদু হাসল।

'ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। রানার পিঠে রাকস্যাক, কাঁধে চায়নিজ স্টেন। রানীর

হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। ঝাড়া এক ঘণ্টা হাঁটার পর বাঁ দিকে পাওয়া গেল সেই সুড়ঙ্গটা। দশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার এগোল ওরা। যতই সামনে এগোচ্ছে ততই দূষিত হয়ে উঠছে বাতাসটা। আধঘণ্টা হাঁটার পর রীতিমত শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল ওদের দু'জনের। কেবল দূষিত নয়, বাতাসটা গরম। কেমন যেন ভাপসা।

কোটটা আগেই খুলে ফেলেছিল, এবার শার্টটাও খুলে ফেলল রানা–ভাবল, প্যান্টটাও খুলে ফেলতে পারলে ভাল হত। দরদর ঘামছে সে ভিতর ভিতর, কিন্তু রানী কি ভাববে মনে করে নিরস্ত হলো। গায়ে কাপড় রাখা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে ওর পক্ষে।

ক্রমেই বাড়ছে গরম। আরও বিশ মিনিট মুখ বুজে থাকার পর হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'গরমটা কেমন বুঝছেন?'

থেমে দাঁড়াল রানী।

'যা খুশি ভাবতে পারেন,' বলল সে, 'কিন্তু আমি আর গায়ে কাপড় রাখতে পারছি না।'

সালোয়ার-কামিজ খুলে ফেলল সে। পরনে শুধু অন্তর্বাস।

একগাল হেসে প্যান্ট ছাড়তে ছাড়তে রানা বলল, 'ভাবার কিছুই নেই। আমার অবস্থাও আপনারই মত। উফ্! মনে হচ্ছে দোজখে ঢুকে পড়েছি!'

আরও পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর গতি শ্লথ হয়ে এল দু'জনেরই। মনে হচ্ছে আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে ওরা। অক্সিজেন নেই বাতাসে। ভয় হচ্ছে, এক্ষুণি বুঝি মোমবাতির আগুন লেগে দপ্ করে জ্বলে উঠবে বাতাসটা।

চলতে চলতে হঠাৎ দেয়ালের গায়ে একটা ফুটো দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের আভাস পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ফুরফুর করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে ফুটো দিয়ে। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে শ্বাস টানল ওরা ফুটোর কাছে নাক দিয়ে। অনেকটা ভাল লাগছে এখন। আবার হাঁটতে শুরু করল। এবার অনুভব করল ওরা খুব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে বাতাসের উত্তাপ।

মাইল তিনেক হাঁটার পর থেমে দাঁড়াল রানী।

'আর চলতে পারছি না। খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিলে হয় না?'

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা। রানীর হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে দেয়ালের একটা খাঁজে আটকে দিল। রাকস্যাক আর স্টেনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি সামনেটা দেখে আসছি।'

'না! আমাকে একা রেখে যাবেন না!'

'ভয়ের কি আছে,' হাসল রানা, 'আলো তো রইল। মনে হচ্ছে পানির শব্দ পাচ্ছি। দেখে আসছি আমি দুই মিনিটে।'

'প্লী...জ!' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে রানী পাথুরে মেঝের ওপর। মিনতি ফুটে উঠল ওর টানা চোখের দৃষ্টিতে। মোমের আলোয় উদ্ভট সব ছায়া পড়েছে ওর

চারপাশে। 'প্লী...জ! আলোটা নিভিয়ে দাও।'

রানীর মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে হঠাৎই ঢিব ঢিব শুরু হয়ে গেল রানার বুকের ভিতর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানীকে। নিখুঁত, অপূর্ব। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে চলে এল সে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সময়। বিপদ, বর্ডার, খনি-মুখ–সব যেন বহুদূরের অবাস্তব কোন দুঃস্বপ্ন।

রানাই প্রথম ফিরে এল বাস্তবে। আবার কানে গেল ওর পানির আওয়াজ। ধীরে ধীরে উঠে বসল আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে। রানীকে বলল, 'একটু জিরিয়ে নাও, আমি আসছি এখুনি।'

'আমাকে একা ফেলে যেয়ো না,' বলল রানী, হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট পরে নিল রানা। মোমবাতি জ্বালল।

'রানা!'

'এখুনি আসছি। আলোটা রেখে যাচ্ছি, ভয় নেই।'

আরেকটা মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এগিয়ে গেল রানা। তেলের কটু গন্ধ এল নাকে। আরও কয়েক পা গিয়ে পাঁচ-ছ'টা তেলের ড্রাম দেখতে পেল। দেয়ালের পাশে রাখা আছে একটার ওপর আর একটা। একটাকে কাৎ করে দেখল রানা, সহজেই নড়ানো যাচ্ছে–খালি! ভ্রু কুঁচকে ভাবল, ফুটো না থাকলে ভাসবে এগুলো পানিতে। এগুলোর সাহায্যে পানি পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব না-ও হতে পারে।

রানীর পায়ের শব্দ পেল সে। এগোতে গিয়েও থেমে অপেক্ষা করল ওর জন্যে। স্টেনগান আর রাকস্যাকটা মেঝের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে এল সে।

'একা একা ভয় লাগছিল,' বলল রানী।

'দেখো এগুলো। গোটা তিনেক জোড়া দিলে চমৎকার ভেলা হয়ে যাবে দু'জনের জন্যে, কি বলো? চলো, পানিটা কতদূর দেখে আসা যাক। বোঝা বয়ে লাভ নেই, এগুলো থাক এখানেই।'

এক হাতে মোমবাতি, আরেক হাতে রানীর কাঁধ ধরে এগোল সে সামনে। বেশিদূর যেতে হলো না, বিশ কদম গিয়েই থেমে দাঁড়াতে হলো ওদের। হঠাৎ ঢালু হয়ে ছয় সাত ফুট নেমে গেছে সুড়ঙ্গ–নিচে নিকষ কালো পানি। পচা একটা দুর্গন্ধে বমি এসে যাওয়ার যোগাড় হলো ওদের।

'ওর মধ্যে দিয়ে যাব কি করে!' নাক সিটকাল রানী, পিছিয়ে গেল এক পা। 'ওয়াক! এখান দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'এটাই এখন একমাত্র পথ,' বলল রানা। 'এই পথেই যাচ্ছি আমরা। ধরো, মোমবাতিটা।'

তেলের ড্রামগুলোর কাছে ফিরে এল ওরা। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে ফুটো আছে কিনা দেখে একটাকে শুইয়ে গড়াতে গড়াতে নিয়ে এল রানা পানির ধারে। আলো হাতে পিছন পিছন এল রানী। দ্বিতীয় ড্রামের জন্যে ফিরে গেল ওরা। ওটা টেনে নামাতেই নড়ে উঠল কি যেন, লাফ দিয়ে রানার পায়ের ওপর পড়ল সেটা,

ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। চেঁচিয়ে উঠে মোমবাতি ছেড়ে দিল রানী হাত থেকে, এক লাফে পিছিয়ে গেল কয়েক হাত। শিউরে উঠল।

'ছুঁচো! বিরাট একটা ছুঁচো!'

লাইটার জ্বেলে মোমবাতিটা তুলে নিল রানা, জ্বালল আবার।

'এত ভয় পেলে তো চলবে না, রানী। সামনে আমাদের কঠিন পথ। সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে না পারলে বিপদ ডেকে আনবে তুমি দু'জনের জন্যেই। নাও, ধরো। এটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, ড্রামটা রেখে আসি আমি।'

'না! আমি তোমার সাথে যাব!' চঞ্চল হয়ে উঠল রানী। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চোখ বুলাল। 'আরও আছে নাকি আল্লাই জানে!'

শাকুরের বর্ণনাটা মনে পড়ল রানার। কিন্তু চেপে যাওয়াই স্থির করল সে। বলল, 'আরে, দূর! আর আসবে কোত্থেকে?'

গড়াতে গড়াতে পানির ধারে নিয়ে এল ড্রামটা রানা। প্রথম ড্রামের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ফিরে গেল তৃতীয়টার জন্যে। রানার গায়ের সাথে প্রায় সেঁটে রয়েছে রানী। তৃতীয় ড্রামটা সরিয়েই চমকে উঠল রানা। কি যেন শুয়ে আছে, আঁকাবাঁকা–সাপের মত। একলাফে সরে যাওয়ার ইচ্ছেটা দমন করল রানা, যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই পিছনে হাত বাড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'মোমবাতিটা দাও তো?'

রানার কণ্ঠস্বর শুনেই আঁৎকে উঠল রানী।

'কি…কি ওখানে!'

'আলোটা দাও।'

বাতিটা উঁচু করে ধরে উঁকি দিল রানা। রজ্জু ভ্রমে সর্প নয়, সর্প ভ্রমে রজ্জু। কয়েক ফুট লম্বা একটা রশি।

'বাহ্!' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'ভাগ্যটা হাসিহাসি মুখ করছে মনে হয়!' হাত বাড়িয়ে রশিটা তুলে আনল সে। রশির নিচে ডিম বুকে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল প্রকাণ্ড এক মাকড়সা, সড়সড় করে পালাল ওটা রানীর পায়ের কাছ ঘেঁষে অন্ধকার ছায়ায়। কদাকার লোমশ চলন্ত জিনিসটা দেখে আতঙ্কে ফুঁপিয়ে উঠল রানী, লাফিয়ে সরে গেল দূরে।

রানীর আতঙ্কটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। বলল, 'ধরো রশিটা। ভেলা বানানোর কাজে লাগবে। এতে অবশ্য একটা দিক বাঁধা যাবে, আরেকটা দিক বাঁধব তোমার ওড়না দিয়ে। চলো, এগোও।'

মোমবাতি আর রশিটা রানীর হাতে দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলল সে তৃতীয় ড্রামটা পানির ধারে।

চোখ থেকে বিনকিউলারটা নামাল তারিক আখতার।

'ওটা রানা নয়,' ভাঙা গলায় বলল সে। 'তার মানে খনির মধ্যেই রয়েছে ও এখনও।'

তিনজন গার্ড সাবধানে মাইন ডিটেকটার বুলাচ্ছে ঘাসের ওপর। মাইনফিল্ডের খুব সামান্য অংশই পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে। ব্রিগেডিয়ারের পাশে

অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন আর্মি মেজর, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে সিকান্দার বিল্লাহ।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না,' আপন মনে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'কতক্ষণে যে মাঠ পরিষ্কার হবে আল্লাই মালুম। ততক্ষণে ওরা···নাহ্, আমি ওপারে যাব।' ফিরল মেজরের দিকে। 'ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দাও। ওপারে যেতে হবে আমাকে! গোটা কয়েক বেঞ্চি যোগাড় করো যেখান থেকে পারো। ওগুলো বিছিয়ে দিলে তার ওপর দিয়ে হেঁটে পেরিয়ে যেতে পারব আমি।'

কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মেজর।

'কাজটা খুবই রিস্কি হবে, স্যার,' বলল সে। 'এতগুলো বেঞ্চের কোন একটার পা যদি কোন মাইনের ওপর থাকে তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে অনেক সহজ হবে যদি দড়ি ধরে ঝুলে ওপারে যান। ওই ওখানে দড়ি বেঁধে···' ওয়াচ-টাওয়ারের মাথার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল মেজর, 'যদি ঝুলতে ঝুলতে···'

ওয়াচ-টাওয়ারের মাথা এবং মাইনফিল্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে হিসেব কষল ব্রিগেডিয়ার, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই করো। জলদি।'

দ্রুত পায়ে চলে গেল মেজর। এগিয়ে এল সিকান্দার বিল্লাহ।

'ঝোঁকের মাথায় কাজটা করা কি উচিত হচ্ছে, স্যার?' বলল সে। 'ওই পথে বেরোতে পারবে না রানা। কিন্তু রশিটা যদি ছিঁড়ে যায়···'

কটমট করে চাইল ব্রিগেডিয়ার বিল্লার চোখের দিকে।

'উপদেশগুলো নিজের জন্যে জমা রাখো, বিল্লাহ্। খরচ করে ফেললে পরে বিপদে পড়বে। হুঁহ্! ঝোঁকের মাথায়! ঠাণ্ডা মাথায় তুমি কতদূর কি করতে পেরেছ শুনি? কেন আজকে আমার নিজের গিয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে আফগানিস্তানের খনি-মুখ? ভাবো, বোঝো, তারপর কথা বলো।'

অনেক কিছুই বলতে পারত বিল্লাহ, বলতে পারত আসলে ব্রিগেডিয়ারের দোষেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, জ্যান্ত ধরার হুকুম করায় কুশলগড়ের পাহাড় থেকে হাত ফসকে এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে ওরা, নইলে বহু আগেই পাঁচটা লাশ পাশাপাশি শুইয়ে দিতে পারত সে ব্রিগেডিয়ারের পায়ের কাছে–কিন্তু কিছুই বলল না সে। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার আগ্রহে উন্মাদ অবস্থা হয়েছে তারিক আখতারের, যুক্তিতর্কে লাভ হবে না কোন। শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে।

'এটা সাথে রাখতে তো আপত্তি নেই, স্যার?' এগিয়ে ধরল সে পিস্তলটা।

মৃদু হেসে হাত বাড়াল ব্রিগেডিয়ার।

'না। এটা কাজে লাগবে।' দ্রুত হাতে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করল সে যন্ত্রটা। কলকব্জা বুঝে নিয়ে বলল, 'সাইলেন্সারটা নেই বুঝি সাথে?'

'না, স্যার। নিজের দেশেই শিকার করব ভেবে ওটা আর আনিনি সাথে করে।' সিগারেটে টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ঘন সাদা ধোঁয়া বের করল বিল্লাহ। 'এখান দিয়ে পেরোলে অনেক হাঁটতে হবে, স্যার। ফিরে আসাও অসুবিধা।

এখানে না পেরিয়ে মাইল তিনেক ডাইনে সরে বর্ডার ক্রস করলে হত না? পাঁচশো গজের মধ্যে পেয়ে যেতেন খনি-মুখ।'

'এখান দিয়েই পার হব। ওদিকে ঝোপ-ঝাড়ের কাভার না-ও থাকতে পারে। এইখানেই ফিরে আসব আমি কাজ সেরে। তুমি ততক্ষণে এদের তাড়া দিয়ে মাইনফিল্ডটা পরিষ্কার করিয়ে রাখো। নইলে আর ফিরতে পারব না।'

মেজর এসে দাঁড়াল।

'কারেন্ট অফ করে দেয়া হয়েছে, স্যার। একটা আংটায় রশি বাঁধা হচ্ছে। এখুনি হয়ে যাবে।'

ঘড়ি দেখল তারিক আখতার। মনে মনে হিসেব করল, ঘণ্টাখানেক লাগবে ওর দ্বিতীয় খনি-মুখে পৌঁছতে। যদি ধরে নেয়া যায় গোলাগুলির সময় রানা এই খনি-মুখের কাছেই ছিল…সেটাই স্বাভাবিক–তাহলে ঘণ্টাখানেক লেগেছে ওর ডানদিকের সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছতে, আরও তিন ঘণ্টায় পৌঁছেছে সে পানির কাছে। চার মাইল সাঁতার কেটে ওপারে পৌঁছতে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা লাগবে ওর–অবশ্য যদি মাঝপথে ডুবে না মরে। তার মানে হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ঠিক সময় মতই পৌঁছে যাবে সে খনি-মুখে।

ওয়াচ-টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে একজন গার্ড বঁড়শির মত লোহার আংটা বাঁধা রশিটা ছুঁড়ে দিল কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। পারল না। রশি পেঁচিয়ে নিয়ে আবার ছুঁড়ল। এবারও বাধাতে পারল না। সাত-আটবার চেষ্টার পর খটাং করে ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের মত একটা লোহার পোলে আটকে গেল হুকটা। টাওয়ারের রেলিং-এর সাথে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে রশির আরেক মাথা।

'চলি,' বলল ব্রিগেডিয়ার। মেজরের সাথে হ্যান্ডশেক করে বিল্লার দিকে ফিরল। 'মাইনফিল্ড পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই লোক নামাবে খনির ভেতর।'

'আমি সাথে আসি, স্যার?'

'না। এটা মাসুদ রানা আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমাকে যে কাজের ভার দিয়েছি সেটা ঠিকমত করো। চলি। গুডলাক।'

'গুডলাক।'

ওয়াচ-টাওয়ারের লোহার মই বেয়ে উপরে উঠে গেল ব্রিগেডিয়ার। ওখান থেকে হাত নেড়ে বিদায় নিল। দু'হাতে রশি আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল শূন্যে, দুই পা দিয়েও জড়িয়ে ধরল রশিটা, তারপর নামতে শুরু করল সড়সড় করে। বিশাল শরীরের ভারে বাঁকা হয়ে গেছে টান করে বাঁধা রশিটা। মাইনফিল্ডের মাঝামাঝি এসে বিশ্রাম নিল ব্রিগেডিয়ার। হার্টবিট বেড়ে গেছে সিকান্দার বিল্লার। একমিনিট জিরিয়ে নিয়ে বাকি পথটুকু সড়সড় করে নেমে গেল ব্রিগেডিয়ার। হাঁপ ছাড়ল বিল্লাহ। কাঁটাতারের বেড়া টপকে আফগানিস্তানের মাটিতে নামল তারিক আখতার।

শেষ বারের মত হাত নেড়ে দ্রুতপায়ে এগোল সে ডানদিকে।

সাত

আফগান ফ্রন্টিয়ার পোস্টের কমান্ডার ক্যাপ্টেন দিদার কানে তুলে নিল রেডিও টেলিফোনের রিসিভার। অপারেটারকে আদেশ করল কাবুলের ইন্ডিয়ান এমব্যাসীতে কানেকশন দেয়ার জন্যে। শক্ত কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে অসহিষ্ণু ভাবে ড্রাম বাজাচ্ছে সে ব্লটিং পেপারের ওপর রাবার জোড়া পেন্সিলের পিছন দিয়ে।

আফগান সীমান্তের কাছাকাছি মাতুনে ওর অফিস। করিৎকর্মা লোক ক্যাপ্টেন দিদার। ওখান থেকে তারাকি পাস, বাটাল পাস, মুসাতালবার পাস–কোনটাই ত্রিশ মাইলের বেশি না। সবদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারছে সে মাতুনে বসে। বাহাত্তর ও তেহাত্তর সালে বাঙালী পলাতকদের যে সাহায্য করেছে সে তার তুলনা হয় না। দিন নেই, রাত নেই, টহল দিয়েছে সে সীমান্তে। বাঙালী পেলে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কাবুল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। সেই সুবাদেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়েছে ওর ইন্ডিয়ান এমব্যাসীর থার্ড সেক্রেটারি লোকনাথ বিশ্বাসের সাথে।

কর্কশ একটা কণ্ঠ জানাল এখুনি ইন্ডিয়ান এমব্যাসীর কানেকশন দেয়া হচ্ছে।

গতকাল রাতে যোগাযোগ করেছিল লোকনাথ, কয়েকজন বাঙালী বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করতে পারে, ও যেন একটু খেয়াল রাখে। সব কথা ভেঙে বলেনি লোকনাথ, কিন্তু আভাস দিয়েছিল এদের নির্বিঘ্নে এপারে পৌঁছনোটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

লোকনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কে বলছেন? ক্যাপ্টেন দিদার?'

'হ্যাঁ। খবর আছে,' বলল দিদার। 'লান্ধার কাছাকাছি বর্ডার পেরোবার একটা অ্যাটেম্প্‌ট্‌ হয়েছে। খুব সম্ভব আনসাকসেসফুল অ্যাটেম্পট। মাইন ফাটার আওয়াজ পাওয়া গেছে, মেশিনগানের গুলিও চলেছে কয়েক মিনিট।'

'কখন?'

'সন্ধের পর। আমি খবর পেলাম এইমাত্র। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমি সীমান্তের দিকে। কোন খবর হলে জানাব। তবে আগামী দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন খবর আশা করবেন না।'

'ঠিক আছে,' বলল লোকনাথ। 'আমি অপেক্ষা করছি। অনেক ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। আমার কাছে একটা মেসেজ এসেছে খানিক আগে। এটা নাকি টপ লেভেল ব্যাপার। ম্যাপ রেফারেন্সটা দিতে পারবেন? মানে, ঠিক কোথায় ওরা বর্ডার পেরোবার চেষ্টা...'

'সেকশন ফিফটিন...স্কয়ার টু।'

'ও. কে, থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার খবরের অপেক্ষায় রইলাম।'

*

গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে গরম হয়ে রয়েছে তেহরানের খৈয়াম ভবনের তেতলাটা।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছে জটিলেশ্বরের কাছে। ইসলামাবাদ থেকে ইন্ডিয়ান এমব্যাসীর অরুণ হালদার পাঠিয়েছে কোডেড টেলিগ্রাম। এই সংক্ষিপ্ত সংবাদে সন্তুষ্ট হতে পারেনি জটিল রায়। ভিক্টোরিয়া রোডের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে গুলি খেয়ে মারা গেছে চন্দ্রগুপ্ত। রানা, বরকতউল্লাহ ও দিলারা দুররানী রওনা হয়ে গেছে বর্ডারের দিকে। পিছনে তাড়া করছে ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার ও সিকান্দার বিল্লাহ। ব্যস, আর কিছুই জানা যায়নি।

চোখের কোলে কালি পড়েছে জটিলেশ্বর রায়ের। কপালের দু'পাশ টিপে ধ… বসে আছে চোখ বুজে। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে সামনের চেয়ারে বসা নীতিশ গু… হঠাৎ চোখ খুলল জটিলেশ্বর।

'কি বুঝছ?'

'রানার ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা করছি না আমি, স্যার,' বলল নীতিশ। 'অম… দশটা সিকান্দার বিল্লাহকে কলা দেখিয়ে ঠিকই বেরিয়ে আসবে ও পাকিস্তা… থেকে।' নিচের ঠোঁট কামড়াল সে। 'আমি ভাবছি ডকুমেন্টটার কথা। ওটা রানার সাথে আছে কিনা বোঝা গেল না। ওটা যদি পাকিস্তানীদের হাতে পড়ে…'

পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে কাঁচ পরিষ্কারে মন দিল জটিলেশ্বর রায়। এটা ওর মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ।

'তিনদিন হয়ে গেল…তুমি কি বলো, গুহ, ওটার কথা সব জানিয়ে রিপোর্ট করব হেড-অফিসে?'

'না, স্যার। কি ঘটেছে বা ঘটছে না জেনে আগেই রিপোর্ট করা ঠিক হবে না। রিপোর্ট করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। রানা ওটা নিয়েও ফিরতে পারে বলা যায় না।' কান চুলকাল। 'এই মেসেজে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কার গুলিতে মারা গেল চন্দ্রগুপ্ত—রানার? না পুলিসের? ডকুমেন্টটা কার কাছে ছিল—রানার? না চন্দ্রগুপ্তের? এখন ওটা কার কাছে—রানার? না পুলিসের?'

ভ্রু কুঁচকে খানিক চিন্তা করল জটিলেশ্বর, তারপর বলল, 'ঠিকই বলেছ। সবটা না জেনে রিপোর্ট করা ঠিক হবে না। সুনীল নাগ ঢুকে পড়েছে। সবই জানতে পারব আমরা দু'একদিনের মধ্যে।' সুনীল নাগের ঢুকে পড়ার সংবাদে নীতিশকে বিস্মিত হতে দেখে হাসল জটিলেশ্বর। 'ওইটাই তো আমাদের প্ল্যান ছিল, তাই না? তারিক যখন রানার পেছনে ব্যস্ত, ঠিক সময় মত ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। খবর এসেছে, নিরাপদেই পৌঁছেছে সে লাহোর।' পেন নাইফটা তুলে নিল হাতে। 'অর্থাৎ, একেবারে নিষ্ফল হয়নি আমাদের এই অপারেশনটা।'

ঢোক গিলল নীতিশ।

'আমার ভবিষ্যৎ এখন রানার হাতে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জটিলেশ্বর। 'যা খুশি তাই ঘটাতে পারে ও এখন। চন্দ্রগুপ্তের কাছে জানতে পেরেছে ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম আমি ওকে, ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে চক্রান্ত করে পাঠিয়েছি ওকে লাহোর। ফলে ওর মনোভাবটা কি হবে বুঝতে কষ্ট হয় না। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ও আমার সর্বনাশ করতে। তারিকের হাতে ধরা পড়ে গেলে তথ্যের বিনিময়ে

নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে। তার মানে আমি শেষ। আমাকে শেষ করে দেয়ার এতবড় সুযোগ ও হেলায় হারাবে না।' করুণ হাসল। 'এতখানি অসহায় বোধ করিনি জীবনে কখনও। দেখো, ও আমাকে ছাড়বে না।'

মুখে কিছুই বলল না, কিন্তু মনে মনে নীতিশ বলল–ওর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে যা খুশি তাই করলেও ওকে দোষ দেয়া যাবে না। লোকটার পেছনে লাগতে গিয়েছি আমরাই, এখন ঠকে গিয়ে হা-হুতাশ করলে কি হবে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল নীতিশ গুহ।

'আমি চললাম, স্যার। কাবুল যাচ্ছি। কাবুল এমব্যাসীর লোকনাথ বিশ্বাসকে টিপে দিয়ে রেখেছি আমি আগেই। ও বলছে খুব ভাল একজন লোক আফগান ফ্রন্টিয়ারের চার্জে আছে। ক্যাপ্টেন দিদার। ওর কাছ থেকে সব রকম সাহায্য পাওয়া যাবে। দেখা যাক কতটা সাহায্য আদায় করা যায়।'

'ঠিক আছে, গুহ,' চশমাটা চোখে লাগাল জটিলেশ্বর। 'যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে মেমোটা। তোমার ওপর নির্ভর করছি অনেকখানি।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না, স্যার। সাধ্যমত সব কিছুই করব আমি।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল নীতিশ গুহ। ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর উঠে বসল বি.ও.এ.সি-র কাবুলগামী প্লেনে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। ঠেলা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ড্রাম তিনটের বাঁধন। একদিকে রশির বাঁধনটা বেশ শক্ত হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে ওড়নার বাঁধনটা তেমন পছন্দ হলো না ওর–খুলে গেলেই সর্বনাশ। তবে এর বেশি আর কিছু আপাতত সম্ভব নয় বলে সন্দেহটা নিজের মনেই চেপে রাখল সে। হাসিমুখে ফিরল রানীর দিকে।

'কি? পছন্দ হয়েছে ভেলাটা?'

'ভাসবে তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানী। ভয়ে ভয়ে চাইল নিকষ কালো তেলতেলে পচা পানির দিকে।

'একশোবার!' বলল রানা। বসে পড়ল। রাকস্যাক খুলে প্লাস্টিক ব্যাগে মোড়া একখণ্ড পনির, গোটা কয়েক বাসি রুটি আর খানিক হালুয়া বের করল। 'খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই?'

শিউরে উঠল রানী।

'অসম্ভব! কিচ্ছু মুখে দিতে পারব না আমি এখন।'

'ঠিক।' ভাপসা গন্ধে বমি ঠেলে আসতে চাইছে রানারও, খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।–'থাক এখন, পরে দেখা যাবে।'

প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে খাবারগুলো বের করে রাকস্যাকে রাখল রানা, হিপ পকেট থেকে লাল ফিতে বাঁধা টপ সিক্রেট সীল দেয়া এনভেলাপটা বের করে ঢোকাল প্লাস্টিক ব্যাগে। আরেক পকেট থেকে বের করল পাসপোর্ট, আর ত্রিশ হাজার ডলারের তোড়া। ওগুলোও ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে হাত বাড়াল রানীর দিকে। 'তোমারগুলোও দাও, এর মধ্যে থাকলে ভিজে নষ্ট হবে না।'

'ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি!' চোখ বড় হয়ে গেল রানীর। 'আমি সাঁতার জানি না।'

'আমি জানি–ডুবে মরবে না। সামনে কি আছে জানা নেই আমাদের। বলা যায় না, কিছুদূর হয়তো সাঁতার কাটতে হতেও পারে। আগে থেকে তৈরি থাকাই ভাল।'

হ্যান্ডব্যাগটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সালোয়ার কামিজ পরে নিল রানী। বেশ শীত শীত লাগছে এখানটায়। পানির দিক থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধযুক্ত ভাপসা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রানীর ব্যাগ থেকে নোটের তোড়াটা বের করে নিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগে পুরল রানা, একটা গিঁট দিয়ে মুখটা বন্ধ করে সেটা রাখল রাকস্যাকের মধ্যে। এবার রাকস্যাকের স্ট্র্যাপ লাগিয়ে ভেলায় জড়ানো রশির সাথে বাঁধল ওটাকে আচ্ছা করে।

'ব্যস, রেডি। এসো ভেলা ভাসানো যাক এবার।' সোজা হয়ে রানীর সামনে দাঁড়াল ও। টেনে নিল ওকে বুকের কাছে। 'মনে রেখো, পার আমাদের হতেই হবে। যত কঠিনই হোক, বেরিয়ে যাব আমরা এখান থেকে। যাবই। যদি কোন বিপদ আসে, মোকাবিলা করব। ভয় পেয়ে দিশে হারালে চলবে না। তিনদিনের মধ্যে তেহরানের সেরা হোটেলের সেরা ডিনার খাব আমরা।'

রানার বুকে গাল ঘষল রানী।

'কথা দিচ্ছি...দিশে হারাব না আমি।'

'গুড গার্ল!' চুমো খেল রানা ওর কপালে। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

দু'জনে মিলে ঠেলে ঢালুতে গড়িয়ে দিল ড্রামগুলো। ড্রামের মুখগুলো উঁচুদিকে রেখে বেঁধেছে রানা, ভাসছে পানিতে। স্টেনগান হাতে নেমে এসে ভেলাটা টেনে রাখল রানা, নেমে এল রানী।

'উঠে পড়ো,' বলল রানা। 'আমার জন্যে জায়গা রেখে শুয়ে পড়ো এক পাশে।'

রানী উঠতেই একপাশে কাৎ হয়ে গেল ভেলা, চট করে উঠে পড়ল রানাও। দু'জনের চাপে অনেক নিচু হয়ে গেল ভেলাটা, ড্রামের মুখগুলো শুধু জেগে আছে, বাকি সবটা ডুবে গেছে পানির নিচে। পচা পানির দুর্গন্ধে নাক সিটকাল রানী।

একটা মোমবাতি আটকে দিল রানা প্রথম ড্রামের গায়ে, স্টেনগানের বাঁট দিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হেলেদুলে রওনা হয়ে গেল ভেলা।

কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না এভাবে। মনে হচ্ছে ওজন বাড়ছে স্টেনগানটার। রীতিমত ভারী মনে হচ্ছে ওটা এখন। পিঠের কাছে ব্যথা অনুভব করছে রানা। চারমাইল পথ এটা দিয়ে দাঁড় বাওয়া সম্ভব নয়। মিনিট বিশেক একটানা দাঁড় বাইবার পর পরিষ্কার বুঝতে পারল এভাবে অযথা শক্তির অপচয় করছে।

'নাহ্!' বলল রানা। স্টেনগান শুইয়ে দিল পাশে। 'এভাবে হবে না। হাত চালাতে হবে আমাদের। নাও, শুরু করো।'

ঘেন্নায় রিরি করে উঠল রানীর সর্বশরীর, কিন্তু কোন কথা না বলে হাত ডোবাল সে নোংরা পানিতে। দু'পাশ থেকে দাঁড় বাওয়ার মত করে হাত চালাতে শুরু করল দু'জন। এক হাতে চিৎ সাঁতারের মত। খুব ধীরে হলেও এগোচ্ছে ভেলা। আধঘণ্টা ধরে হাত চালাল ওরা চুপচাপ। ব্যথা হয়ে গেছে রানীর হাত,

কিন্তু থামল না সে, চালিয়ে যাচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে। রানা লক্ষ করল, ছাতটা ক্রমেই নেমে আসছে নিচে। ভয় পেল, একেবারে বুজে যাবে না তো! টের পাচ্ছে সে, এখানটায় পানি বেশ গভীর। বাতাসটাও খারাপ। হাঁফাচ্ছে সে নিজেও, কিন্তু রানীর হাঁফানীটা ফোঁপানোর মত শোনাচ্ছে।

'জিরিয়ে নাও একটু,' বলল রানা।

পানি থেকে হাতটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ জ্বলজ্বলে দুটো স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল রানী পানিতে। খুব কাছে। চমকে উঠে স্যাৎ করে টেনে নিল রানী হাতটা। দুলে উঠল ভেলাটা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা চকিত হয়ে।

'কি যেন দেখলাম পানিতে!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল রানী। মাথা উঁচু করে খুঁজল সে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

এইবার রানা দেখতে পেল স্ফুলিঙ্গ দুটো। ঝট করে হাত তুলে নিল সে। ওরেব্বাপ! বিরাট এক জল-ছুঁচো দাঁত বসাবার উপক্রম করেছিল ওর হাতে, ঝাঁপ দিয়েছিল, হাত সরিয়ে নেয়ায় ড্রামের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সরে গেল পিছনে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানী। চিৎকার ঠেকাবার জন্য মুখে হাত চাপা দিল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে পানির দিকে। অসংখ্য ছুঁচো কিলবিল করছে পানির মধ্যে।

ভেলাটা কাৎ হয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁচকা টান মেরে রানীকে শুইয়ে দিল রানা।

'ভয়ের কিছুই নেই,' বলল রানা। কিন্তু নিজেই ভয় পেয়ে গিয়েছে সে ওদের আকার এবং সংখ্যা দেখে। টের পেল, থেমে গেছে ভেলাটা। মোমবাতির কাঁপা আলোয় দেখতে পেল ভেলার চারপাশে মাথা ভাসিয়ে সাঁতার কাটছে অসংখ্য হিংস্র, ক্ষুধার্ত জল-ছুঁচো। জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুড়ঙ্গের নোংরা পানি। হাত নামালেই ক্ষতবিক্ষত করে দেবে দাঁত বসিয়ে।

স্টেনগানের বাঁট দিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল রানা প্রাণপণ শক্তিতে। দুলে উঠল ভেলাটা, তারপর ধীরগতিতে এগোতে শুরু করল আবার। পাগলের মত দাঁড় বেয়ে চলেছে রানা, গতি বাড়ছে ভেলার। কিন্তু ছুঁচোগুলোও এগোচ্ছে ওদের সাথে সাথে চার হাত পায়ে সাঁতার কেটে। জ্বলছে লাল চোখ আলো পড়ে।

একটা ধাড়ি ছুঁচো লাফ দিয়ে উঠে চার হাত-পায়ে জড়িয়ে ধরল স্টেনগানের ব্যারেল। রানার হাতে কামড় বসাতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাঁ হাতের ঝটকায় ফেলে দিল ওটাকে রানা পানিতে। আরও কয়েকটা লাফিয়ে ভেলায় ওঠার চেষ্টা করছে।

স্টেনটা সেমি অটোমেটিকে দিয়ে নলের মুখটা ফেরাল রানা পানির দিকে। টিপে দিল ট্রিগার। বদ্ধ জায়গায় স্টেনের আওয়াজটা শোনাল বোমা ফাটার আওয়াজের মত। কানে তালা লেগে গেল রানার। কিন্তু কাজ হলো। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল জানোয়ারগুলো। বিষম আতঙ্কে ডুব দিয়েছে ব্যাটারা। পালাচ্ছে জান নিয়ে যে যেদিকে পারে।

'হাত চালাও!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পাগলের মত হাত চালাল দু'জন। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় স্পীডবোটের গতি এসে গেল ভেলায়। কিন্তু এই বেগ ধরে রাখা গেল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

অবশ হয়ে গেল রানীর হাত। হাঁফাচ্ছে হাপরের মত।

'আর পারছি না!' ককিয়ে উঠল সে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মৃদু চাপড় দিল রানা ওর কাঁধে। 'খানিক বিশ্রাম নিয়ে নাও। হাত তুলে ফেলো পানি থেকে।'

নিজেও একটু ঢিল দিল রানা, হাত বদল করে নিল উপুড় হয়ে শুয়ে। এতক্ষণ দাঁড় বাইছিল ডান হাতে, এবার বাইছে বাঁ হাতে। কারণ ওর জানা আছে এক হাতে কোন কাজ করতে গিয়ে হাতটা যদি অবশ হয়ে আসে, খানিক বিশ্রাম নিলেই আবার ফিরে আসে জোর, কিন্তু বিশ্রাম না নিয়ে যদি অন্য হাতে কাজটা চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আরও অনেক দ্রুত ফিরে আসে অবশ হাতের জোর। রাশিয়ান কে একজন আবিষ্কার করেছে ব্যাপারটা।

বাঁ হাতের টানে ধীরে সুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে ভেলা। পাশে শুয়ে হাঁফাচ্ছে রানী চোখ বুজে। ঘাড় বাঁকিয়ে চুমো খেল রানা ওর ঠোঁটে। আবার মন দিল দাঁড় বাওয়ায়।

হঠাৎ কি যেন স্পর্শ করল ওর কাঁধ। মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার সর্বশরীর। ঝট্ করে চিৎ হওয়ার ইচ্ছেটা দমন করল সে, এর ফলে উল্টে যেতে পারে ভেলাটা। আবার কিসের যেন স্পর্শ পেল সে কাঁধে। সাবধানে মাথাটা ঘুরিয়ে দেখতে পেল রানা ছয় ইঞ্চি উপরেই সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো ছাত। সেখানেই ঘষা খাচ্ছে ওর কাঁধ।

গুহাটা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে নাকি পানিতে! সেক্ষেত্রে কি করবে ভেবে বের করতে সময় লাগল না ওর। সাবধানে চিৎ হলো আবার। হাত বাড়িয়ে ছাতের উঁচু নিচু পাথরের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছে এবার সে ভেলাটা। অসমান ঝাঁকিতে চোখ মেলেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানীর। রুদ্ধশ্বাসে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল সে অসমতল ছাতের দিকে।

'রানা! আর চেষ্টা করে কোন লাভ আছে? ডুবে যাচ্ছি আমরা।'

'ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে দুই হাতে খানিক "হেঁই মারো মারো টান" লাগাও দেখি।'

আতঙ্ক চেপে রেখে হাত লাগাল রানী। অনেক দ্রুত এগোল এবার ভেলা।

বাতাসটা ক্রমে খারাপ হয়ে আসছে। চাপা, ভাপসা, গ্যাসযুক্ত। দু'জনই হাঁফাচ্ছে সমানে। মাঝে মাঝে ছাতের এক আধটা নিচু হয়ে থাকা অংশের জন্যে দুর্গম হয়ে উঠছে যাত্রা। আগে থেকে দেখতে না পেলে ধাক্কা খাচ্ছে প্রচণ্ড, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে রানা। সময়ের হিসেব আর রইল না। ওদের মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এইভাবে দু'হাতে পাথরে ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা, পার হয়ে যাচ্ছে অনন্তপথ। সময় থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে রানী, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে হাত চালাচ্ছে সে। পরিপূর্ণ আস্থা আছে ওর রানার ওপর। ও যখন বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব, তখন কোন সন্দেহ নেই, বেরিয়ে ওরা ঠিকই যাবে। এখন শুধু কাজ করে যাওয়া দরকার। কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে শক্তি। অর্ধচেতন অবস্থায় অনুভব করল সে ভারী হয়ে আসছে হাত দুটো। এখন আর কোন সাড়া নেই

হাতে–কিভাবে উপরে উঠছে, পাথরের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। আপনাআপনি চলেছে হাতদুটো। দুর্বল হতে হতে এক সময় জ্ঞান হারাল সে।

দুর্বল হয়ে এসেছে রানাও। জোর পাচ্ছে না হাতে। তবু চালিয়ে গেল যন্ত্রের মত। দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভেলাটা, অনেক কমে গেছে গতি। মাতালের মত ধাক্কা দিয়ে চলেছে রানা, যেন স্বপ্নের ঘোরে আছে, হাত-পা সীসার মত ভারী। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে। মনে মনে বার বার বলে চলেছে–এখন জ্ঞান হারালে চলবে না, কষ্ট হোক, সব কষ্টেরই শেষ আছে, হাত চালাও, রানা।

কতক্ষণ যে এইভাবে আচ্ছন্নের মত পাথর ঠেলে এগিয়েছে বলতে পারবে না রানা, হঠাৎ অনুভব করল ছাতটা দূরে সরে যাচ্ছে, হাত দুটোকে লম্বা করতে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি। তার মানে কি পানি নেমে যাচ্ছে? নাকি ছাতটা উঁচু হচ্ছে? উঠে বসল সে। খানিক বাদে বসেও হাতে পেল না ছাতটা। থেমে যাচ্ছিল ভেলা, হাঁটু গেড়ে উঁচু হয়ে বসল রানা। তখন কাৎ হয়ে প্রায় উল্টে যাচ্ছিল ভেলা, ভারসাম্য ঠিক করে নিল চট করে। টের পেল, দূষিত বাতাস ক্রমে ভালর দিকে যাচ্ছে। তবে কি শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা এই মৃত্যুগুহা থেকে? দ্বিগুণ উৎসাহে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চলল সে পাথরে। আরও খানিক বাদে উঠে দাঁড়াতে হলো ওর। মিনিট দশেক পর কিছুই পেল না মাথার ওপর হাত তুলে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা মুক্ত বাতাস ঝাপটা দিল ওর চোখে মুখে।

বুক ভরে দম নিল রানা। প্রাণশক্তি ফিরে আসছে ওর দেহে। ভেলার ওপর শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে, বাঁ হাতে দাঁড় বাইতে শুরু করল আবার। জ্বলছে ক্ষতবিক্ষত হাত, তবু।

মুক্ত বাতাসে দম নিয়ে নড়ে উঠল রানী। চোখ মেলল।

'এসে গেছি!' রানার কণ্ঠে বিজয়োল্লাস। 'ওপারে পৌঁছতে আর দেরি নেই, রানী। হাত চালাও!'

বি.ও.এ.সির বোয়িং কাবুল এয়ারপোর্টে থেমে দাঁড়াতেই সবচেয়ে প্রথম নেমে এল নীতিশ গুহ। নেমেই দেখতে পেল টারম্যাকের ওপর দিয়ে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে আসছে লোকনাথ বিশ্বাস।

'একটা হেলিকপ্টার চার্টার করেছি,' বলল সে। 'ক্যাপ্টেন দিদারকে খবর দিয়ে রেখেছি। যেতে যেতে সব কথা বলব। এদিকে আসুন।'

মাথা ঝাঁকাল নীতিশ গুহ। দ্রুতপায়ে চলে গেল ওরা সিকি মাইল দূরে দাঁড়ানো একটা হেলিকপ্টারের দিকে। ওরা উঠে বসতেই ইঞ্জিন চালু করল পাইলট। সাঁ করে উঠে গেল শূন্যে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকনাথ বিশ্বাস ফিরল নীতিশ গুহর দিকে।

'পরিত্যক্ত এক কয়লা খনির ভেতর আটকা পড়েছে মাসুদ রানা। ওখান থেকে বেরোবার পথ মাত্র দুটো। প্রথম পথে বেরোবার চেষ্টা করেছিল ওরা সন্ধের দিকে। মুখটা বেরিয়েছে বর্ডারের মাইনফিল্ডে। হামাগুড়ি দিয়ে বর্ডার ক্রস করতে গিয়ে মাইন ফেটে মরেছে একজন...পাকিস্তান বর্ডার গার্ডের গুলিতে মারা গেছে

আরেকজন।'

'রানা কি তাহলে...'

'না। মাসুদ রানা নয়। ওরা ছিল মোট পাঁচজন। বরকতউল্লাহ মারা গেছে আগেই গ্রেনেড খেয়ে। এরা দু'জন ছিল কুশলগড়ের এক চাষী আর তার স্ত্রী। খনির ভেতর আটকা রয়েছে এখন মাসুদ রানা আর দিলারা দুররানী। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পথে বেরোবার চেষ্টা করবে ওরা এখন।'

'খনির দ্বিতীয় মুখ কোথায় বেরিয়েছে?'

'ওটা বেরিয়েছে আফগানিস্তানের ভেতর। সীমান্ত থেকে শ'পাঁচেক গজ পশ্চিমে।' নীতিশকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে মাথা নাড়ল লোকনাথ বিশ্বাস। 'কিন্তু ভয়ঙ্কর ওই পথটা। ক্যাপ্টেন দিদারের বর্ণনা অনুযায়ী সুড়ঙ্গটা পচা জলে ভর্তি, বিষাক্ত গ্যাসে দূষিত ভেতরের বাতাস, তার ওপর রয়েছে অসংখ্য মানুষ-খেকো জল-ছুঁচো। এতসব বাধা পেরিয়ে এপারে চলে আসা এক কথায় অসম্ভব। তবু বলা যায় না, মানুষ বেপরোয়া হয়ে গেলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে।'

'পাকিস্তান সাইডে কি রকম তৎপরতা চলছে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নীতিশ গুহ।

'ভয়ানক। ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আর সিকান্দার বিল্লাহ নিজে তদারক করছে সবকিছু। দে আর ড্যাম সিরিয়াস। মাইনফিল্ড পরিষ্কার করে এক প্ল্যাটুন সৈন্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ভেতরে। তিনটে এয়ারশ্যাফটের মধ্যে দিয়ে আরও তিন প্ল্যাটুন নামানো হয়েছিল আগেই। এদের ফাঁকি দিয়ে খনি থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

একগাল হাসল নীতিশ গুহ। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'রানাকে চিনি আমি। আসুন বাজি হয়ে যাক? পাঁচশো টাকা। ও বেরোতে না পারলে পাঁচশো টাকা দেব আমি আপনাকে।'

'উঁহুঁ!' প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল লোকনাথ বিশ্বাস। 'মাসুদ রানার ব্যাপারে বাজি ধরতে রাজি নই আমি। ওর কথা আমিও শুনেছি অনেক।'

সীমান্তের দিকে চলেছে হেলিকপ্টার। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল নীতিশ।

পুব আকাশে ভোরের আভাস।

আট

বিচলিত হয়ে উঠল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। সীমান্তের এপারে এত তৎপরতা কেন? এদিকে তো প্রহরার ব্যবস্থা ঢিলে বলেই জানা ছিল ওর। প্রায়ই তো গোলাগুলি হয় বর্ডারে, কিন্তু এপারের এরা তো এতটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে না কখনও। রানার ব্যাপারটা জেনে গেল নাকি ওরা কোনভাবে?

তিন তিনবার লুকাতে হয়েছে ওর ঝোপের আড়ালে। টহল দিচ্ছে আফগান

সৈন্য। এদিকের বর্ডার গার্ডের হেডকোয়ার্টার মাতুনে। ওখানে এক কোম্পানী আফগান সৈন্য আছে, জানা আছে তারিক আখতারের। বিশেষ কোন সংবাদ না পেয়ে এত অল্প সময়ে বর্ডারে সৈন্য পাঠানো হয়নি নিশ্চয়ই? সাবধানে এগোতে হচ্ছে বলে অনেক দেরি হয়ে গেছে ওর। ভোর সোয়া চারটা। পুব আকাশে অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে।

চারপাশটা ভালমত দেখে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল তারিক আখতার। এক সেকশন সোলজার মার্চ করে চলে গেল দক্ষিণ-পুব দিকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারিক আখতার। কিন্তু মিনিট বিশেক হাঁটতেই হালকা হয়ে এল কাঁটা ঝোপের জঙ্গল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামনে বেশ কিছুদূর ফাঁকা মাঠ। বালি, মাঝে মাঝে কর্কশ ঘাসের গুচ্ছ। তারপর কোমর সমান ঝোপ শুরু হয়েছে আবার।

কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে দুই মিনিট। ডান দিকে লোকজনের নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে সে। দূর থেকে লম্বা করে ডাক দিল কে যেন।

খনি-মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। গর্তের চারপাশে ঘন ঝোপ আর ঘাসের গুচ্ছ। বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। তার আপন ভাইয়ের হত্যাকারী বেরিয়ে আসবে ওই গুহা পথে। দূরত্বটা আন্দাজ করে বুঝতে পারল তারিক আখতার এত দূর থেকে পিস্তল ছুঁড়ে ঠিক জায়গামত গুলি ঢোকানো মুশকিল হবে। গুলি লাগবে ঠিকই, কিন্তু ওর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। আরও কাছে যাওয়া দরকার। অর্থাৎ এই ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ছেড়ে সামনে এগোতে হবে। কান পাতল আবার। অনেক দূরে সরে গেছে কথাবার্তা আর পায়ের আওয়াজ। খানিক ইতস্তত করে ঝুঁকি নেয়াই স্থির করল সে। এখন আর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা যায় না। দৌড়ে পার হয়ে গেল ফাঁকা মাঠটা, মাঠ পেরিয়েই ডাইভ দিয়ে চলে গেল কোমর-সমান ঝোপের আড়ালে। একটা তীক্ষ্ণ হুইসেল বেজে ওঠার অপেক্ষা করল সে, আশা করল ধুপধাপ কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পাবে বুঝি এখুনি। কিন্তু এসব কিছুই শোনা গেল না। দু'মিনিট প্রতীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চারপাশটা দেখল সে ভাল করে। বাঁ পাশে ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া ছোট্ট একটা টিলা দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে চমৎকার টার্গেট পাওয়া যাবে। সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিতে পারবে সে প্রথম গুলিটাই...অবশ্য, এত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে রানা যদি সত্যিই এপারে পৌঁছতে পারে, তবেই।

এক ছুটে টিলার মাথায় উঠে পড়ল সে। শুয়ে পড়ল ঘন এক গুচ্ছ ঘাসের পাশে। শুয়ে শুয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল সে পিস্তলটা। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়ে ম্যাগাজিন থেকে গুলি বের করে গুনল, চেম্বার থেকে গুলিটা বের করে আনল স্লাইড টেনে, ইজেক্টার স্প্রিঙের টেনশন পরীক্ষা করল। সব দেখে সন্তুষ্ট হলো তারিক আখতার। পিস্তলটা লোড করে নিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় শুইয়ে রাখল বালির ওপর, হাতের কাছে, যাতে মুহূর্তে তুলে নিয়ে গুলি করতে পারে।

এইবার নানান টুকরো কথা আসতে শুরু করল ওর মাথার মধ্যে। বড় ভাই জেনারেল এহতেশামের কথা মনে এল। বাপ মারা গিয়েছিল অল্পবয়সেই, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল ওকে বড় ভাই। এই ভাইয়ের ছত্র-ছায়ায় বাপের

অভাব কোনদিন টের পায়নি সে। হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠল মানসচক্ষে। মনে মনে বলল, ভাইয়া দোয়া করো, যেন তোমার বদলা নিতে পারি আজ।

কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে? বিল্লার কথাই হয়তো ঠিক। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাইনফিল্ড পরিষ্কার করে ঢুকে পড়েছে সৈন্যরা খনির মধ্যে। হয়তো ধরা পড়েছে মাসুদ রানা, কিংবা মারা পড়েছে। হয়তো অনর্থক সময় নষ্ট করছে সে এখানে শুয়ে শুয়ে।

দূর থেকে আবার লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ এল। পিছনে জঙ্গলের দিকে চেয়ে কোন নড়াচড়ার লক্ষণ টের পেল না সে। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারল একটা ব্যাপার। চারপাশে আফগান ট্রুপ্স রয়েছে, ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু গুলির আওয়াজ? এতক্ষণ কথাটা মনেই আসেনি ওর। গুলির আওয়াজ তো আর ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। রানাকে যদি মেরে ফেলা সম্ভব হয়ও, নিজেরও নিস্তার নেই। ঘিরে ফেলবে সৈন্যরা চারপাশ থেকে। পালাবার আর কোন পথ থাকবে না। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেকেন্ড ম্যান–ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারকে হাতে পেলে ধেই ধেই করে নাচবে আর বগল বাজাবে আফগান সরকার।

কাজেই? ধরা পড়লে চলবে না ওর। ওর ধরা পড়াটা পাকিস্তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল হবে। অতএব? অতএব গুলি করা চলবে না। খালি হাতে খুন করবে সে রানাকে। মুচকি হাসল তারিক আখতার। প্রচণ্ড শক্তি তার বিশাল শরীরে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে সে রানাকে।

গর্ত-মুখটা পরীক্ষা করল সে নতুন প্রেক্ষিতে। খালিহাতে আক্রমণের জন্যে বর্তমান জায়গাটা পছন্দ হলো না ওর। গুহা মুখের ওপরে ঢালু জায়গাটায় অপেক্ষা করবে সে। রানা বেরোলেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ে।

সূর্য উঠি উঠি করছে। বুকে হেঁটে এগোল ব্রিগেডিয়ার তার পছন্দসই জায়গার দিকে।

লোকনাথকে দেখে এক গাল হাসল জীপে বসা ক্যাপ্টেন দিদার। পরিচয়-পর্বের পর নীতিশ গুহের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'মাসুদ রানা লোকটা দারুণ ইম্পরট্যান্ট বলে মনে হচ্ছে! একেবারে তেহরান থেকে ছুটে এসেছেন?'

'ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে,' বলল নীতিশ। 'খনি-মুখটা গার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন?' সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল সামনে।

'না,' একটা সিগারেট বের করে নিয়ে বলল দিদার। 'গুহামুখ গার্ড দিয়ে কি হবে? মাসুদ রানাকে তো আর আমরা ঠেকাতে চাই না। বর্ডার গার্ড দিচ্ছি আমরা। তিন প্ল্যাটুন আর্মি টহল দিচ্ছে এদিকটায়।' নীতিশের জ্বলন্ত লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি, ওরা যেমন আদাজল খেয়ে লেগেছে লোকটার পেছনে, অতর্কিতে আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়ে ছিনিয়ে না নিয়ে যায়। তাই মাইনফিল্ড পরিষ্কার করতে দেখেই ট্রুপস্ কল করছি। আরও দুই প্ল্যাটুন রওনা হয়ে গিয়েছে। এখন আর সে ভয় নেই।'

'ভেরি গুড,' বলল নীতিশ। 'ওয়াইয ডিসিশন। থ্যাঙ্ক ইউ। এবার তাহলে

রানার সংবর্ধনার জন্যে নিশ্চিন্তে রওনা হতে পারি আমরা খনি-মুখের দিকে?'

'তা পারেন। হেঁটে যেতে হবে। লোকটার এপারে পৌঁছানোর ব্যাপারে যদিও আমি খুব একটা আশাবাদী নই, তবু লোক দিচ্ছি সাথে। অ্যাই, শাব্বির...'

ভেলা এসে ঠেকল ডাঙায়। ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে খনি-মুখ দিয়ে বাইরে স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, উত্তপ্ত শরীরে বাতাসটা মনে হচ্ছে খোদার আশীর্বাদ। দু'মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওরা ভেলার ওপর, তারপর হাঁটু পানিতে নেমে টেনে ভেলার অর্ধেকটা তুলে আনল রানা বালির ওপর। সোজা হতে গিয়ে টের পেল সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা।

'এসে গেছি,' বলল রানা। 'আর কোন ভয় নেই। আমরা এখন আফগানিস্তানে।'

অপূর্ব সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটল রানীর ক্লান্ত মুখে। রানার হাত ধরে নেমে এল তীরে। এগোতে গিয়ে টলে উঠল ওর পা, পড়ে যাচ্ছিল, ওকে ধরতে গিয়ে রানাও পড়ল ওর সাথে। হেসে উঠল দু'জন একসাথে। নির্মল আনন্দের হাসি। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা, গায়ে আর শক্তি নেই–এইটাই হাসির বিষয়। চরসসেবীর মত অনর্থক হাসল ওরা কিছুক্ষণ, হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল রানী। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল রানা। চুপচাপ পড়ে রইল ওরা পাঁচ মিনিট। তারপর উঠে বসল রানা।

বুঝতে পারছে রানা, বর্ডার পেরিয়ে এসেছে ঠিকই, প্রাণের ভয় হয়তো নেই আর, কিন্তু কষ্টের শেষ হয়নি এখনও। লোকালয়ে পৌঁছতে পারলে কিছুটা লাঘব হবে কষ্ট, তাও বলা যায় না। ওদের জন্যে কেমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে সেটা বোঝা যাবে সেখানে পৌঁছনোর পরেই। কতদূর? কতদূর হাঁটতে হবে ওদের লোকালয়ে পৌঁছতে হলে? কোন্দিকে হাঁটবে ওরা? রানী পারবে হাঁটতে?

সেটা এখান থেকে বেরোলেই বোঝা যাবে–ভাবল রানা। উঠে গিয়ে ভেলার সাথে বাঁধা রাকস্যাকটা খুলে নিয়ে এল। স্টেনগানটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। রানীর পাশে এসে দাঁড়াল।

'চলো, এগোনো যাক।'

বাম বাহুর ওপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানী। আধবোজা চোখে চেয়ে রইল সে রানার মুখের দিকে। হাসল।

'আশ্চর্য মানুষ তুমি, রানা। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'এবার আমাকে একটু কৃতজ্ঞ করো। উঠে পড়ো দয়া করে।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানী, টেনে তুলল ওকে রানা।

নিজের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শিউরে উঠল রানী। 'ও মা! কি ছিরি হয়েছে জামা-কাপড়ের! লোকের সামনে বেরোব কি করে?'

হেসে উঠল রানা।

'এখানে কেউ চিনবে না তোমাকে। কেউ টের পাবে না যে তুমি মেথররানী নও, বিখ্যাত পপ্ সিঙ্গার দিলারা দুররানী। লজ্জার কিছুই নেই।'

পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে গেল ওরা। খনি-মুখের কাছে পৌঁছেই থামল রানা, কাঁধে হাত রেখে থামাল রানীকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

'তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি বাইরেটা দেখে আসি। এত কষ্টের পর আফগান গার্ডের গুলি খেয়ে মরলে দুঃখ থেকে যাবে মরার পরেও।' র‍্যাকস্যাক আর স্টেনগান মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। 'আমি ইশারা করলেই বেরিয়ে আসবে তুমি।'

'না!' খপ করে রানার একটা হাত চেপে ধরল রানী। 'একা থাকতে পারব না! আমিও যাব তোমার সাথে।'

'যা বলছি, তাই করো।' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'বাইরে বেরোনো নিরাপদ কিনা দেখতে হবে আগে।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার হাত ছেড়ে দিল রানী। শক্ত করল মনটা।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের মুখে। বাইরে রোদ, ঘাসের গুচ্ছ, বালু, ঝোপ আর আকাশ। কয়েকশো গজ দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সব চুপচাপ। সকালের রোদে ঘাসের গুচ্ছের লম্বা ছায়া পড়েছে বালির ওপর। নীল আকাশে অলস সাদা মেঘ। শান্তির প্রতীক। অপূর্ব এক সকাল।

প্রকৃতির এই শান্তশিষ্ট রূপ দেখে ভুলল না রানা। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। দুই মিনিট পার হয়ে গেল—কোথাও কোন শব্দ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরতে যাচ্ছিল, এমনি সময় দেখতে পেল সে জুতোর ছাপটা। ধক করে উঠল রানার কলজেটা। খনি-মুখের কয়েক গজ দূরে ঘাসের গুচ্ছের পাশে বালির ওপর একটা জুতোর দাগ। আশেপাশে আরও পায়ের ছাপ খুঁজল সে, কিন্তু পাওয়া গেল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই জুতোর মালিক যে-ই হোক, সে তার পায়ের ছাপ গোপন করতে চেয়েছে। এক ঘাসের গুচ্ছ থেকে লাফিয়ে চলে গেছে আরেক গুচ্ছে—হঠাৎ পা ফসকে যাওয়ায় এই ছাপটা পড়েছে বালির ওপর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

অর্থাৎ? জুতোর ছাপটা আবার পরীক্ষা করল রানা। জুতোর সাইজটা সাধারণের চেয়ে বড়, ছাপটাও বেশি গভীর। লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড চেহারার কোন লোক। লম্বা চওড়া...কে?...তারিক আখতার? বর্ডার পেরিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে খনি-মুখের কাছে? এত বড় ঝুঁকি নেয়া ওর পক্ষে সম্ভব? একজন ব্রিগেডিয়ার হয়েও?

দুঃসাহসী জেনারেল এহতেশামের কথা মনে পড়ল রানার। বুঝতে পারল তার ভাই তারিক আখতারের পক্ষে এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব। খনির মধ্যে আর্মি পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না সে, ভাল করেই চেনে সে রানাকে, জানে যত কঠিনই হোক, দ্বিতীয় খনি-মুখ দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করবে রানা। রানার বন্দীত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে আফগানিস্তানের এই খনি-মুখটাও পাহারা দিতে হবে। তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, ধরা পড়বার ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছে তারিক আখতার এখানে? একা, না আর কেউ আছে ওর সাথে?

রানীর কাছে ফিরে এল সে।

'মনে হচ্ছে ঝামেলা বেধে গেছে একটা,' নিচু গলায় বলল রানা। 'খুব সম্ভব

বাইরে ঘাপটি মেরে বসে আছে তারিক আখতার।'
বিস্ফারিত হয়ে গেল রানীর চোখ জোড়া। চট্ করে রানার হাত ধরল।
'ভয় নেই,' বলল রানা। 'এত বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, এটাও পারব।' স্টেনটা তুলে নিল সে হাতে। 'এ জিনিস চালিয়েছ কোনদিন আগে?'
মাথা নাড়ল রানী, মুখে 'না' বলল, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে।
'খুব সহজ। এই যে…অটোমেটিকে সেট করে দিচ্ছি, শক্ত করে ধরে শুধু ট্রিগারে চাপ দিলেই হবে।' স্টেনটা ধরিয়ে দিল সে রানীর কাঁপা হাতে। 'ম্যাগাজিনে উনিশটা গুলি আছে। ট্রিগারে চাপ দিয়ে ধরলেই কড়কড় করে বেরিয়ে যাবে গুলিগুলো আপনা-আপনি। বুঝতে পেরেছ?'
মাথা ঝাঁকাল রানী।
'আমার সাথে গুহার মুখ পর্যন্ত আসবে তুমি। আমি বেরিয়ে পড়ব বাইরে। সাথে সাথেই তুমি আকাশের দিকে লক্ষ করে টিপে ধরবে ট্রিগার। শক্ত করে ধরে রেখো–বেশ ঝাঁকি লাগবে। গুলির আওয়াজে থতমত খেয়ে যাবে তারিক, সেই সুযোগে বের করে ফেলব আমি ও কোথায় লুকিয়ে আছে। এই আওয়াজে বর্ডার গার্ডও ছুটে আসবে যে যেখানে আছে! বুঝেছ?'
রানা যখন বোঝাচ্ছে রানীকে, সেই সময় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল তারিক আখতার। গুহামুখের কাছে রানার আবছা ছায়া দেখতে পেয়েছে সে। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে রানার কথাবার্তা, যদিও বোঝা যাচ্ছে না কি বলছে। হঠাৎ দূর থেকে উচ্চকণ্ঠে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। মনে হলো জটিলেশ্বরের সহকারী নীতিশের গলা। আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না সে–যা কররার এখুনি করতে হবে।
রানীর কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা।
'কোন ভয় নেই। তোমার শুধু…'
'খবরদার!' হুঙ্কার ছাড়ল তারিক আখতার। হাতে পিস্তল। 'এক পা নড়বে না কেউ!'
স্টেনটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানী। এগিয়ে এল তারিক আখতার। দু'জনের মাঝখানে তাক করে রেখেছে সে পিস্তলটা–যে নড়বে সে গুলি খাবে।
'হ্যালো, এক্স কোলিগ! কেমন আছ?' মৃদু হাসল রানা। 'পিপীলিকার পাখা গজে মরিবার তরে। মরবার আর জায়গা পেলে না, আমার হাতেই মরার সাধ হলো?'
'বেরিয়ে এসো!' চাপা গলায় বলল তারিক আখতার। ঝড়ের মত শ্বাস বইছে ওর। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে। 'মেয়েছেলেটা যেখানে আছে সেখানেই থাক, তুমি এগিয়ে এসো। তোমাকেই দরকার আমার।'
দ্রুত চিন্তা করছে রানা। গুলি করতে হলে বাইরে বের করে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ইচ্ছে করলে এখানেই গুলি করে খতম করে দিতে পারে তারিক ওদের দু'জনকেই। করছে না, তার কারণ গুলির শব্দে আফগান গার্ড এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা রয়েছে। ধরা পড়ে যাচ্ছে তাহলে ব্রিগেডিয়ার। কাজেই পিস্তলটা ধোঁকা। গুলি করতে পারে না তারিক।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা তারিক আখতারকে। স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে লোকটার ভিতরের চাপা উত্তেজনা। এক পা-ও নড়ল না সে।

'পালাও, তারিক,' বলল সে। 'কপালের জোর থাকলে নিরাপদে নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারবে। এখনও সময় আছে। এ সুযোগ পাবে না আর পরে।'

'চোপ রাও!' গর্জে উঠল তারিক আখতার। পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে সামনে এগোবার জন্যে, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল ও যে পিস্তল ব্যবহার করবে না সেটা বুঝে নিয়েছে রানা। বলল, 'বদলা নিতে এসেছি আমি! এর ফলে যদি আমার নিজের প্রাণ যায়, তাও সই। আমার হাতে মরণ হবে আজ তোমার।'

'বদলা?' অবাক হলো রানা। 'কিসের বদলা নিতে এসেছ তুমি, তারিক? তোমার সাথে আমার তো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।'

'ভুলে গেছ, আমি জেনারেল এহতেশামের ছোট ভাই। তোমার হাতেই প্রাণ দিয়েছে আমার ভাই বার্মার মান্দালয়ে। বাহাত্তর সালে। মনে আছে?'

'ওহ্!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা ব্রিগেডিয়ারের মুখের দিকে। ও তাহলে ধরে নিয়েছে জেনারেল এহতেশামের মৃত্যু ঘটেছিল রানারই হাতে? দেখো কাণ্ড। কার পিণ্ডি কার ঘাড়ে এসে পড়ে। ব্যাটা মরল ডক্টর হুয়াং-এর* গুলিতে, আর এই শালা বদলা নিতে এসেছে ওর ওপর। এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা, কেন এতবড় ঝুঁকি নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে তারিক। খুনের বদলে খুন নিতে এসেছে সে, প্রতিশোধ নিতে এসেছে ভ্রাতৃহত্যার।

'দেখো, তারিক...'

বক্তব্য শেষ করতে পারল না রানা। ক্লিক করে শব্দ হলো সেফটি ক্যাচ অন করার, পরমুহূর্তে সাঁই করে পিস্তলটা ছুঁড়ে মেরেছে তারিক। ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা, খটাশ করে পিছনের দেয়ালে গিয়ে লাগল ওটা, ছিটকে চলে গেল কয়েক হাত দূরে। পিস্তলের হাত থেকে বাঁচল রানা, কিন্তু ভারসাম্য সামলে নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার আগেই ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ল তারিক আখতার।

বিশাল শরীরের ধাক্কায় পড়ে গেল রানা, ওর ওপর পড়ল তারিক আখতার। রানার বুকের ওপর শুয়ে এক লাথিতে রানীকে পাঠিয়ে দিল সে একেবারে পানির ধারে। টিপে ধরল রানার গলা।

চাপের চোটে জিভ বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো রানার, ফুলে উঠল কপালের শিরা। কব্জি ধরে টানাটানি করে সরাতে পারল না সে ইস্পাতদৃঢ় হাত দুটো। অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে। তাছাড়া সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে নিজে। খানিকক্ষণ ছটফট করল সে, পা ভাঁজ করে বাধাবার চেষ্টা করল তারিক আখতারের গলায়, পারল না। এইবার দুই হাতে তারিকের দুই

---

* রানা ৩০ 'রক্তের রঙ ২' দ্রষ্টব্য

কড়ে আঙুল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল দু'পাশে। তীব্র ব্যথায় নাক দিয়ে খড়খড়ে আওয়াজ বেরোল তারিকের, ঢিল হয়ে গেল হাতের চাপ। এইবার আঙুল সোজা রেখে কারাতের কোপ মারল রানা ওর ঘাড়ের পাশে। গায়ে জোর নেই, তবু যেটুকু আছে তাতেই গলা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল তারিক পেছন দিকে। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল সে রানার চোখ মুখ লক্ষ্য করে। ওই ঘুষি লাগলে নাক-মুখ-কপাল সমান হয়ে যেত রানার, কিন্তু লাগল না। চট করে তিন ইঞ্চি সরে গেল ওর মাথাটা, ধাঁই করে পড়ল ঘুষিটা পাথরের ওপর। কড়াৎ করে শব্দ হলো। অসহ্য ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল তারিক আখতার, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড এক লাথি তুলেছিল, কিন্তু নিজেই উল্টে পড়ল। যে পা-টা মাটিতে ছিল সেটা ছোট্ট একটা লাথিতে শূন্যে তুলে দিয়েছে রানা। হুড়মুড় করে চার হাত পায়ে পড়ল মাটিতে। সাথে সাথেই এক লাফে উঠে পড়ল আবার।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পারছে, শুধু কৌশলে ঠেকাতে পারবে না সে তারিককে। বুনো মহিষের শক্তির কাছে টিকবে না কৌশল। খানিকটা জোর এবং তড়িৎগতি থাকলে হয়তো সামলানো যেত কোনমতে। এ দুটোর কোনটাই নেই ওর ক্লান্ত শরীরে।

থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত ডান হাতটা একটু পিছিয়ে রেখে ঝাঁপ দিল তারিক। চিৎ হয়ে পড়ল রানা, কিন্তু এবার আর বুকের ওপর চাপতে দিল না তারিককে, পেটে পা বাধিয়ে ছুঁড়ে দিল ওকে মাথার ওপর দিয়ে জুডোর কায়দায়। দড়াম করে আছড়ে পড়ল তারিক–রানার শরীরের ওপর দিয়ে উল্টে গিয়ে। 'হুঁক' করে একটা শব্দ বেরোল ওর নাক দিয়ে। উঠে বসল রানা, দেখল মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে দানবটা। এবার খালি হাতে নয়, প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলে নিয়েছে দুই হাতে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। তিনহাত তফাতে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে রানী ওর দিকে, হাতে স্টেনগান, তর্জনী ট্রিগারে। থরথর করে কাঁপছে স্টেনটা।

রানীর মরিয়া ভাব দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'মেরো না! রানী, মেরো না ওকে!'

দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে রানীর ঠোঁট। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'মারব! নইলে ও মেরে ফেলবে আমাদের!'

'রানী!'

রানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল রানীর। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। রানার দিকে চেয়ে দেখল ওর হাতে ওয়ালথার। আরও এক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু স্টেনের মুখটা সরাল না তারিক আখতারের দিক থেকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে স্টেনটা নিয়ে নিল রানীর হাত থেকে।

এইবার মরণ।–ভাবল তারিক আখতার, এখুনি ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুকটা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রানার হাতে ধরা স্টেনগানের দিকে।

বিশ সেকেন্ড চুপচাপ কাটল, তারপর হঠাৎ হেসে উঠল রানা।

'ভয় নেই, গুলি করব না,' ভেলার দিকে ইঙ্গিত করল। 'যাও, সোজা গিয়ে ভেলায় ওঠো। বাইরে লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই পথে

নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে পাকিস্তানে। যাও, কেটে পড়ো!'

সবুজ চোখ দুটোয় বিস্ময় ফুটে উঠল। বুঝতে পেরেছে সে, ঠাট্টা করছে না রানা। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখল রানাকে। তারপর বলল, 'আমি তোমাকে খুন করতে এসেছিলাম। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলেই খুন করব। আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে বলে তোমাকে আমার খুন করতেই হবে–এমন কোন কথা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই। খুন করা বা না করা আমার ইচ্ছে। ধরে নাও, এই মুহূর্তে আমি চাই না তোমার মত একজন সৎ, যোগ্য লোক অকালে বিদায় নিক দুনিয়া থেকে। তবে ভবিষ্যতের কথা আলাদা। তখন তোমার হাতে আমি মরব, না আমার হাতে তুমি মরবে বলা যায় না। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎটা আসবার আগে তোমাকে কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে অনুরোধ করব। দেশে ফিরে যাও, গিয়ে ভাল করে খোঁজ নাও কার গুলিতে মারা গিয়েছিল তোমার ভাই। শুনেছি করাচীর এক হাসপাতালে রয়েছে মৃত্যুপথযাত্রী কর্নেল শেখ। ও ছিল ঘটনাস্থলে। ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। মরার আগে ও মিথ্যেকথা বলবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'তার মানে···তুমি···তুমি আমার ভাইয়ের হত্যাকারী নও?'

'সেটা ওর কাছেই গিয়ে শোনো। যাও, লোকজন এসে পড়ছে।'

'সত্যি বলছ তুমি, রানা!' কয়েক পা এগিয়ে এল তারিক আখতার।

'মিথ্যে বলে আমার লাভ? শত্রু পুষে না রেখে এক গুলিতে খতম করে দেয়াই কি আমার পক্ষে সহজ হত না?'

প্রকাণ্ড একটা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। চোখ দুটো ভিজে এল।

'অথচ···রানা···অথচ আমি তোমাকে···মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছিল···'

'ওফ্! কথা বেশি কাজ কম!' বিরক্ত হলো রানা। 'ভাগো তো এখন!' স্টেনগানটা এগিয়ে দিল সে ওর দিকে। 'এটা সাথে রাখো। এটা ছাড়া ওপারে পৌঁছতে পারবে না। মানুষখেকো ছুঁচোগুলো ছেঁকে ধরলে সেমিতে দিয়ে ফাঁকা আওয়াজ কোরো, পালাবে সব।'

হাত বাড়াল না তারিক। হাঁ করে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে।

'তোমার মাথা খারাপ, রানা!'

'আমাদের সবারই,' হাসল রানা। 'আমরা যারাই এই সার্ভিসে কাজ করি, সব ক'টার মাথা খারাপ। নইলে টিকতে পারত না এই বিচ্ছিরি কাজে। তোমাকেও ভাল করেই চিনি আমি, তারিক। ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার কোলিগ ছিলাম।' স্টেনটা ঝাঁকাল রানা। 'নাও, ধরো!'

'গুলি ভর্তি স্টেন তুলে দিচ্ছ তুমি আমার হাতে!'

'ছাগল নাকি একটা! গুলি ছাড়া ছুঁচোর হাত থেকে নিস্তার পাবে কি করে? কাম অন, ম্যান! টেক ইট!'

গুহা-মুখে কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। স্টেনটা তারিকের হাতে গুঁজে দিয়ে পিছন ফিরল রানা। দেখল ভয়ে উৎকণ্ঠায় রানীর চোখ

দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর স্থির বিশ্বাস, এখুনি ঝাঁঝরা করে দেবে লোকটা রানার পিঠ।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'ভয় নেই, রানী। মারবে না। ও, আমি দু'জনেই এমন একজন মহৎ বুড়ো মানুষের কাছে শিক্ষা পেয়েছি, যিনি আমাদের শুধু আক্রমণ আর আত্মরক্ষার কৌশলই শেখাননি, কলজের মধ্যে নখ বসিয়ে টান দিয়ে বড় করে দিয়েছেন মনটাও। চলো, এগোনো যাক।' কয়েক পা এগিয়ে পিছন ফিরে হাত নাড়ল রানা। 'গুড বাই, অ্যান্ড গুড লাক। কোনদিন হয়তো দেখা হবে আবার।'

ব্রিগেডিয়ারের দুই গালে ভেজা চকমকে দুটো রেখা দেখতে পেল রানা। চট্ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঠেলে পানিতে নামাচ্ছে সে ভেলাটা।

রাকস্যাকটা পিঠে বেঁধে নিয়ে এগোল রানা গুহা-মুখের দিকে।

বাইরে উজ্জ্বল সকাল অপেক্ষা করছে হাসি মুখে।

নয়

বাহারেস্তান স্কয়ার। খৈয়াম ভবনের তেতলা।

সুইভেল চেয়ারে বসে একমনে ফাইল দেখছিল জটিলেশ্বর রায়, হঠাৎ মাথা তুলেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর।

টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা!

তিন সেকেন্ড ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল জটিলেশ্বর, তারপর চিনতে পেরে আঁৎকে উঠল ভয়ানক ভাবে। চট করে এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র খুঁজল।

'আপনি! আপনি কি করে এলেন এখানে?'

'হাওয়ায় ভেসে।' একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। হাসল জটিলেশ্বরের দিকে চেয়ে। 'ভয় নেই। খুন করতে আসিনি। কোন কৈফিয়ৎও তলব করব না।'

'তাহলে? তাহলে কেন এসেছেন?'

'বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। ভাবলাম দেখাটা সেরে কমপ্লিমেন্ট জানিয়ে যাই। বড় সুন্দর ফাঁদ পেতেছিলেন, মি. রায়! কোনরকম সন্দেহ না করেই পা দিয়েছিলাম আমি আপনার ফাঁদে। ভেজাল বিষ খেয়ে যমের দুয়ার থেকে নিশ্চিত মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফিরে এসে স্বৈরিণী স্ত্রীর সামনে দাঁড়ালে তার যে অবস্থা হয়, আপনার চেহারাটা সেই রকম লাগছে। আপনি হয়তো আশা করছেন, আমি কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি, জানতে চাইব কেন ঠেলে দেয়া হয়েছিল আমাকে মৃত্যুর মুখে! কিন্তু না। জবাবদিহির জন্যে আসিনি আমি। আমি জানি কেন আপনি কাজটা করেছেন। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন আপনি—ঠিক আছে, এটাই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। হেরে গিয়ে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন আপনি, বুঝতে পারছি, কিন্তু দেশের স্বার্থে আপনাকে পরাজিত না করে উপায়ও ছিল না আমার।'

'দেশের স্বার্থে?' হঠাৎ ফুঁসে উঠল জটিলেশ্বর। 'বলুন, ব্যক্তিগত স্বার্থে। ভারতের প্রাপ্য বারো কোটি ডলার আপনি খসিয়ে নিয়েছেন নিজের...'

'ভুল বলছেন। ও টাকা বাংলাদেশের প্রাপ্য ছিল। আপনি লোভে পড়ে মেরে দিতে চেয়েছিলেন, আমি সে সুযোগ দিইনি।'

'বাংলাদেশের প্রাপ্য ছিল ঠিক–আমি লোভে পড়েছিলাম, তাও ঠিক–কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। দেশের জন্যে...'

'বুঝলাম, ব্যক্তিগত সুবিধের জন্যে কাজটা আপনি করছিলেন না, করছিলেন দেশের জন্যে। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন আমি ওটা নিজে মেরে দেয়ার জন্যে নিচ্ছি, দেশের জন্যে নয়?'

'সহজেই বোঝা যায় সেটা। যাকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে কান ধরে বের করে দেয়া হয়েছে...'

'পয়েন্ট নাম্বার টু...কি করে জানলেন যে আমাকে বের করে দেয়া হয়েছে?'

এই প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গেল জটিলেশ্বর। চশমাটা ঠিক করল বাঁ হাতে।

হাসল রানা।

'যা খুশি ভেবে নিলেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না, মি. রায়। যেমন আপনি ভেবে নিয়েছিলেন লাহোরে গিয়ে মারা পড়ব আমি। এত নিখুঁত প্ল্যান সত্ত্বেও, কই মরলাম তো না। এইজন্যেই আপনার প্ল্যানের সাথে ভেজাল বিষের তুলনা দিয়েছিলাম। টপ সিক্রেট মেমোটা পেয়ে খুব একচোট হেসেছিলাম প্রথমে। ভাবলাম ওটা নিয়ে কি করা যায়। দোটানায় ভুগলাম কিছুক্ষণ। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, ফিরিয়ে দেব ওটা আপনাকে।'

'কেন?'

'এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। কেন? চন্দ্রগুপ্তের কাছে আপনার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্ল্যানের কথা জানার পরও কেন ওটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে কমোডে ফেলে চেন টেনে দিলাম না জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি। পাকিস্তানের হাতে মেমোটা তুলে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওতে বাংলাদেশের স্বার্থও জড়িত ছিল–কিন্তু ওটা নষ্ট করে ফেলতে পারতাম আমি সহজেই। কেন করিনি সেটা আমি নিজেও ভাল করে বুঝি না। নিছক দুর্বলতা বলুন আর যাই বলুন, আপনার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ এখনও রয়েছে আমার মধ্যে। অতীতে আপনার কিছু কিছু কাজে আশ্চর্য প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ দেখে চমকে গেছি, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি আমি। এমন একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে–হোক সে একটু হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ, অনুদার–শেষ করে দিতে ইচ্ছে হলো না। ওই টি.এস. মেমোটা হারালে চাকরিটা যেত আপনার–ক্ষতি হত আমাদের।' কোটের একটা গোপন পকেট থেকে লাল ফিতে বাঁধা নোংরা একটা এনভেলাপ বের করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল রানা। 'সেইজন্যেই ফেরত নিয়ে এলাম।'

ত্রস্ত হাতে এনভেলাপটা খুলে ভিতরের কাগজ দুটো বের করে আনল জটিলেশ্বর। একবার চোখ বুলিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখমুখ। গত তিনটে দিনের জমে ওঠা কালিমা নিমেষে মিলিয়ে গেল ওর চেহারা থেকে। চট করে

একটা ড্রয়ারের মধ্যে ওগুলো রেখে চাবি লাগিয়ে দিল।
‘ধন্যবাদ,’ সুইভেল চেয়ারে হেলান দিল জটিলেশ্বর! ‘এবার আপনার শর্তটা বলে ফেলুন।’
একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে লাইটার চেপে আগুন জ্বেলেছিল রানা, কিন্তু সিগারেট ধরাবার কথা ভুলে অবাক হয়ে চাইল জটিল রায়ের মুখের দিকে।
‘আবার শর্ত কিসের? আমাকে পাগল ঠাউরেছেন আপনি? শর্ত থাকলে বা ধরাধরির প্রয়োজন থাকলে আপনাকে দিতাম ওগুলো আমি?’
‘আমি বড়লোক নই,’ বলল জটিলেশ্বর। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে বাঁ হাতের আঙুলের ডগায় ঠেকাল ডান হাতের আঙুলের ডগাগুলো। ‘এতদিনে ত্রিশ হাজার ডলার জমিয়েছি। ওর থেকে বিশ হাজার দিলে চলবে?’
বিস্মিত রানা মাথা নাড়ল।
‘ঠিক আছে, ত্রিশ হাজারই দেব আমি,’ বলল জটিলেশ্বর। ‘এর বেশি পারব না।’
থ হয়ে গিয়েছিল রানা, সামলে নিয়ে ধরিয়ে নিল সিগারেটটা। ছাতের দিকে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চাইল জটিলেশ্বরের পুরু লেন্সের চশমা ভেদ করে চোখের দিকে। মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে।
‘আপনি ভাবছেন যেহেতু মেমোর বিষয়বস্তু জানা আছে আমার–মুখ খুলতে পারি আমি। এতটা সন্দেহপ্রবণ মন দিয়ে এত বড় বড় কাজ করেন কি করে আপনি! আরেকটা সন্দেহ জাগছে না আপনার মনে?–দেশে ফিরে আপনার এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে পারি আমি?’
‘জাগছে।’ শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলল জটিলেশ্বর রায়। ‘বুঝতে পারছি চাকরিতে বহাল আছেন আপনি এখনও। এ-ও জানি, মেজর জেনারেল রাহাত খানের একটা কনফিডেনশিয়াল মেমো নয়াদিল্লীতে পৌঁছলেই খতম হয়ে যাবে আমার ক্যারিয়ার।’
উঠে দাঁড়ল রানা।
‘আপনার ভাগ্য ভাল, ছুটিতে ছিলাম, গত কয়েক দিনের ঘটনা রিপোর্ট করতে বাধ্য নই আমি। যাই হোক, চলি। বেশ কাটল ক'টা দিন আপনার দৌলতে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টের পাওয়া গেল যে বেঁচে আছি। চলি, দেখা হবে আবার।’ দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জটিলেশ্বর, পুরু লেন্সের চশমার ওপাশে চোখ দুটো চকচক করছে। ‘তবে মনে রাখবেন,’ বলল রানা, ‘এই শেষ। ভবিষ্যতে আমার জন্যে কোন ফাঁদ পাতলে সে ফাঁদে আটকা পড়বেন আপনি নিজে।’
‘ভবিষ্যতে আর হবে না এরকম,’ দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল জটিলেশ্বর। ‘আর…আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।’
বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা।

কথা দিয়েছিল রানা, তেহরানের সেরা হোটেলে সেরা ডিনার খাওয়াবে রানীকে।
খাওয়া শেষ হয়ে আসতেই বরকতউল্লার উইলের কথাটা বলল সে ওকে।

'কিছু না, শুধু ব্যাংকে গিয়ে তোমার পরিচয় দিলেই হবে। নীতিশকে বলে দিয়েছি, ও লোক দেবে, তার সঙ্গে গেলে সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। অনেক টাকা–পঞ্চাশ হাজার ডলার। সব তোমার।'

'সত্যিই? এত টাকা আমাকে দিয়ে গেছে লোকটা!' চোখ বড় হয়ে গেল রানীর। বিশ্বাস করতে পারছে না এই হঠাৎ সৌভাগ্য।

'হ্যাঁ।' হাসল রানা। চুমুক দিল শ্যাম্পেনে। 'পঞ্চাশ হাজারের সাথে আরও তিরিশ হাজার যোগ হলে দাঁড়াচ্ছে আশি হাজার ডলার। রীতিমত বড়লোক তুমি এখন, রানী!' টেবিলের ওপর থেকে ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে পুরু একটা নোটের বান্ডিল ঢুকিয়ে দিল সে ওর মধ্যে। মুখটা বন্ধ করে রেখে দিল ওটা টেবিলের ওপর।

'তিরিশ হাজার কেন? আমার ভাগ তো ছিল পনেরো হাজার।'

'বরকতউল্লার পকেট থেকে ওর ভাগটা বের করে নিয়েছিলাম ও মারা যাওয়ার পর। ওটাও তোমারই পাওনা।'

আধ মিনিট কথা যোগাল না রানীর মুখে। মাঝারি একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'আমাকে ভালবাসত লোকটা,' বলল সে। 'অদ্ভুত লোকটা···জানত, আমার পক্ষে ওকে ভালবাসা কোনদিনই সম্ভব ছিল না।' কাঁটা আর চামচ সমান্তরাল করে রাখল রানী প্লেটের ওপর। অর্থাৎ, খাওয়া শেষ। 'কিন্তু···এত টাকা দিয়ে কি করব আমি···একা?'

'বেশিদিন একা থাকতে হবে না তোমার। বাংলাদেশে সুপাত্রের অভাব নেই। বিশেষ করে সুন্দরী, ধনী এবং গুণী মেয়ের জন্যে।'

খানিক ইতস্তত করল রানী, তারপর বলল, 'নীতিশ বাবুর লোক কেন···তুমি যাবে না কাল আমার সাথে ব্যাংকে?'

'কাল ভোরে চলে যাচ্ছি আমি বাংলাদেশে।'

'সাতদিন ছুটি পাওনা ছিল বলেছিলে না? আমি ভেবেছিলাম···'

'হঠাৎ ডাক পড়েছে। ছুটি ক্যান্সেল।'

'তার মানে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে না আর আমার?'

'হয়তো হবে কোনদিন···কে জানে!' হাসল রানা। 'হয়তো হবে না।'

কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল রানী। ওর মনে হলো হঠাৎ দূরে সরে গেছে রানা। যেমন হঠাৎ ঝড়ের মত এসে হাজির হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছে মানুষটা চিরতরে। অথচ কত কথাই না ভেবেছিল ও। অপরূপ সাজে সেজেছিল আজ ওরই জন্যে। কেন যেন বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

রানীর হোটেল কামরায় পৌঁছে দিল ওকে রানা। দরজা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল।

'চলি, রানী। তোমার পাসপোর্টের ব্যাপারে যা করার সব করবে নীতিশ। যদি বাংলাদেশে যেতে চাও টিকেট কেটে তুলে দেবে প্লেনে। আশা করি কোন অসুবিধে হবে না তোমার। কাল খুব ভোরে রওনা হতে হবে আমার···দেখা হবে না আর। চলি, গুড লাক।'

চট করে রানার একটা হাত ধরল রানী। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না বেশ কিছুক্ষণ। রানা দেখল ওর দু'চোখে টলটলে জল।

'ঘর বাঁধবে না কোনদিন, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা এপাশ ওপাশ।

'তুমি তো দেখলে আমার জীবনের ছোট্ট একটা অংশ। এমন লোককে কে বিয়ে করবে বলো? নাহ্, ঘর বাঁধা হবে না আমার কোন দিন। কোন মেয়ের যোগ্য আমি নই।'

'এমন বিপজ্জনক কাজ না করলেই কি নয়?'

'বিপদ মানেই জীবন।' ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা।

'হঠাৎ মনে হচ্ছে, সব হারাচ্ছি আমি!' রানার চোখের দিকে চাইল রানী। অকপটে বলল, 'তোমাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা হু হু করছে।'

'ভুলে যাও, রানী। আমার মত মানুষকে ভুলে যাওয়াই ভাল।'

'জানি। বাঁধন তোমার জন্যে নয়।'

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল রানী। ফোঁপাচ্ছে। এক টুকরো বিষণ্ন হাসি মুখে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল রানা। তারপর দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল চারতলায় ওর নিজের কামরায়।

জিনিস-পত্র বেঁধেছেঁদে তৈরি করে রাখল সে ভোরের জন্যে। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে ভিজল দশ মিনিট। তোয়ালে জড়িয়ে ব্যালকনিতে এসে বসল ইজিচেয়ারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেনে নিল হুইস্কির বোতলটা। মনটা কেমন যেন উদাস লাগছে। সব ভুলে যেতে পারলে বড় ভাল হয়।

'পৃথিবীতে কে কাহার?'—ভাবল সে। হুইস্কি ভরা গ্লাসে বরফের মৃদু ঠুন ঠুন। ভাবল— 'এই তো বেশ!

চুমুক দিল গ্লাসে।

***